এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রথম খণ্ড

অনুবাদক মণ্ডলী

অমল দাশগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, ডঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়,
মৃণালকান্তি কাঞ্জিলাল, জীবন বকসী, সবিতা সাহা,
অনিমা মুখোপাধ্যায়, নিখিল সেন

সম্পাদনা

নিখিল সেন

চারুবাক্

Asiar Shresta Galpa
(An anthology of Asian great stories)

প্রকাশক :
বি. চক্রবর্তী
জি. ভট্টাচার্য
চারুবাক্
২২।২এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৭০০০০৩

মুদ্রক :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-পট :
বিমলেন্দু চক্রবর্তী

ভূমিকা

মানুষের ইতিহাস প্রায় অভিন্ন। লিখতে শেখার আগেই গল্প বলা শুরু হয়েছে। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যেই আছে গল্পের বীজ। ছোটগল্প পড়ে ও শুনে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই এতদিন আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে যে রুচিবদলের পালা শুরু হয়েছে সম্প্রতি। তার ফলে কেউ কেউ আশংকা করছেন, ছোটগল্পের সম্পূর্ণ রূপান্তর অথবা বিলুপ্তি ঘটবে। পাঠকদের চাহিদা মেটানোর তাগিদে কয়েকটি করে গল্প থাকত সাময়িকপত্রের প্রতি সংখ্যায়। এখন একটি থাকলেই যথেষ্ট। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ছোট গল্পের সমাদর বড় দ্রুত কমে যাচ্ছে। ছোটগল্পের স্থান অধিকার করতে ক্রমশ: এগিয়ে আসছে সংবাদপত্র, রেডিও-টি-ভির লঘু ফীচার।

গল্পের চাহিদা যখন নিম্নাভিমুখী তখন 'এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশ করা নিশ্চয়ই কিছুটা দুঃসাহসের কাজ মনে হতে পারে। তবে গল্পের আকর্ষণ ছাড়াও এই সংকলনের একটি বিশেষ মূল্য আছে। হয়তো সেদিকটাই সম্পাদক ও প্রকাশককে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা এশিয়ার নেতৃপদে নিজেদের কল্পনা করে গৌরব বোধ করি। অথচ এই অঞ্চলকে কতটুকু জানি? বরং অনেক বেশী করে জানি য়ুরোপ আমেরিকাকে। তাদের সমাজ ও সাহিত্যকে। বিদেশী সাহিত্যের যা কিছু বাংলায় অনুবাদ হয় তা পাশ্চাত্যের সাহিত্য থেকেই। সুতরাং আলোচ্য গল্প-সংকলনটি এক স্বল্প-পরিচিত জগতের আভাস দেবে বাঙালী পাঠককে। একটি ছোট জানলা খুলে গেল, যার মধ্যে দিয়ে চীন জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, বর্মা, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের নর-নারীর বিচিত্র মিছিলের খণ্ড-চিত্র দেখা যাবে।

যতদূর জানি বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের সংকলন এই প্রথম। সম্পাদক নিখিল সেন যে এই অঞ্চলের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি কয়েক বছর আগে প্রকাশিত তাঁর 'এশিয়ার সাহিত্য' থেকে। সম্পাদক ও তাঁর সহযোগী অনুবাদকেরা যথাসম্ভব সুষ্ঠুরূপে তাঁদের কর্তব্য করছেন।

এশিয়ার অন্যান্য দেশের গল্পগুলি পরবর্তী খণ্ডে শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

এশিয়াই কথা ও কাহিনীর আদিভূমি। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' ভারতের তথা এশিয়ার কথা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ। 'বেদ-উপনিষদে', বৌদ্ধ 'জাতক' কাহিনীতে, সোমদেবের 'কথাসরিৎ সাগরে', বিক্রমাদিত্যের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে, বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্রে' কিংবা প্রাচীন তামিল সাহিত্যেও নানান গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। জাপানের 'জেঞ্জী মনোগাথারি' (জেঞ্জী কাহিনী) কিংবা মহাচীনের 'চুয়ান-চি' (দুর্লভ কাহিনী) অথবা 'সান-কুও চি' (তিন রাজ্যের রোমান্স) প্রভৃতি গল্প উপাখ্যানেও এ ধারা রয়েছে অব্যাহত। আর 'আরব্য রজনী', ইরানের 'গোলেস্তাঁ' ও 'বোস্তানে'র মধ্যে কিংবা হীব্রু নানান কাব্য-গল্পথায় বহু বিচিত্র গল্পের উপাদান ছড়িয়ে আছে। কাজেই আজকের বিশ্ব-সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী মোপাসাঁ, চেকভ কিংবা ও হেনরীর হাজার বছর পূর্বেও এশিয়া মহাদেশে রচিত হয়েছে সার্থক গল্প কাহিনী আর এই ধারা এখনও রয়েছে অব্যাহত।

কিন্তু আজকের এশিয়া আর সেদিনকার এশিয়া এক নয়। ঔপনিবেশিক পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে এশিয়া হয়েছে আজ জাগ্রত। ইংরেজ উপনিবেশ এক ভারতবর্ষই ভেঙ্গে হয়েছে দু'টুকরো : স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান। আর আজাদ পাকিস্তান ভেঙ্গে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ। তেমনি ইন্দোনেশিয়া। ফরাসী উপনিবেশ শ্যাম ভেঙ্গে হয়েছে তিন রাজ্য। ভিয়েৎনাম হয়েছিল দু টুকরো।

ভৌগোলিক দিক থেকেই শুধু জাগ্রত এশিয়ার রূপান্তর ঘটেনি। ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও হয়েছে তার বিপুল পরিবর্তন। দেশে দেশে জাতীয় সাহিত্য আর ভাষার হয়েছে উন্মেষ। মাতৃভাষা পেয়েছে রাষ্ট্রীয় অধিকার। সুতরাং নতুন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন সহজসাধ্য নয়। তার উপর ভাষা সমস্যা। এই সংকলনের প্রায় সব গল্পই ইংরাজী অনুবাদ থেকে অনূদিত। কাওআবাতার গল্পটির বাংলা অনুবাদ ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় মূল জাপানী ভাষা থেকে করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রশংসার।

এই সংগ্রহের গল্পগুলি ত্রৈমাসিক পত্র 'প্যাসিফিক স্পেকটেটর', 'চাইনীজ লিটারেচার', পিকিং থেকে প্রকাশিত 'দি কালেকটেড ওয়ার্কস অব লু সুন', এফ. সিয়োনিল যোশ সম্পাদিত 'এশিয়ান পেন (পি. ই. এন.) এ্যানথলজি',

'স্প্যান' (এস. পি. এ. এন.) গল্পসংগ্রহ, জন. ডি. ইয়াহোনাল সম্পাদিত 'এ ট্রেজারি অব এশিয়ান লিটারেচার', ডরোথি ব্ল্যায়ার শিমার সম্পাদিত 'দি মেনটর বুক অব মডার্ন এশিয়ান লিটারেচার', আফ্রো-এশীয় লেখক গোষ্ঠীর মুখপত্র 'লোটাস' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত হয়েছে। আর যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে যাঁরা তাঁদের রচনা অনুবাদ কিংবা পুনঃ প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের উৎসাহিত ও বাধিত করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বিদেশী যে সকল লেখক বা প্রকাশকের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হয়ে ওঠেনি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞ ও ঋণী রইলাম। এশিয়ার নানা দেশের সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হোল এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রয়োজনে আজ এ পরিচয় আরও নিবিড় হওয়া আবশ্যক। বিশিষ্ট শিল্পী ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুত বিমলেন্দু চক্রবর্তীর একান্ত প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্ভব হোল।

বিপুলায়তন এশিয়ার নানাদেশের গল্পসম্ভার 'এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প' একখণ্ডে প্রকাশিত করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের এই সংকলন চার খণ্ডে প্রকাশ কবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েৎনাম ও অপরাপর দেশ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশের গল্প সংবেশিত থাকবে। ইরান, ইরাক, ইস্রায়েল, লেবানন, সোভিয়েট মধ্য-এশিয়ার উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, আজেরবাইজান প্রভৃতি রিপাবলিকগুলির গল্প থাকবে পরবর্তী খণ্ডে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা সমূহের শ্রেষ্ঠ গল্প নিয়েও আর একটি খণ্ড প্রকাশের সংকল্প রইল।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এ সংকলনটির সুচিন্তিত ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদের কেবল বাধিত করেননি, গৌরবান্বিতও করেছেন। বাঙালী পাঠক সমাজ গ্রন্থখানিকে গ্রহণ করলে নিজেকে সার্থক বোধ করব।

নিখিল সেন

সূচীপত্র

চীন

গুটিকতক ফুটকি, আঁচড় আর রেখার সাহায্যে লিখিত চীনের ভাষা—যেন কোন কুশলী চিত্রকরের হাতে আঁকা ছবি। একটার নীচে একটা এমনি চিত্র লিপিগুলি সাজিয়ে চার হাজার বছর পূর্বে চীনের আদি সাহিত্য গড়ে ওঠে মাটির ধরনীকে কেন্দ্র করে।

আধুনিক চীন সাহিত্যের সূচনা উনিশ শতকের শেষে। লু সুন হলেন তার জনক ও কর্ণধার। তাঁর 'আঃ কি-উ-র জীবন কাহিনী' (বাংলায় এর একাধিক অনুবাদ আছে। নাট্যরূপও হয়েছে 'জগন্নাথ' নাম দিয়ে।), প্রথম প্রকাশিত গল্প 'পাগলের ডায়েরী' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি আধুনিক চীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। 'পাগলের ডায়েরী' সম্পর্কে তিনি নিজে বলেন: 'আমি এর মধ্যে চীনের পারিবারিক প্রথা আর চিরাচরিত নৈতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার কুফল দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি।' এই গল্পে তিনি শোষক ও শাসকের হাজার বছরের অমানুষিকতার মুখোস খুলে দিয়েছেন। জাতির অজ্ঞতা অনগ্রসরতার জন্য কনফুসিয়াসের দর্শনকেই দায়ী করেছেন। অতীতের ইতিহাসের পাতায় তাই দেখা যায় 'মানুষের মানুষ খাওয়া' সমাজের ছবি। তাঁর 'ওষুধ' গল্পেও এই বিপ্লবী সমাজ চেতনা ব্যক্ত হয়েছে। লু সুনের পর বিশিষ্ট কথা-শিল্পী ও কবি রাষ্ট্রনেতা হিসেবে কুও মো-জো-র স্থান বলা যায়। ডঃ হু-সী ও ডঃ লিন ইউ তাঙ-ও বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আধুনিক চীন সাহিত্যের অগ্রণী কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে মাদাম তিঙ লিঙ, মাও তুঙ, চাও শু-লি, লাও চাঅ, তি য়েন চ্যুন, ওয়াং লি প্রমুখ অনেকেই তাঁদের সার্থক রচনায় আধুনিক চীনা কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছেন।

লু সুন, কুও মো-জো আর মাদাম তিঙ লিঙ প্রমুখ সাহিত্যিক পূর্বসুরিগণ চীনে যে গণ-সাহিত্যের অভিযান শুরু করেছিলেন, তা আজ পূর্ণতা লাভ করেছে নয়া চীনের কর্ণধার স্বর্গত মাও সে-তুঙ-এর বিখ্যাত 'ইয়েনান ঘোষণায়' (১৯৪২ সালে)। নতুন চীনের নতুন সাহিত্য আজ মাও সে-তুঙ-এর সেই বাণীই বহন করে চলেছে আশা-উৎসাহ-ভরা মানব মুক্তির সহায়ক সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির জয়যাত্রায়।

রাত্রি

তিঙ্ লিঙ

ভেড়ার পাল তাড়িয়ে এনে উঠোনে ঢোকবার পরেও চাও পরিবারের অনূঢ়া মেয়েটি দোরগোড়ায় বসে আছে। জুতো সেলাই করছে বসে বসে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। সঙ্গে সঙ্গে কানের লম্বা রূপোর দুল দুটো দুলে দুলে উঠছে ভীষণভাবে। বার বার ধাক্কা খাচ্ছে কাঁধের সঙ্গে। খোঁয়াড়ে ঢুকবার মুখে ভীষণভাবে গুঁতোগুঁতি করছে ভেড়াগুলো। দূরের দল ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে সামনের দলকে। যেগুলো সরে আসছে তারা চিৎকার করে চলছে।

সভা শেষ হবার পর নির্বাচনী কমিটির সভ্যরা একে একে বাইরে এল। এইমাত্র সভা শেষ হয়েছে, কিন্তু সভ্যদের আলোচনা এখনো থামে নি। জুতো সেলাই করতে করতে চিঙ একবার তাকিয়ে দেখল। তার মুখে মিষ্টি কৌতুকের হাসি।

নানা সমস্যার ওপর আলোচনা করতে হয়েছে সভ্যদের। সবাই বেশ ক্লান্ত। আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ল. রান্নাঘরের নীল ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। রাত তত হয় নি। সুতরাং ওরা ঠিক করল, গাঁয়ের ওদিকে গিয়েই রাত্রের খাওয়া শেষ করবে। পরের দিনই আর একটা নির্বাচনী সভা আছে, তার জন্য তোড়জোড় দরকার। পরামর্শদাতাকে আজ আবার হঠাৎ চলে যেতে হচ্ছে; তিন চার দিন সে বাড়ী যায় নি। কমিটি জনসাধারণের কাছে পশুচারণ ভূমির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেছে। পরামর্শদাতাকে চলে যেতে হচ্ছে কারণ তার বাড়ীতে গরুটা দু-একদিনের মধ্যে বাচ্চা বিয়োবে। বাড়িতে বৌ আছে, বয়স চল্লিশের ওপর, কিন্তু রান্নার কাজকর্ম ছাড়া আর কিছু সে করতে পারে না।

ঘে বুড়ীটা বসে বসে যাঁতা ঘোরাচ্ছিল, তাকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ীর কর্তা চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এসে বলল, 'রান্না তো তৈরী। চলে যাচ্ছ কেন বাপু? বাড়ীর রান্না বুঝি বেশী মিষ্টি?' কথাটা বলে সে মোড়লের হাতটা

চেপে ধরল। মোড়লের নতুন বিয়ে হয়েছে। সুন্দরী বৌ, বছর পনের বয়স। সুতরাং এই ধরণের ঠাট্টা-তামসা মোড়লকে প্রায় সহ্য করতে হয়।

ঠিক সেই সময় চিঙ এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। ওপাশে পাহাড়ের ওপর গাছগুলো মুকুলে ভরে' গেছে, সেদিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি। লম্বা কালো বেণীটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, পরনে লম্বা হাতাওয়ালা ছিটের পোষাকের ওপর কালো জ্যাকেট। হাত দুটো ওপরে তোলা, দরজার কপাটের ওপর ভর। যদিও ষোল বছর বয়স কিন্তু রীতিমত পাকা দেখায়—যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল। সত্যিই, মেয়েটির এবার বিয়ে দেওয়া উচিত।

ব্রিজের কাছে এসে কমিটির সভ্যরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সবাই চলল দক্ষিণ দিকে। শুধু হো হ্বা-মিঙ একা উত্তর দিকের যাত্রী, কারণ সে দিকেই তার বাড়ী। এখনো সে দেখতে পাচ্ছে, দূরের দিকে তাকিয়ে আছে চিঙ। একটা অদ্ভুত অনুভূতি এল তার মনে। সভায় এবং তার পরে যে সব সমস্যা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল সেগুলোর আর কোন অস্তিত্ব রইল না। কেমন হালকা বোধ হল নিজেকে। শিষ দিতে আরম্ভ করল। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে আপন মনেই বলে উঠল, 'মেয়েটা অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। শীতকালের স্কুলেও যেতে চায় না। ভাবে, ও তো জমিদারের মেয়ে, ওর আর ভাবনা কি? চুলোয় যাক! চাও-এর অনেক টাকা আছে, তাই সে মনে করে সে নিজের সোমত্ত মেয়ের বিয়ে না দিলেও তাকে কিছু বলবার নেই।'

মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চুলগুলোকে পেছনে সরিয়ে দিল সে। তারপর হাত দিয়ে সমান করল মাথার পেছনটা। ভঙ্গীটা দেখে মনে হল যেন সে নিজের অদৃশ্য দুঃখটাকে ঝেড়ে ফেলছে। একবার তাকাল চারদিক। অন্ধকার হয়ে আসছে। অনেক দূরে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে ঝুলে আছে এক টুকরো ঘন নীল মেঘ। সোনালী আলোয় ঝলসে উঠেছে, কেঁপে উঠছে পাহাড়ের চূড়া দুটো। মনে হচ্ছে যেন দুই পাহাড়ের প্রান্তরেখা মিশে গেছে এক আশ্চর্য বর্ণ সমারোহে। মনটা ভারী হয়ে উঠল, অনেক কথা মনে পড়ল তার। পশ্চিম দিকের যে পাহাড়টা সূর্যের আলোয় এখনো উজ্জল, ওখানে চাষ চলছে। গরু বলদ তাড়িয়ে নিয়ে লাঙল কাঁধে বাড়ী ফিরে চলেছে কেউ কেউ। পরামর্শদাতা হবার পর হো হ্বা-মিঙ নিজের জমি চাষ করবার সময়ই পায়নি। জেলার নির্বাচনের জন্য গত কুড়ি দিন ক্ষেতে যাওয়া তো দূরের কথা নিজের বাড়ীতেই যাবার সময় পায় নি। কাজেই বাড়ীতে ফিরলে নানা অনুযোগ, অভিযোগ ও ভর্ৎসনা শুনতে হবে নিশ্চয়ই।

সত্যি কথা বলতে কি, অন্যকে জমি চাষ করতে দেখলেই নিজের জমির কথা মনে পড়ে তার—সেই জমিতে এখনো লাঙল পড়ে নি। অবশ্য একথাও সে বোঝে যে অন্ততঃ আরও কিছুকাল এই কাজ ছাড়তে পারবে না। সুতরাং নিজের জমিতেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কথাটা যতবার ভাবে, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হয় তার। তাকে উদ্বিগ্ন দেখে কেউ যদি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তো সে এড়িয়ে যায়। যতক্ষণ অন্য লোক সঙ্গে থাকে, সে ঠাট্টা তামাসায় যোগ দেয়। আলাপ আলোচনা করে, রিপোর্ট পাঠায়। একবার এক গ্রাম্য নির্বাচনী সভায় তাকে বলা হয়েছিল ফসল-নাচ নাচতে আর যাত্রাগান গাইতে —তারমত এত ভাল গলা এই জেলায় আর কারও নেই। কিন্তু নিজের অকর্ষিত জমি সম্পর্কে অপরের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা সে সহ্য করতে পারে না। তার ইচ্ছা, নির্বাচন শেষ হলেই আবার পাহাড়ে ফিরে যাবে —ক্ষেত জমি, মাটির গন্ধ, সূর্যের আলো, বলদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দ, এ সব তার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

উপত্যকার অন্যপাশে পৌছতে অন্ধকার হয়ে গেল। তবুও দ্রুত হাটতে লাগল সে—অনেক বছরের অভিজ্ঞতায় অন্ধকারে পথ খুঁজে নিতে এতটুকু অসুবিধা হয় না। মাথার ভেতর নানা দ্রুত চিন্তার আবির্ভাব হচ্ছে, শান্ত ও নিস্তব্ধ উপত্যকা নানা স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে তার মনে। ছেলেবেলায় একবার এই জায়গায় একটা হরিণের পেছনে পেছনে সে ছুটেছিল। ছুটতে ছুটতে একটা বনের ভেতরে যায়, সেখানে একটা বাঘের সঙ্গে সেই লোমহর্ষক সংঘর্ষের কথা সে আজও ভোলেনি। তার কয়েক বৎসর পরে এই পথ দিয়েই পোঁটলা বগলে নিয়ে বৌয়ের বাড়ীতে বিয়ে করতে গিয়েছিল সে। তখন তার বয়স ত্রিশ। যদিও বৌয়ের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ। কিন্তু বৌকে দেখে তার মনের কি ভাব হয়েছিল তা আর মনে নেই।

তার কিছুদিন পরে গাধার পিঠে চড়ে বৌকে নিয়ে ফিরেছিল এই পথ দিয়েই। রাত্রি যত অন্ধকারই হোক না কেন, সে স্পষ্ট দেখতে পায় কোথায় তার এক বছরের ছেলেকে কবর দেওয়া হয়েছে, কোথায় তার চার বছরের মেয়ে ঘুমোচ্ছে শান্তিতে। এক বছর আগেও এই সব পথে রাত্রিবেলা যাতায়াত করতে পারেনি তারা। ওই বড় গাছটার কাছেই তো ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডারকে মেরে পাশের ঝোপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে সে নিজেও ছিল সেই ব্যাটালিয়নে। পরামর্শদাতা হবার পর থেকে প্রায়ই তার ফিরতে রাত হয়ে যায়। জটিল রাজনৈতিক সমস্যা ও গুরুদায়িত্বের ভারে ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত

মনের কাছে অতীতের এই সব তিক্ত মধুর ও তীব্র স্মৃতি মনে হয় বড় সান্ত্বনাদায়ক। সুতরাং অন্ধকারে এই নির্জন রাস্তায় চলতে তার ভয়ও হয় না, দুর্ভাবনাও হয় না। দুপাশে উঁচু পাহাড়। কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে গাছের সংখ্যা বাড়তে লাগল। একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী তির তির করে বয়ে চলেছে। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে আকাশটা দেখাচ্ছে ফিতের মত, দু-একটা নিঃসঙ্গ তারা তাকিয়ে আছে তার দিকে। মৃদু দক্ষিণা বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে পেছন থেকে, একটা পরিচিত ও অবোধ্য সুগন্ধ সেই বাতাসে। কুকুর ডাকছে গাঁয়ের দিক থেকে, দুটো হলদে আলো জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে। গাঁ-টা গরীব, বোধ হয় এই জেলার মধ্যে সব চেয়ে গরীব। তবুও নিজের গাঁকে ভালবাসে সে। গাঁয়ের বাইরের দিকে শুকনো কাঠ জড়ো করা, দেখে একটা সস্নেহ ও সগর্ব অনুভূতি এল তার মনে। তার পক্ষে সব চেয়ে বড় গর্বের কথা এই যে, গাঁয়ের কুড়িটা পরিবারের অন্তত কুড়িজন লোক তার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

চওড়া অসমতল জায়গাটা পার হয়ে আরও দ্রুত হাঁটতে লাগল সে। এই ভেবে আশ্চর্য হল যে নিজের গরুর কথা এতক্ষণ তার মনে পড়ে নি। কেমন একটা উদ্বেগ এল মনে—বাচ্চাটা নিরাপদে হয়েছে, না খারাপ খবর আছে কিছু? এই নতুন বাচ্চার কথা এতবার ভেবেছে—ঠিক বাচ্চাটার মায়ের মতই, কিন্তু আরও জীবন্ত। কিন্তু আজ সেই রূপ পরিকল্পনার ছায়ামাত্র অবশিষ্ট নেই। নিজের বাড়ীতে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে ঢুকল গোয়াল ঘরে।

গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে দেখল বৌ চুপ চাপ বসে আছে উনুনের ধারে। খাটের ওপর বিছানা তৈরী, কিন্তু শুতে যাবার ইচ্ছা বৌয়ের আছে কিনা সন্দেহ। ঘরে ঢুকতেই বৌয়ের স্থির দৃষ্টি এসে পড়ল তার ওপর। অনেক চেষ্টায় বৌ নিজেকে সংযত রেখেছে, কিন্তু মুখের ওপর আসন্ন ঝড়ের রেখাপাত তার কাছে গোপন নয়। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে এই ঝড়কে এড়াবার একমাত্র উপায়, জামা কাপড় গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়া। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে। এদিকে গরুটা···বৌয়ের টাক-পড়া মাথাটা দেখতে দেখতে কেমন একটা বিরক্তি এল। মনে হল ঝগড়া এড়াবার সব চেয়ে সহজ উপায় বৌয়ের দিকে কোন নজর না দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়া। 'কী গরম!' কথাটা সে বলল ঝগড়া করবার অনিচ্ছা জানাবার জন্যে। আর মনে মনে আশা করল তার ক্লান্ত শরীরের কথা মনে করে অন্তত এখনকার মত ও তাকে রেহাই দেবে।

মাটির ওপর এক ফোঁটা জল পড়ল। বৌ কাঁদছে। ফোঁটা ফোঁটা জল

গড়িয়ে পড়ছে মুখের ওপর। রাত্তির অস্পষ্ট আলো পড়েছে নোংরা জালচে চুলে, চিবুকের ভর-রাখা রোগা হাতটা দেখাচ্ছে মড়ার মত ফ্যাকাশে। নিঃশব্দে নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্যে নিজেই বিলাপ করে চলেছে :

'মরণ হয় না কেন তোমার! কী কপাল নিয়েই এসেছিলে! তোমার স্বামী তোমাকে ঠিকমত খাওয়ায় না, পরায় না তাতে তোমার উচিত শাস্তিই হয়েছে। এই তোমার ভাগ্য……'

একটি কথাও বলল না সে। এখন গরুটাই তার একমাত্র চিন্তা। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে মনে মনে সে ভাবল :

'বুড়ী ডাইনীটার কোন 'বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি' নেই। গরুগুলোও বাচ্চা বিয়োয়। কিন্তু ওই বুড়ী কী? বাঁজা মুরগী।' আচ্ছা, এই 'বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি' কথাটার অর্থ কী? সে ঠিক বোঝে না। কিন্তু ওই বুড়ীর আর ছেলেপিলে হবার আশা নেই, বুড়ীর ক্ষেত্রে কথাটা নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা চলে। কথাটা সে আগে জানত না, সহকারী সম্পাদকের কাছে নতুন শেখা।

দুজনেরই একান্ত আশা, আবার তাদের ছেলেপিলে হয়। তাকে সাহায্য করতে পারে, এমন একজনকে তার দরকার। আর বৌ যখন ভাবে যে ভবিষ্যতে নির্ভর করবার মত কেউ নেই, তখন কেমন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা আসে মনে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে। বৌ অনুযোগ করে, পয়সা আয় করবার ক্ষমতা তার নেই, ঘর-দোরের দিকে সে তাকায় না। আর সে ভাবে, বৌটার আর উন্নতি হবে না, লেজের মত পিছিয়েই থাকবে সব সময়ে। বিশেষ করে সে জেলা-পরামর্শদাতা হবার পর তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আগে আগে দুজনে ঝগড়া করত। কিন্তু এখন সে প্রায়ঃ চুপ করে থাকে। মনে হয়, তার মেজাজটা ক্রমশঃ ভাল হচ্ছে আর বৌ হয়ে উঠছে খিটখিটে। বৌ নিজেও বুঝতে পারে, একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে সে, তার আর নাগাল পাওয়া যায় না। সুখে স্বচ্ছন্দ্যে খেয়ে পরে থাকতে পারলেই বৌ খুশি। কিন্তু কী চায় সে? সে বুঝতে পারে না। আই-ইয়া, অসহ্য! বৌয়ের আরও বিশ্রী মনে হয় যখন দেখে সে নিজে বুড়ী হয়ে গেছে কিন্তু তার স্বামী এখনো যুবক। স্বামীকে সে আর খুশী করতে পারে না, স্বামী তার প্রতি কোন মনোযোগ দেয় না।

বৌয়ের কান্নার শব্দ উচ্চতর হয়ে উঠল। এখন কেঁদে কেটে অভিশাপ দিয়ে জাগিয়ে তুলবে তাকে। কিন্তু চুপ করে শুয়ে আছে সে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে

নিজেকে সংযত রাখতে। হঠাৎ একটা খারাপ চিন্তা নিজের অজান্তেই মনের ভেতর জেগে উঠল :

'এই জমিজমা ওকে দিয়ে দিলেই হয়। অন্য কেউ রেঁধে দিলেও আমার চলবে। অবিবাহিত লোকের মত আমি থাকব। এই ঘর দোর, বাসনপত্র সব দিয়ে দেব ওকে। নিজের জন্যে শুধু নেব একটা বিছানা আর কয়েকটা জামা কাপড়। ছেলেপিলের ভাবনা তো আর নেই। এই সব জমিজমা আসবাবপত্র সব পর হবে। ইচ্ছা হলে কাউকে পোষ্যপুত্রও নিতে পারে ও। তখন আমি...' এই চিন্তায় সমস্ত শরীরটা কেমন হালকা মনে হল। পাশ ফিরে শুল। বেড়ালটা শুয়ে ছিল একপাশে, চমকে লাফিয়ে উঠেই আবার শুয়ে পড়ল। তিন বছর এই বেড়ালটাকে তারা খাইয়েছে। বেড়াল তার পছন্দ নয়, কিন্তু এই ছাই-রঙা বেড়ালটাকে ভীষণ ভালবাসে, ভীষণ ভালবাসে সে। কাজ থেকে ফিরে যখন সে খাটের ওপর বসে আর বৌ খাবার নিয়ে আসে তার জন্যে, বেড়ালটাও চুপ করে বসে থাকে তার পাশটিতে

বৌয়ের রাগ এখনো পড়ে নি। বৌয়ের অসাবধানতায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বৌয়ের পায়ের ধাক্কায় এক্ষুনি হয়ত শিমের বোয়েমটা উলটে পড়বে। শিম তার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এখন সে কথা বলতে চায় না, সুতরাং পাশ ফিরে শুল। খাটের প্রান্তে একটা চুবড়িতে মুরগীর ছানাগুলোকে রাখা হয়েছিল, তার পা-টা গিয়ে ঠেকল চুবড়িতে। ভয় পেয়ে মুরগীর ছানাগুলো চিৎকার করতে লাগল ডানা ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে।

'তুমি ভাল করেই জান যে এই রোগা শরীর নিয়ে আমি আর বেশীদিন বাঁচব না, তবুও আমাকে তুমি কোন রকম সাহায্য কর না। ঘাস পর্যন্ত কাটতে হয় আমাকে। গরুটার বাচ্চা হবে, কিন্তু তোমার তাতে কি আসে যায়......।' কথা বলতে বলতে বৌ উঠে দাঁড়াল। এবার হয়ত ও কাছে এগিয়ে আসবে, এই ভয়ে সে খাট থেকে নেমে বাইরে উঠোনে চলে এল। কেমন দমে গেছে সে। মনে মনে বলল, 'গরু বাছুর, সবই তোমার...'

পাহাড়ের ওপাশে অর্ধ-বৃত্তকার চাঁদটা ঝুলছে। উঠোনের একাংশে চাঁদের আলো। উঠোনের মাঝখানে একটা কুকুর শুয়েছিল, তাকে দেখে এক পাশে গেল। নিজের অজানতেই সে গিয়ে ঢুকল গোয়াল ঘরে। ভেতরে প্রচুর ঘাসও জড়ো করা। অন্ধকারে গরুটা কাশছে, আর নিশ্বাস নিচ্ছে টেনে টেনে। 'খানকীর বাচ্চা! এতক্ষণেও বিয়োতে পারোনি?' আগামীকালের সভার কথাটা মনে পড়ল উদ্বেগের সঙ্গে।

গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, এমন সময় একটা ছায়া-মূর্তি তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চা হয়ে গেছে?' পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছে মূর্তিটা। এক হাতে বেতের ঝুড়ি, অপর হাত দরজায় ঠেস দেওয়া। 'হাউ কোয়েইঙ, তুমি!' চাপা স্বরে বলল সে। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছে।

হাউ কোয়েইঙ তার প্রতিবেশীর স্ত্রী। স্বামী জনরক্ষা সমিতির সভাপতি; আঠারো বছর বয়স। ওর বয়স তেইশ, বিয়েটা সুখের হয়নি। বিবাহবিচ্ছেদ করবার পরামর্শ দিয়েছে হাউ কোয়েইঙ। ও মহিলা সমিতির কমিটির সভ্য, জেলা জনরক্ষা পরিষদের মনোনীত সদস্যা।

এই নিয়ে তিন চার বার হল ও তার সঙ্গে কথা বলবার জন্তে পেছনে পেছনে গোয়াল ঘরে ঢুকেছে। এমন কি প্রকাশ্য দিনের আলোতেও যতবার ওদের দেখা হয়েছে, ওর টানা টানা চোখ স্মিত হয়ে উঠেছে তার দিকে তাকিয়ে। মেয়েটিকে তার ভাল লাগে না, বলতে গেলে প্রায় ঘৃণা করে। কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, ওকে সবলে ছিনিয়ে এনে ভীষণভাবে চেপে ধরে।

ওর বব্‌করা চুলে আর খোলা কলারের ফাঁকে অনাবৃত গ্রীবায় চাঁদের আলো পড়েছে। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও, ঠোঁট কামড়াচ্ছে আলতো-ভাবে। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল সে।

'তুমি…?'

তার মনে হল যেন শরীরের ভেতর ভয়ংকর একটা শক্তি মাথা তুলছে। বীভৎস, বেপরোয়া, দুঃসাহসিক একটা কিছু করে ফেলতে : ' সে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে অন্য একটা অনুভূতি এসে তাকে বাধা দিল।

'না, না, হাউ কোয়েইঙ কিছুদিনের মধ্যেই তুমি পরিষদের সদস্যা হবে। আমাদের দুজনের সামনেই অনেক জরুরী কর্তব্য রয়েছে। এখন এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে আমাদের 'সমালোচনা' হতে পারে।' ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। একবারও মুখ ফিরিয়ে দেখল না। বৌ বিছানার ওপর শুয়েছে, এখনো কাঁদছে মনে হয়।

'হুঁ…' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চুপ করে শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা মনে পড়ল—যেন সে নয়, অন্ত কেউ এই ঘটনায় জড়িত। ঝড়ের পর যেমন প্রশান্তি আসে, তেমনিভাবে সে ভাবল ঘটনাটা।* সে যা করেছে ঠিকই করেছে। বৌকে ডেকে সে বলল, 'এবার ঘুমোও। গরুটার এখনো বাচ্চা হয়নি। হয়ত কাল হবে।'

বৌ যখন দেখল যে তার মুখে কথা ফুটেছে তখন কান্না থামিয়ে আলো নিভিয়ে দিল।

'বুড়ীটা কোন কাজের নয় সত্যি, কিন্তু তবু এখানেই থাক না, রান্নাবান্নাও তো করতে পারবে। এই অবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ খুবই খারাপ দেখায়।'

উঠোনে মুরগীগুলো ডাকছে। পোষাক খুলে বৌ শুয়ে রয়েছে তার পাশে, আর বারবার জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি কি কালও আবার বেরোবে নাকি? শুধু মিটিং আর মিটিং আর মিটিং…গরুটার ওপর নজর দেওয়া দরকার।'

কিন্তু গরুটার কথা ভাববার সময় এখন আর নেই, একটু ঘুম দরকার তার। চোখ বুঁজে থাকবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও বারবার ভেসে উঠতে লাগল সভাস্থানের দৃশ্য। অনেক মানুষের জনতা। মাথার ভেতর শ্লোগানগুলো মুখর হয়ে উঠেছে:

'প্রচারকার্য হয়ে গেছে দুর্বল।'
'গ্রামোন্নতি হয়নি শুরু।'
'মেয়েদের ভেতর শুরু হয়নি কাজ।'

কথাগুলো ভেবে অধৈর্য হয়ে উঠল সে। কিভাবে গাঁয়ের উন্নতি সম্ভব? কর্মীর সংখ্যা এত কম! কিন্তু সে নিজেই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তর তার নিজেরও জানা নেই। কোন দিন সে স্কুলে পড়ে নি, লিখতে পড়তে জানে না। ছেলেপিলে তার নেই। কিন্তু আজ সে জেলা-পরামর্শদাতা। আগামীকাল সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে বক্তৃতা দেবে।

জানালার কাগজটা ক্রমশঃ সাদা হয়ে যাচ্ছে। পাশের ঘরে ঘুম ভেঙেছে কার যেন, একটু তন্দ্রা এসেছে হো-কামিঙের। রোগা বৌটা গভীর ঘুমে অচেতন, গর্তে-ঢোকা চোখের কোণে জল জমে রয়েছে এক ফোঁটা। এক পাশে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে বেড়ালটা। ভোরবেলার আলোর উষ্ণতা, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে ঘরের ভেতর। সকাল হচ্ছে একটু একটু করে।

অনুবাদ: অমল দাশগুপ্ত

ছোট্ট একটি ঘটনা

লু স্যুন

গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে এসেছি আমি। ছ'বছর কেটে গেছে তারপর চোখের পাতা ফেলার মত। এরই মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। সে সব অবশ্য 'রাষ্ট্রীয় ব্যাপার'। এদের কয়েকটি আমি দেখেছি স্বচক্ষে। কানেও শুনেছি অথবা শুনেছি লোকের মুখে। এদের কোনটাই আমার মনে তেমন দাগ কাটে নি। বরং তার কথা মনে হলে মেজাজটা খিঁচিয়ে উঠত। লোকের প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠছিল যতই যাচ্ছিল দিন। কিন্তু তখনকার ছোট্ট একটি ঘটনা আমার মনে এমন করে কেটে বসে যার জের আমি আজও ভুলতে পারি নি।

শীতের দিন। রিপাবলিক চীনের ষষ্ঠ বছর। কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া জোরে বয়ে চলেছিল। খেটে খাওয়া মানুষ। সাতসকালে উঠে কাজে চলেছিলাম। পথে লোকজন কেউ নেই। দেখা হল না কারুর সঙ্গে। অনেক কষ্টে একখানি রিকশা অবশেষে জোগাড় করলাম। রিকশাওয়ালাকে বললাম আমাকে 'দক্ষিণদ্বারি'তে নিয়ে যেতে। কিছুক্ষণ পর ঝড়ের ঝাপটা কিছুটা কমে আসে। আর রাস্তার ধুলো সব উড়তে শুরু করে। রিকশাওয়ালা ছুটে চলল দ্রুত বেগে। 'দক্ষিণদ্বারি'-র কাছাকাছি আমরা যখন এসে পৌছলাম তখন কে যেন একজন আমাদের সামনে দিয়ে গেল ছুটে। আর যাবার সময় রিকশার ধাক্কায় পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে।

দেখলাম একটি বুড়ী। চুলগুলি তার সাদা ধবধবে। পরনের কাপড়-চোপড়ও ছেঁড়া, শতছিন্ন। রাস্তার একপাশ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে সে সিধে আমাদের সামনে দিয়ে সড়ক পার হতে যাচ্ছিল। রিকশাওয়ালা ওকে পাশ কাটিয়ে যাবারই চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার গায়ের বোতামহীন ছেঁড়া জামাটির খানিকটা অংশ বাতাসে উড়ে এসে রিকশার হাতলের সঙ্গে আটকে যায়। ভাগ্যিস রিকশাওয়ালা তার গতি কমিয়ে দিয়েছিল। নইলে, রিকশার চাকাগুলি তার ঘাড়ের উপর দিয়ে চলে যেত। হয়ত সাংঘাতিকভাবে তাকে

জখম করত। রিকশাটা থেমে গেলেও বুড়ীটা কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে রইল রাস্তায়। খুব একটা জখম হয়েছে বলে আমার কিন্তু মনে হল না। তাছাড়া আশে পাশে কেউ দেখে ফেলে নি ঘটনাটা। তবু কিন্তু রিকশাওয়ালাটি ওখান থেকে সরে পড়বার নাম করছে না দেখে আমার রীতিমত রাগ হল। বুঝতে পারলাম না ও কেন বোকার মত নিজেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে চাচ্ছে এর পরেও। তাতে শুধু আমার যেতে দেরী হয়ে যাবে তা নয়, ঝামেলাও পোহাতে হবে।

'কিচ্ছু হয় নি।' আমি বলে উঠলাম—'তুমি চল।'

কিন্তু রিকশাওয়ালা বুঝি তা শুনতে পেল না কিংবা কান দিল না আমার কথায়। সে তখন রিকশাটা নামিয়ে রেখে বুড়ীটাকে দু'পায়ের উপর দাঁড়াতে সাহায্য করতে লাগল। বুড়ীটাকে সে হাত ধরে তুলল। জিজ্ঞেস করলেঃ 'এখন কেমন লাগছে ?'

'আমি চোট পেয়েছি।'

আমি বললাম, 'পড়ে যেতে আমি তোমাকে দেখেছি। তাতে তোমার তেমন চোট পাবার কথা নয়। তা তুমি চোট পেলে কেমন করে ? তুমি ভাঁওতা দিচ্ছ।' ব্যাপারটা বিচ্ছিরি। আর রিকশাওয়ালাটা নিজেকে থামকা ঝামেলার মধ্যে ফেলছে। এখন ওর ভালোয় ভালোয় সরে পড়াই ভাল।

রিকশাওয়ালা কিন্তু একমুহূর্ত আর দেরী করল না। যেই শুনল বুড়ীটা জখম হয়েছে, ওর হাত ধরে সে তখন বুড়ীটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল। সামনেই একটা থানা ছিল। আর আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম রিকশাওয়ালা বুড়ীকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। সামনে কেউ ছিল না। তাই সে বুড়ীকে গেট পেরিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল।

ওরা চলে যেতেই এক অদ্ভুত অনুভূতি বোধ করলাম আমি। কেন জানিনা। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর ধূলিধূসরিত চেহারাটি আমার চোখের সামনে একটা বিরাট আকার ধারণ করল। যতই সে দূরে সরে যাচ্ছে আকারটা ততই বড় হচ্ছে। এত বড় যে, আমাকে ঘাড় কাত করে তাকাতে হল। আর ঠিক সেই সময়েই মনে হল গরম ফারের পোশাকে মোড়া আমার দেহ থেকে সব ক্ষুদ্রতা কে যেন নিঙড়ে বার করে নিল। আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। মনে হল আমার শরীরের সমস্ত রক্ত জমে গেছে। আমি স্থাণুর মত নিশ্চুপ বসে রইলাম। একসময় দেখলাম থানা থেকে এক পুলিশ অফিসার বেরিয়ে এলেন। আমার দিকে ওঁকে এগিয়ে আসতে দেখে রিকশা থেকে আমি নেমে পড়লাম।

'আপনি আর একখানি রিকশা নিন।' অফিসারটি আমায় অনুরোধ করলেন। বললেন, 'ও আর রিকশা টানবে না।' কিছু না ভেবেই আমি আমার পকেটে একখানি হাত ঢুকিয়ে দিলাম। আর একমুঠি পয়সা বার করলাম। পুলিশ অফিসারকে বললাম ঃ

'এগুলি লোকটাকে দেবেন।'

ঝড় ঝাপটার দাপট থেমে গেছে একেবারে। তবে পথ জন-বিরল, নির্জন। আমি হাঁটতে শুরু করলাম। পথ চলতে চলতে আমি ভাবতে লাগলাম। কিন্তু নিজের কথা ভাবতে গিয়ে আমার ভয় করতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে যা ঘটে গেল তা ভুলে গিয়ে আমি একমুঠো পয়সা বিলানোর কথা ভাবতে লাগলাম। কারণ খুঁজতে লাগলাম। পয়সাগুলো আমি দিলাম কেন? পুরস্কার কি? ওর সঙ্গে আমার ব্যবহারের পর আমি কি আমার কথা একবারও তলিয়ে দেখেছি। এক রিকশাওয়ালাকে অমন করে বিচার করার আমি কি যোগ্য? আমি আমার বিবেককে কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারলাম না।

এখনও পর্যন্ত সেদিনকার অভিজ্ঞতাটির কথা ভাবলে আমার মন ব্যথায় টনটন করে ওঠে। যতই আমি ভাবি ততই আমি ব্যথাতুর হয়ে উঠি। সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক ও সাময়িক ঘটনাগুলি আমার কাছে মনে হয় ছেলেবেলায় পড়া প্রাচীন ক্লাসিক গ্রন্থের মত। তার একটি পঙ্ক্তির অর্ধেকটাও আমার আজ কণ্ঠস্থ নেই। কিন্তু আমার চোখের উপর ঘটনাটা কেবলই ভেসে উঠতে লাগল। আর আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। ছোট্ট এই ঘটনাটি নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে আমায় উদ্বুদ্ধ করে। সঞ্জীবিত করে আশা। দেয় সাহস। অন্যান্য খুঁটিনাটি ঘটনার মধ্যেও সেদিনকার ঘটনাটি আমি আজও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।*

অনুবাদ: দক্ষিণারঞ্জন বসু

---

* **Edgar Snow এবং Yao Hsin-Nung-র ইংরাজী অনুবাদ থেকে।**

পাগলের ডায়েরী

লু স্যুন

দুই ভাই। ওদের নাম আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই না। দু'জনেই স্কুল থেকে আমার প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু বহু বছরের বিচ্ছেদের পর আমরা পরস্পর পরস্পরের সম্পর্ক হারাই। কিছুদিন আগে আমি শুনতে পেলাম আমার বন্ধুদের একজন ভয়ানক অসুস্থ। আমি আমার আগেকার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলাম। কাজেই মাঝপথে নেমে পড়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমি গিয়ে একজনকেই শুধু দেখতে পেলাম।

'যে অসুস্থ সে তার ছোট ভাই। এতদূর থেকে তুমি যে আমাদের দেখতে এসেছ তাতে খুব খুশি হয়েছি', বন্ধুটি বলল।—'কিন্তু কিছুকাল আগে ও সেরে উঠেছে। আর সরকারী এক চাকরি নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছে।'

তারপর হেসে বন্ধুটি ভাই-এর লেখা দুটি ডায়েরী খাতা নিয়ে এল। বলল ঃ

'এই লেখা থেকে ভাই-এর অসুখের ধাত কিছুটা জানতে পারবে। বন্ধুকে লেখাটা দেখতে দিলে দোষের কি আছে, বলো?' আমি ডায়েরী দুটি নিয়ে এলাম। আর পড়লাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। দেখলাম, ও এক রকম আত্ম-পীড়ন অসুখে ভুগছে। লেখাটাও খাপছাড়া আর এলোমেলো। ও অনেকগুলি উদ্ভট বিবৃতি দিয়েছে। কোন তারিখও দেয়নি লেখাতে। তাহলেও বিভিন্ন কালির বহর দেখে কিংবা লেখার বিভিন্ন ধরন দেখে বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে ডায়েরীটা এক সময়ে লেখা নয়। কোন কোন অংশ অবশ্য তেমন খাপছাড়া নয়। আমি তার কিছুটা অংশ টুকে নিলাম যাতে ডাক্তারী পরীক্ষায় তা কাজে লাগানো যায়। ডায়েরীতে উল্লিখিত লোকজন সব বেশীর ভাগই অজ পাড়াগাঁয়ের। পৃথিবীর কেউ তাদের চেনেও না, শুনেও না। খালি নাম ছাড়া ডায়েরীখানির একটি শব্দও আমি পরিবর্তন করি নি। আর শিরোনামার কথা বলতে গেলে ডায়েরী লেখক-ই আরোগ্য লাভ করে বেছে নেবে। আমি তা পরিবর্তন করি নি।

·

'আজ রাত্রের চাঁদটি বেশ উজ্জ্বল। তিরিশ বছরের বেশী হল অমনটি আর

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
59279
27/12/78

আমি দেখিনি। তাই আজ রাতে চাঁদ দেখে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি অস্বাভাবিক ভাবে। আর ভাবতে শুরু করি গত তিরিশ বছর আমি অন্ধকারে কাটিয়েছি আচ্ছন্নের মত। কিন্তু এখন আমাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কেন না চাও পরিবারের কুকুরটি আমার দিকে দু'বার ফিরে ফিরে তাকিয়ে গেল কেন ?

এই আতঙ্কের কারণ আছে নিশ্চয়।

আজ রাত্রে চাঁদ ওঠেনি আকাশে। কাজেই রাতটি শুভ নয়। আজ সকালে আমি যখন বেরুচ্ছিলাম সতর্ক হয়ে শ্রীযুক্ত চাও-কে দেখলাম আমার দিকে তাকাচ্ছেন কটমট করে। যেন আমায় দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন। মনে হল তিনি বুঝি আমায় খুন করতে চান। ওখানে আরও সাত আটজন ছিলেন। ওরাও বুঝি আমায় নিয়ে কী যেন বলাবলি করছে। আর আমি দেখে ফেলেছি দেখে বুঝি ভয় পেয়ে গেল। পাশ কেটে যারা গেল তারাও বুঝি তাই। ওদের মধ্যে যিনি ছিলেন হিংস্রপ্রকৃতির, তিনি আমায় দেখে দাঁত বার করে একটু হাসলেন। আর তাতেই ভয়ে আমার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম ওদের প্রস্তুতি এখন সম্পূর্ণ।

তবুও আমি কিন্তু ভয় পেলাম না। পথ ধরে চলতে লাগলাম। সামনে এক দল ছেলেমেয়েও দেখি আমাকে দেখে কি বলাবলি করছে। আর তাদের চাউনি অনেকটা শ্রীযুক্ত চাও-এর মত। আর মুখগুলি ফ্যাকাশে ও বীভৎস। আমি তো ভেবে পেলাম না ঐ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কী ঝগড়া ঝাঁটি করলাম ? ওরা অমন ব্যবহার করছে কেন আমার সঙ্গে ? আমি তাই গলা ছেড়ে বলতে যাচ্ছিলাম, 'কি হয়েছে বল তো ?'

ওরা কিন্তু ছুটে পালিয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, 'আমি শ্রীযুক্ত চাও-এর সঙ্গে ঝগড়া করেছি নাকি ? ভাবলাম, রাস্তার লোকগুলোর সঙ্গে কি ঝগড়া করেছি ?' ভেবে ভেবে আমার মনে পড়ল বছর বিশেক আগে আমি একবার মাত্র হু চিওর হিসেবের খাতাখানি পায়ে মাড়িয়ে গিয়েছিলাম। তাতে শ্রীযুক্ত হু খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত চাও অবশ্য তাকে চেনেন না। তাহলেও উনি নিশ্চয় কারুর কাছে সে কথা শুনেছিলেন। এখন আমার উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। আর তাই তিনি রাস্তার লোকদের নিয়ে মতলব ভাজছেন। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর আমি কি করলাম ? তখন তো ওদের জন্মও হয়নি! তা না হলে ওরা আজ আমার দিকে অমন কটমট করে তাকালই বা কেন ? ওরা কি আমায়

ভয় করে? ওরা কি আমায় খুন করতে চায়? বাস্তবিক ওরা আমায় ভয় পাইয়ে দিল। ব্যাপারটা এমন খাপছাড়া অস্বাভাবিক যে তা বলবার নয়। আমি জানি নিজেদের বাপ মায়ের কাছ থেকে ওরা নিশ্চয়ই এ শিক্ষা পেয়েছে!

* * *

রাত্রে আমি ঘুমোতে পারলাম না। ব্যাপারটা বুঝতে হলে সবটা তলিয়ে দেখা দরকার।

বিচারপতি যাদের মুণ্ডুচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছেন, এমন কি পাড়ার ভদ্রলোকরা যাকে চড় চাপড় মেরে অপমান করেছেন, পাওনার দায়ে যাদের স্ত্রীকে আদালতের লোক এসে ধরে নিয়ে গেছে, দেনা শোধ দিতে পারে নি বলে যাদের বাপ মা আত্মহত্যা করেছে—তারাও, এমনকি কাল যারা আমার দিকে অমন ভয়ঙ্কর ভীতিবিহ্বল চোখে তাকিয়ে গেল—তারাও বুঝি অমন কটমট করে আমার দিকে তাকাত না!

কাল রাস্তায় সে মেয়েটার কথা আরও বিশেষ করে মনে রাখবার। মেয়েটা তার ছেলেকে গালাগালি দিয়ে বলছিল, 'শয়তানের বাচ্ছা, কামড়ে তোর মাংস খেলে তবে আমার হাড় জুড়োবে।' মেয়েটা ছেলেকে গালাগাল করছিল আর আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি তো শিউরে উঠলাম। নিজেকে সামলাতে পারলাম না কিছুতে। আর ঐ সব ফ্যাকাশে মুখ লম্বা দাঁত বেরিয়ে পড়া মানুষগুলো তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছিল তখন আমার দিকে তাকিয়ে। বুড়ো চেন ছুটে এসে আমায় তখন ঘরে নিয়ে গেল বুঝিয়ে সুঝিয়ে।

বাড়ীর লোকজন সবাই এমন ভাব করতে লাগল যেন কেউ আমায় চেনেন না। ওদের চোখেও আর সব লোকের মতই দৃষ্টি। আমি পড়ার ঘরে যেই ঢুকেছি অমনি ওরা বাইরে থেকে দোর দিয়ে দিল। আমি যেন আস্ত একটা হাঁস বা মুরগী। এ ঘটনাটি আমায় আরও বেশী ভেবাচাকা করে দিল।

কিছুদিন আগে 'নেকড়েছানা গাঁ' থেকে আমাদের এক প্রজা এসেছিল ফসল কেমন হয়েছে জানাতে। কথায় কথায় ও তখন আমার দাদাকে বলে যে গাঁয়ের এক দুষ্ট লোককে ওরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তারপর কেউ বুঝি ওর হৃদপিণ্ডটা বার করে তেলে ভেজে খেয়ে নেয়। আর বুঝি বুক বাঁধে সাহসে। শুনতে শুনতে আমি যখন বাধা দিয়ে উঠলাম তখন দাদা আর প্রজাটি দুজনে আমার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগল। আজই আমি বুঝতে পারলাম ওদের চোখেও সেদিন ছিল ঠিক তেমনি দৃষ্টি ও চাউনি আজ যারা বাইরে রয়েছে ঠিক তাদের মত।

আর এই চিন্তা করতেই আমার আপাদমস্তক ভয়ে কেঁপে উঠল থরথর করে। ওরা তাহলে নরমাংস খায়? তাহলে আমাকেও তো ওরা খেয়ে ফেলবে। ওদের থামাই কি করে?

আমার চোখের উপর ভেসে উঠল মেয়েমানুষটি 'তোমার দেহ থেকে কয়েক খাবলা মাংস কামড়িয়ে নিল।' ফ্যাকাশে বড় দাঁতওয়ালা মানুষগুলোর অট্টহাসিরই বা কি মানে? আর সেদিনকার রায়তটির কাহিনীটি তাহলে কি গোপন ইঙ্গিত করে? ওদের কথাবার্তায় বিষ টের পেতে আমার বেগ পেতে হয় নি। ওদের হাসির শাণিত ফলাও আমি টের পাই। ওদের দাঁতগুলো সাদা ঝক্‌ঝকে, চিকচিক করছে। মানুষের মাংস খেতে অভ্যস্ত নিশ্চয়। শ্রীযুত হু-র হিসাবের খাতাখানি মাড়িয়ে দিয়েছিলাম বলে তিনি সন্দেহ করলেও আমি কিন্তু খারাপ লোক নই। ওদের মনে কি আছে আমি তা বুঝতে পারছি না। তবে ওরা যদি চটে যায় তবে যে কোন লোককে ওরা বদ, খারাপ চরিত্র বলে অভিহিত করতে পারে। আমার মনে পড়ে, দাদা আমাকে যখনই রচনা লিখতে দিতেন, সে যতই ভাল হোক আমি যদি তার উল্টোটা লিখতাম, ভিন্ন চরিত্র অঙ্কিত করতাম, তাহলেও দাদা কিছু বলতেন না। মঞ্জুর করে দিতেন। কোন বদলোকের হয়ে আমি যদি ওকালতি করতাম, তিনি বলতেন, 'বেশ হয়েছে। এতে তোমার মৌলিকতার ছাপ রয়েছে।' আমি তাহলে কি করে ওদের মনের কথা আন্দাজ করতে পারি যদি ওরা আমায় খেতে আসে!

কিছু বুঝতে হলে সব কিছু একবার তলিয়ে দেখতে হয়। সেকালে আমার মনে পড়ছে লোকে প্রায় নরমাংস খেত। তবে এ সম্পর্কে আমার কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। এ বিষয়ে আমি খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। এবং প্রতিটি পাতায় বুঝি তা বড় বড় হরফে লেখা আছে 'ধর্ম ও নীতি'। ঘুমোতে আর পারছিলাম না, তাই আমি বই নিয়ে বসলাম। মন দিয়ে পড়তে চেষ্টা করলাম মাঝরাত পর্যন্ত। কিন্তু বই-এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে শুধু লেখা আছে দুটি শব্দ: মানুষ খাও! বইয়ে লেখা প্রতিটি শব্দ, আমাদের গাঁয়ের সেই রায়তটি যা বলে গেল তার প্রতিটি কথা আজ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে রহস্যময় ভাবে। হাসছে দুর্বোধ্য হাসি।

আমিও তো একজন মানুষ। তা'হলে ওরা আমাকেও খেয়ে নেবে।

সকালবেলা উঠে কিছুক্ষণ আমি চুপচাপ বসে রইলাম। বুড়ো চেন খাবার নিয়ে ঢুকল। হাতে একবাটি শাকসবজি আর একবাটি গরম মাছের ঝোল যা

থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। মাছের চোখ দুটো সাদাটে আর স্থির। মুখটা অনেকখানি হাঁ হয়ে আছে। ঠিক যেন মানুষ-খেকো লোকগুলোর মত। কয়েকগ্রাস মুখে দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম না, আমি যা খাচ্ছি তা মাছ না, নরমাংস। তাই আমি বাকীটা ফেলে দিলাম। বললাম, 'চেন, তুমি দাদাকে গিয়ে একবার বোলো যে এখানে আমার দম আটকে আসছে। আমি উঠানে একবার পায়চারি করতে চাই।' বুড়ো চেন মুখে কিছু বললে না। সে চলে গেল। আর একটু পরে ফিরে এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি কিন্তু নড়তে পারলাম না। চোখ মেলে দেখতে লাগলাম আমার সঙ্গে ওরা কেমন ব্যবহার করে। আমি জানি ওরা আমায় যেতে দেবে না। ঠিক তাই! দাদা আমার দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। তাঁর পিছনে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। চোখ দুটিতে তাঁর খুনীর চাহনি। পাছে আমি তা দেখে ফেলি, সেজন্য মাথাটি তিনি নামিয়ে নিলেন। চশমার কাঁচের পাশ দিয়ে তাকাতে লাগলেন আমার দিকে। 'আজ তুমি বেশ ভালই আছ দেখছি,' দাদা বললেন। 'হ্যাঁ', আমি জবাব দিলাম।

'শ্রীযুত হো-কে আমি আজ এখানে ডেকে এনেছি', দাদা আবার বললেন। —'তিনি তোমায় পরীক্ষা করবেন।'

'বেশ তো,' আমি বললাম। কিন্তু আমি ঠিক জানি, বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর কেউ নন। ছদ্মবেশী ঘাতক!

নাড়ী দেখার ফাঁকতালে তিনি বুঝি যাচাই করে নিতে চান আমার শরীরে মাংস আছে কতখানি। তা হোক, আমি কিন্তু ভয় পাই না। যদিও আমি মানুষের মাংস খাইনা তবুও আমি ওদের চাইতে বেশী সাহসী। আমি আমার হাতের মুঠি দুটো সামনে তুলে ধরলাম। আর লক্ষ্য করতে লাগলাম ওরা কি করে। বুড়ো ভদ্রলোক এবার বসে পড়লেন। চোখ বুঁজলেন। কি যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর তিনি তাঁর নিশ্চল চোখদুটি মেলে বললেন, 'আকাশ কুসুম অত শত ভেব না। কিছুদিন বিশ্রাম কর। তাহলেই তুমি সেরে উঠবে।'

'কল্পনার পিছনে ছুটো না! আকাশ কুসুম ভেব না! দিনকয়েক চুপচাপ বিশ্রাম কর!' আর আমি যখন মোটাসোটা হব ওদের তখন খেতে মজা হবে। কিন্তু তাতে আমি সেরে উঠব কি করে? এইসব লোকগুলো মানুষের মাংস খেতে চায়। আর ভালোমানুষী একটা মুখোশও এঁটে নেয়। এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে আমি কিন্তু হেসে মরি। আমি এত মজা পেলাম যে আমার

বিকট হাসি পেল। না হেসে পারলাম না। আমার এই হাসির মধ্যে সাহসের ছাপ আছে। ন্যায়পরায়ণতাও আছে। কিন্তু বুড়ো ভদ্রলোক আর আমার দাদার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার হাসি দেখে ওঁরা অবাক হয়ে গেলেন। যেহেতু আমি সাহসে বুক বাঁধলাম, ওঁরা তখন আমায় খাবার জন্য আরও লালায়িত হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধভদ্রলোক বাইরের ফটকে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আর বেশীদূর না গিয়ে দাদাকে ফিসফিস্ করে বুঝি বললেন :

'এখনই খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়।' আর তাতে দাদা মাথা নাড়লেন। তাহলে ওঁরা তাই করছেন! এই ভয়ঙ্কর আবিষ্কার আমার মনের মধ্যে ধাক্কা দিল। আমার দাদাও তাহলে আমাকে খাবার ফঁন্দি আঁটছেন!

মানুষখেকোদের মধ্যেও আমার দাদা!

মানুষের মাংসখেকোর একজনের আমি ছোট ভাই!

আমাকে ধরে অন্যলোকে হয়ত খাবে। তাহলেও আমি তো মানুষখেকো একজনেরই ছোট ভাই!

এ কয়দিন ধরে আগেকার কথাগুলি ভাবছিলাম। বুড়ো ভদ্রলোকটি হয়ত প্রকৃতই ডাক্তার, ছদ্মবেশী জল্লাদ নন। মানুষের মাংস তিনি হয়ত নাও খেতে পারেন। কিন্তু এঁদের পূর্বসূরী লি শী জেন-এর ভোজ শাস্ত্র গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে যে মানুষের মাংস ভেজে খাওয়া যায়। এখনও কি তিনি বলতে চান যে তিনি মানুষের মাংস খান না?

আর আমার দাদাকে যদি ধরি, তাঁকেও কিন্তু রেহাই দেওয়া যায় না। তিনি যখন আমায় পড়াতেন, তাঁর নিজ মুখেই শুনেছি 'লোকের নিজ সন্তান বিনিময় করে খাবারের জন্য।' (চীনের প্রাচীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

আর একবার এক বদচরিত্র লোকের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'লোকটাকে প্রাণে মেরে ফেলাই কেবল উচিত হবে না, তার মাংস খেতে তার চামড়া উপড়ে ফেলতে হয়।' (প্রাচীন চীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

আমি ছোটই ছিলাম। তাই শুনে আমার বুকের কাঁপুনিটা বেড়ে গেল। মানুষের হৃৎপিণ্ড খাবার যে কাহিনী নেকড়েছানা গ্রাম থেকে এসে আমাদের রায়তটি সেদিন বলেছিল, তা শুনে দাদা মোটেই অবাক হন নি। কেবল মাথা নাড়ছিলেন। তা থেকে প্রমাণ হয় যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয় নি।

'খাবারের জন্য সন্তান বিনিময়' যদি সম্ভব হয় তবে খাবারের জন্য যাকে তাকে বিনিময় করাও চলে। আগে আমি কেবল তাঁর ব্যাখ্যাই শুনে গিয়েছিলাম।

এখন দেখছি তাঁর ঠোঁটে জলও এসে গেছে। তিনি লালায়িত হয়ে উঠেছেন মানুষের মাংস খেতে। জমাট অন্ধকার। আমি জানতে পারলাম না এখন দিন না রাত্রি। চাও পরিবারের কুকুরটা আবার যেন ডাকতে শুরু করেছে।

সিংহের হিংস্রতা; শশকের শঙ্কা; আর শিয়ালের শঠতা!

ওরা কি করবে, আমি জানি। ওরা সরাসরি আমাকে খুন করতে চায় না পরিণামের কথা ভেবে। তাই সবাই আমায় ধরে বেঁধে রেখেছে। যেন আমি নিজেই মরতে পারি। কিছুদিন আগে দেখা রাস্তার সেই লোকটা আর মেয়েমানুষটির দৃশ্যটা আমার চোখে ভেসে উঠল। আমার দাদার মতিগতিও বুঝি তাই। ওরা চায় কেউ তার কোমরের বাঁধনটা খুলে নিক, আর তাই গলায় বেঁধে সে কোন এক খুঁটি থেকে ঝুলে পড়ুক। আত্মহত্যা করুক। তাহলে হত্যার অভিযোগে তাদের দায়ের করা হবে না। তাহলে তাদের মনের আশা পূর্ণ হবে। খুশীর আনন্দে সবাই হেসে উঠবে খিলখিল করে। অপরদিকে যদি কেউ এভাবে মরতে ভয় পায়, অবশ্য তাতে কোন লাভ হবে না। তাহলেও ওরা কিন্তু তাকে রেহাই দেবে না, তবুও খেতে চাইবে। তাহলে ওরা কি মরা মানুষের মাংস খাবে? আমার মনে পড়ছে কোথায় যেন এক হিংস্র জন্তুর কথা পড়েছিলাম। চোখে তার ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। নাম 'হায়না'। ওরা কেবল মরার মাংস খায়। কঠিন, শুকনো, হাড়কেও কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। কথাটা মনে হলেই ভয়ে গা শিরশির করে ওঠে। হায়নারা হল নেকড়েবাঘের জাত আর হায়না হল কুকুরের পিসী। সেদিন তো চাও বাড়ীর কুকুরটা কয়েকবার তাকালে। নিশ্চয়ই কুকুরটাও এদের সঙ্গে একই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির চোখ দুটি নত ছিল। তিনি কি করে আমায় প্রতারণা করবেন?

হঠাৎ দাদা রেগে গেলেন। কটমট করে তাকালেন। চীৎকার করে বলে উঠলেন:

'যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে সবাই! একটা পাগলের দিকে অমন হাঁ করে তাকাবার কি আছে?'

আমি তখন বুঝতে পারলাম ওদের শঠতা। ওরা এক চুলও নড়ছে না। ফাঁদটা বেশ পাকা হয়েছে। ওরা আমায় পাগল আখ্যা দিয়েছে। ভবিষ্যতে আমায় যখন ওরা খেয়ে ফেলবে তখন আর কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না তাদের। লোকজন সবাই বুঝি তখন কৃতজ্ঞ থাকবে ওদের কাছে।

আমাদের গাঁয়ের চাষীটি যখন গ্রামবাসীদের কাছে সেই বদস্বভাবের লোকটাকে খেয়ে ফেলার গল্প করছিল, তখনও ঠিক এমনি ধারা পন্থাই গ্রহণ করা হয়েছিল। ঠিক পুরনো সেই ফন্দি।

বুড়ো চেনও ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। কিন্তু ওরা আমায় রুখতে পারল না। আমি সবাইকে লক্ষ্য করে বলে উঠলাম :

'তোমাদের মত বদলাও, মত বদলাও মনের অন্তস্তল থেকে।'

আমি আরও বললাম, 'জেনে রেখো ভবিষ্যতে নরখাদকদের পৃথিবীতে কোন স্থান নেই। তোমাদের মত যদি না বদলাও তাহলে নিজেরা নিজেদেরই খেয়ে ফেলবে। নতুন নতুন জন্ম হলে কি হবে, তারা এমনি ভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে। নেকড়ের দল যেমনভাবে মারা পড়ে শিকারীর হাতে ঠিক যেন সরীসৃপের মত।

বুড়ো চেন সবাইকে তাড়িয়ে দিলে। দাদাও কোথায় যেন কেটে পড়লেন। বুড়ো চেন আমায় তখন ঘরে ফিরে যেতে উপদেশ দিলে। ঘরটা যেন আলকাতারার মত কালো অন্ধকার। সার্শি দিয়ে একফালি আলো এসে ছিটকে পড়েছে আমার মাথার উপর। আলোটা যেন ক্রমশঃ বড় হতে লাগল। আমার মাথার উপর এসে পুঞ্জীভূত হতে লাগল।

আলোটা এত ভারী যে আমার আর নড়বার শক্তি রইল না। আমার মরা উচিত, তাই বুঝি জানিয়ে দিল। আমি জানতাম মিথ্যে ঐ বোঝাটা। তাই চেষ্টা করতে লাগলাম মুক্তি পাবার। আর নেয়ে উঠলাম ঘেমে। কিন্তু আমার বলা উচিত ছিল :

'এখনই তোমাদের বদলানো উচিত নিঃশেষে : জেনে রেখো ভবিষ্যতে নরখাদকদের কোন স্থান নেই পৃথিবীতে…'

দরজাটি খোলা হয় নি। সূর্যের আলো এসে ঢোকে না। দুবেলা খাবারই শুধু দিয়ে যায় প্রতিদিন।

আমি আমার খাবারের চোপস্টিক দুটি তুলে নিলাম। আর ভাবতে লাগলাম দাদার কথা। ছোট বোনের মৃত্যুর কথা। উনি ছিলেন তার জন্য দায়ী। বোনটির বয়স তখন সবেমাত্র পাঁচ। ভারী মিষ্টি আর আদুরে। আমার চোখের উপর এখনও তার মুখখানি ভেসে ওঠে। মা কাঁদছেন তো কাঁদছেন। দাদা মাকে কাঁদতে নিষেধ করলেন। নিজে বোনকে খেয়ে ফেলেছেন কিনা তাই। কেননা, কান্নাকাটি করলে তাঁরই তো মাথা কাটা যাবে। অবশ্য যদি তাঁর কোনো লজ্জাশরম বোধ থাকে।

দাদা বোনটিকে খেয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু জানি না, মা তা টের পেয়েছিলেন কি না।

আমার মনে হয় মা নিশ্চয় জানতে পেরেছিলেন। যখন তিনি কাঁদছিলেন তিনি অবশ্য মুখ ফুটে কিছু বলেন নি। তাহলে কাজটা ঠিক হত না। আমার মনে পড়ে যখন আমার বয়স চার কি পাঁচ আমি একদিন আমাদের হলঘরের সামনে ঠাণ্ডায় বসেছিলাম। দাদা তখন আমায় বলেছিলেন, যদি কারুর বাপ-মায়ের অসুখ করে তিনি তাহলে তাদের এক টুকরো মাংস কেটে নিয়ে সিদ্ধ করে খাইয়ে দেবেন। তাহলেই ওরা ভাল হয়ে যাবে। মা অবশ্য তার কোনো প্রতিবাদ করেন নি। যদি একখণ্ড মাংস খাওয়ানো যায় তাহলে আস্ত একটা মানুষ খাওয়া যাবে না কেন! যদি তাকে সুসন্তান হতে হয়! মা তাই প্রতিবাদ করেন নি। যদি এক টুকরো মাংস খাওয়ানো যায় তাহলে সবটা খেতে দোষ কি! তাই যদি হয়, তবে অত ঘটা করে কান্নাকাটি কেন? ব্যাপারটা আগাগোড়া বিসদৃশ্য নয় কি?

আমি যে আর ভাবতে পারছি না।

আমি সবেমাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম—এত বছর আমি এমন এক স্থানে বাস করছি যেখানে চার হাজার বছর ধরে মানুষ মানুষের মাংস খেয়ে আসছে। বোন মারা গেলে দাদাই এবাড়ীর দায়িত্বভার নেন। আর তখন কি তিনি আমাদের অজ্ঞাতসারে খাবারের সঙ্গে—ভাত আর তরকারির সঙ্গে আমার বোনের মাংস হয়ত খেতে দিয়েছিলেন।

এ অবশ্য অসম্ভব নয় যে অজ্ঞাতসারে আমি আমার বোনের মাংস কয়েক টুকরো খেয়ে ফেলেছি। এবার বুঝি আমার পালা!···

আমার মত একজন লোক কি করে চার হাজার বছরের নরখাদকদের ইতিহাসে—যদিও প্রথম প্রথম কিছুই আমি জানি না এ বিষয়ে—আসল মানুষের মুখোমুখি হতে আশা করি?

এখনো এমনও হয় তো বহু ছেলে মেয়ে আছে যারা মানুষ খায় নি!

বাঁচান ছেলে মেয়েদের!···

অনুবাদঃ নিখিল সেন

এপ্রিল ১৯১৮

শেষ ট্রেন

লাও চাঅ

বহুক্ষণ আগেই ট্রেনটা ছেড়েছিল। এখন রেলের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের ধাতব আওয়াজ উঠছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাত্রির প্রহর গুণছে যাত্রীরা; সাতটা, আটটা, নটা, দশটা—দশটার মধ্যে যদি ট্রেনটা পৌঁছে যায় তো মাঝরাত বরাবর ওরা বাড়ী পৌঁছবে, হয়ত খুব দেরী নাও হতে পারে—তা যদি হয় তো ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়বে। আজ নতুন বছরের দিন বাড়ী ফিরে যাবার তাড়া ওদের সবার। তাকের ওপর স্তূপীকৃত বাকস্, ফলের চুবড়ি ও খেলনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 'বাবা' 'বাবা' বলে ছেলেমেয়েদের চিৎকার যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ওরা। এসব কথা ভাবতে ভাবতে ওরা একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে। কিন্তু এমন যাত্রীও বহু আছে যারা খুব ভালভাবেই জানে যে আগামীকাল ভোর হবার আগে বাড়ী পৌঁছাতে পারবে না। সহ-যাত্রীদের হাবভাব লক্ষ্য করতে করতে ওরা আবিষ্কার করেছে যে এমন একটি লোকও এখানে নেই যার সঙ্গে ওদের সুদূরতম পরিচয়ও আছে, আবিষ্কার করে ওরা আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। ওরা যখন বাড়ী পৌঁছবে, তখন শম্বুকগতি দেখে অভিসম্পাত দিচ্ছে মনে মনে। যদিও কামরার ভেতরেই ওদের শারীরিক উপস্থিতি, এখানেই ওরা ধূমপান করছে, চায়ে চুমুক দিচ্ছে, হাই তুলছে আর কাঁচের জানালার ওপর নাক চেপে তাকিয়ে আছে বাইরের অতল অন্ধকারের দিকে—কিন্তু মনে মনে ইতিমধ্যেই বহুবার ওরা বাড়ী পৌঁছে আবার ফিরে এসেছে। চোখের জল গোপন করবার জন্যে এবার ওরা মাথা নীচু করে হাই তুলছে বারবার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় খুব বেশী যাত্রী নেই। মোটা চ্যাঙ আর রোগা চিয়াও একই কামরায় মুখোমুখি বসে আছেন। অন্য কোথাও যাবার দরকার হলে তাঁরা নিজেদের আসনে কম্বল বিছিয়ে রেখে যাচ্ছেন, উদ্দেশ্য—উৎপাত-কারীদের জানিয়ে দেওয়া যে এখানে তাদের সহ্য করা হবে না। ট্রেন ছাড়বার পর তাঁরা দেখলেন যে যাত্রী প্রায় নেই বললেই চলে, দেখে কেন জানি তাঁদের

মনে দুঃখ হল—বোধ হয় এই ভেবে যে এই বড়দিন নতুন বছরের সময়ে তাঁদের কিনা ট্রেন ভ্রমণ করতে হচ্ছে। এই দুইজন যাত্রীর মধ্যে আরও অনেক মিল আছে—দুজনেই ফ্রী পাস-এ যাতায়াত করছেন; দুজনেই গতকালের আগে পর্যন্ত পাস যোগাড় করতে পারেননি; সুতরাং দুজনেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে পাস দেবার ক্ষমতা যার আছে, পাস না দিয়ে আসল যাত্রীদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আটকে রাখবার অধিকারটুকুও তার আছে। এই ব্যবহারে দুজনেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন—কারণ, আগেকার যুগে বন্ধুত্বে এত ভেজাল থাকত না। এই সব কথা ভেবে মাথা নাড়তে নাড়তে দুজনেই সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন এই তথাকথিত বন্ধুদের ওপর, যারা তাঁদের নতুন বছরের দিন বাড়ী পৌছাতে বাধা দিয়েছে।

গায়ের শেয়াল-লোমের কোটটা খুলে জোড়াসন হয়ে বসলেন চ্যাঙ। বসেই বুঝতে পারলেন এই আরামজনক ভঙ্গীতে বসবার পক্ষে আসনটা যথেষ্ট চওড়া নয়। ইতিমধ্যে কামরার ভেতর উত্তাপ বেড়ে গেছে, এবং ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে তার কপাল থেকে। 'বয়, তোয়ালে!' বলে তিনি একটা হাঁক দিলেন, তারপর চিয়া-ওর দিকে ফিরে বললেন, 'আজকাল কেন যে এত গরম হয় বুঝতে পারিনা।'

একটু দম নিয়ে আবার বললেন, 'বিমানে যাতায়াত করলে এত গরম হয় না।'

চিয়াও বহুক্ষণ আগেই কোট খুলে ফেলেছিলেন। এখন তাঁর গায়ে শাদা ভেড়ার লোমের আস্তর দেওয়া একটা ঢিলে জামা, তার উপর চাপিয়েছেন কালো সার্টিনের তৈরী একটা জ্যাকেট। তাঁর ভেতর ক্লান্তির কোন রকম চিহ্ন ছিল না। তিনি বললেন, 'আজকাল বিমানের ফ্রী পাস পাওয়া যায়। এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।'

কথাটা বলে টেনে টেনে অস্ফুটভাবে হাসলেন তিনি।

চ্যাঙ বললেন, 'বিমান যাত্রার ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।' কথা বলতে বলতে যদিও তিনি পা মুড়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু অনেক কষ্টে বসতে পারলেন সে ভাবে। 'বয়, তোয়ালে!' 'বয়'টির বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। ঘাড়টা কাঠির মতো সরু—এত সরু যে মনে হয় অত্যন্ত সহজে ওর মাথাটা ভেঙে নিয়ে আবার বসিয়ে দেওয়া যায়। প্রায় সব সময়েই দেখা যাবে উত্তপ্ত ধূমায়িত তোয়ালে হাতে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। কাজ করতে ও সব সময়েই উদগ্রীব। কিন্তু একথাও ঠিক, যে

ভাবে কর্তৃপক্ষ এমন একটা উৎসবের দিনেও ওকে কাজে আসতে বাধ্য করেছে তা সত্যিই কল্পনা করা যায় না। কামরার সামনের দিকে ক্ষুদে স্থইকে দেখতে পেয়ে নিজের ক্ষোভটা ও প্রকাশ করে ফেলল, 'আচ্ছা, দেখ তো ভাই, সাতাশ আটাশ তারিখে আমি ডিউটি করেছি স্থতরাং আজ আমার ছুটি পাবার কথা। আর শেষ সময়ে কিনা লিউমশাই বললেন—শোন, নতুন বছরের দিন তোমাকে বেরুতে হবে। ঠিক এই কথাই উনি বললেন। আচ্ছা, ষাটজন লোক তো এই লাইনে কাজ করে আর বেছে বেছে কিনা আমাকে ধরা হলো। অবশ্য, নতুন বছরের জন্য আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু অবিচারটা দেখ।' কথাটা বলেও একবার বকের মতো ঘার বেঁকিয়ে তাকাল মোটা চ্যাঙের দিকে।

কিন্তু এক পাও নড়ল না সেখান থেকে। নিংড়ে-রাখা তোয়ালেগুলো খুলল একে একে, একটা তোয়ালে ক্ষুদে স্থইর হাতে দিয়ে বলল, 'নাও না একটা, তারপর আবার পুরনো নালিশে ফিরে গেল, 'লিউমশাইকে আমি বলে দিয়েছি যে নতুন বছরের জন্যে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু ওঁরও বোঝা দরকার যে ঐদিন আমার ছুটি থাকার কথা। ওঁকে বললাম যে, সারা বছর আমি কাজ করেছি স্থতরাং একটা দিন আমার ছুটি পাওয়া উচিত।' কথাটা বলে ও ঢোঁক গিলল। জলের ভেতর হঠাৎ একটা বোতল উলটিয়ে ধরলে যেমন বুদ্‌বুদ্ ওঠে তেমনিভাবে ভেসে উঠল ওর কণ্ঠমনিটা। ওর গলা এমন ধরে গিয়েছিল যে কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। 'আমার আর ভাল লাগে না—আজকাল চারিদিকেই শুধু গোলমাল।'

ক্ষুদে স্থইয়ের ফ্যাকাশে হলদে মুখের ওপর হাসির মত একটা কিছু ফুটে উঠল। সহানুভূতি দেখাবার জন্যে মাথাটা একটু কাত করতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু কেন জানি তা পারল না। তারও নিজস্ব কতগুলো অস্থবিধা আছে। এ লাইনে সবাই তাকে চেনে—এমন কি, স্টেশন মাস্টার ও মিস্ত্রীরা পর্যন্ত। সবাই তার বন্ধু। তার ফ্যাকাশে হলদে মুখটা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের মত—যানবাহন বিভাগের মন্ত্রী নিজেও এই কথার যাথার্থ্য অস্বীকার করতে সাহস পাবেন না। আর সবাই জানে যে লাইনে বেরুলে তার পেঁটরার ভেতর একশো কি দুশো পাউণ্ড আফিম থাকে আর সবাই স্বীকার করে যে একাজ করবার অধিকার তার আছে।

আর ক্ষুদে স্থই নিজেও খুব সাবধানী। কারু পেছনে লাগে না বা কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না পাছে লোকের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়।

লোকের দুঃখ সে খুব ভালভাবেই বোঝে এবং প্রত্যেককেই সে সহানুভূতি দেখাতে চায়।

কারও প্রতি দুর্ব্যবহার করে না বলেই কাউকে ভয়ও করে না। জীবনের এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তার টিকিটের ওপর—অর্থাৎ তার মুখের ওপর।

'আমাদের সবার ওপরেই এত কাজের চাপ', এবার সে নালিশ জানাতে শুরু করল। তার ধারণা, তার নিজের অসুবিধাগুলি উল্লেখ করতে পারলেই 'বয়'টির উপকার করা হবে। সে বলল যে সম্পুর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবার সে বেরিয়েছে, এর চেয়ে বাড়ীতে আরামে বসে থাকা ঢের ভাল। কিন্তু উপায় ছিল না, ঠিক পরের দিনেই তার সঙ্গে একটি রক্তচোষা মেয়ের দেখা হবার কথা, দেখা হলে মেয়েটি তার সর্বস্ব নিয়ে নিত। কালো কালো দাঁত বার করে হাসল সে। তাঁরপর গাল দুটো ফুলিয়ে থুথু ফেলল মেঝের ওপর।

কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া হতে দেরী হল না। 'বয়'টিকে দেখে মনে হল যেন নিজের দুঃখ ভুলে গিয়েও এখন উপভোগসূচক ঘাড় নাড়ছে। হাতের তোয়ালেগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আবার জলে ডুবোবার জন্যে ও নিজের কেবিনে ফিরল। বেরিয়ে এসে একটিও কথা না বলে ক্ষুদে সুইর পাশ কাটিয়ে চলে গেল ও। একবারও ফিরে তাকাল না, এমন ক্লান্ত একটা ভঙ্গীতে চোখ বুঁজে রইল যেন ও দেখাতে চাইছে যে ক্ষুদে সুইর সান্ত্বনা সত্ত্বেও ও নিজের ক্ষোভ ভোলেনি। ট্রেনের দুলুনির সুযোগ নিয়েও ঝুঁকে দাঁড়াল কাউ নামে এক যাত্রীর দিকে। '—তোয়ালে চাই, হুজুর? বছরের এই সময়ে ট্রেনে যাতায়াত করার যে কি কষ্ট।' নিজের মনের ক্ষোভকে নতুন শ্রোতার কাছে বলবার ইচ্ছে হয়েছে ওর, কিন্তু কাউকে ও খুব ভাল করে চেনে না, তাই যতদূর সম্ভব ঘুরিয়ে কথা শুরু করল।

কাউর পোশাকের রীতিমত জাঁকজমক আছে। পরনে আনকোরা নতুন কালো সার্টিনের সঙ্গে ফারের কলার লাগানো ঘন সার্জের ওভারকোট। মাথায় তরমুজের আকারের টুপি। টুপি বা কোট কোনটাই তিনি খোলেন নি। টান হয়ে বসে আছেন নিজের আসনে যেন সভাপতি অপেক্ষা করছেন বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা শুরু করবার মুহূর্তটির জন্যে। তোয়ালে নেবার জন্য হাতটা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করে দিলেন এবং কনুইয়ে যেন এতটুকু ভাঁজ না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাতটা একটুও না বেঁকিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ধরলেন মুখের সামনে। তারপর একটা দারুন অসন্তোষের ভাব ফুটিয়ে তুলে

সাড়ম্বরে মুখ মুছলেন তিনি। তোয়ালের ঘূর্ণমান আবর্ত থেকে তাঁর মুখটা যখন বেরিয়ে এল, তখন তা চকচক করছে এবং একটা নতুন সৌষ্ঠব ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেই মুখে। 'বয়'-এর দিকে তাকিয়ে তিনি একবার শুধু মাথা নাড়লেন কিন্তু কেন যে তিনি নতুন বছরের দিনে ট্রেনে ভ্রমণ করছেন সে সম্পর্কে কোন কথা বললেন না।

'ওয়েটার হওয়ার মত খারাপ কাজ আর নেই', বয়টি বলল। কাউকে ও এত সহজে ছাড়বে না। ও জানে যে, ক্ষুদে সুইর কাছে ও যে সব কথা বলেছে সেই কথাগুলোই আবার এখানে বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঠিকমত ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে এখানে যেন কথার গাম্ভীর্য ও সততা বজায় থাকে। 'নতুন বছরের দিন লোকের বিশ্রাম করা উচিত', ও বলে চলল, 'কিন্তু আমাদের বিশ্রাম নেই। আমরা কিছুই করতে পারি না।' তারপর ব্যবহৃত তোয়ালে ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর একটা নেবেন, হুজুর ?'

কাউ মাথা নাড়লেন। স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি 'বয়' এর দুর্দশা দেখে অভিভূত হয়েছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে কোন আলাপ আলোচনা করা ঠিক পছন্দ করছেন না। এ লাইনের সকলেই জানে যে তিনি ম্যানেজারের বন্ধু এবং যখন খুশি বিনা ভাড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করবার সুবিধাটুকু তিনি উপভোগ করতে পারেন। এ জন্যে তাঁর পরিচয়পত্রটুকুই যথেষ্ট। একজন ওয়েটারের সঙ্গে অসংবদ্ধ আলাপ-আলোচনা না করলেও চলে।

এদিকে ওয়েটারটি কিন্তু বুঝতে পারলে না, কাউ কেন মাথা নাড়ছেন। কিন্তু ও আর কি করতে পারে ? ও খুব ভাল করেই জানে যে এই লোকটি ম্যানেজারের বন্ধু। কামরাটা আবার দুলতে আরম্ভ করল এবং সেই দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে ও ছিটকে পড়ল যাতায়াতের পথটার দিকে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আর একটা তোয়ালে খুলল এবং তোয়ালেটার দু কোণে আলতোভাবে ধরে নিয়ে গেল চ্যাঙের কাছে। 'আপনি একটা নেবেন হুজুর ?' তিনি হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা নিলেন এবং হাতের পুরু তালু দিয়ে চেপে ধরলেন তোয়ালের মাঝখানের উচ্চতম জায়গাটাকে, এবং এমনভাবে মুখের উপর ঘষতে লাগলেন যেন আয়না পরিষ্কার করছেন। তারপর তিনি আর একটা তোয়ালে নিয়ে চিয়াওকে দিলেন। চিয়াও কোনরকম উৎসাহ দেখালেন না, তোয়ালেটা নিয়ে আলতোভাবে নাকের গর্ত আর হাতের নখ পরিষ্কার করতে লাগলেন। তোয়ালেটা ফিরিয়ে দেবার সময় দেখা গেল আগাগোড়া তেল ও কালিতে নোংরা হয়ে গেছে।

'এক্ষুণি ইন্‌সপেক্টর আসবে', এই বলে ও কথা আরম্ভ করল। ও খুব ভাল করেই জানে যে নিজের দুঃখ-দুর্দশার ফিরিস্তি দিয়ে কথা শুরু করার মত খারাপ কৌশল আর নেই। পাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে ভিতরে ঢুকবার মতলব ওর। 'ইন্‌স্‌পেক্টর চলে গেলে আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্রাম করতে চাইবেন তখন যদি আপনাদের কুশান দরকার হয় তো একবারটি শুধু বলবেন আমাকে।'

একটু থেমে আবার ও বলল, 'ট্রেনে আর ভীড় নেই। -সুতরাং ঘুমোতেও বিশেষ অসুবিধা হবে না আপনাদের। আজকের মত একটা দিন হুজুরদের যে ট্রেনে কাটাতে হচ্ছে তা খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমাদের মত ওয়েটারের পক্ষে—' ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ও বুঝতে পেরেছে যে বড় বেশী কথা বলছে ও। কোন দিকে হাওয়া বইছে সেটা আগেই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। চ্যাঙের হাতে আর একটা তোয়ালে দিল ও। চ্যাঙ দেখলেন প্রসাধন পর্বটা বড় বেশী সময় নিচ্ছে কিন্তু তিনি ভুলে যাননি যে এখনো তাঁর সত্যকর্তিত চুল মোছা হয়নি। মাথার খুলির ওপর তোয়ালে ঘষাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। অন্য কাজের তুলনায় বেশ শক্তই বলতে হবে কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চুল মোছা পর্বটা শেষ করে তিনি আরামের নিশ্বাস ফেললেন। ওদিকে চিয়াও দ্বিতীয়বার আর তোয়ালে নেন নি। নিজের সত্য পরিষ্কৃত আঙুলের নখ দিয়ে মনের আনন্দে দাঁত খুঁটে চলেছেন তিনি।

'আগুনের ব্যবস্থাটা কি ঠিক নেই?' তোয়ালেটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চ্যাঙ বললেন।

ও উত্তর দিল, 'আমার কথা যদি শোনেন তো জানালা খুলবেন না। নটা থেকে দশটা পর্যন্ত ভীষণ ঠাণ্ডা লাগবে। এই লাইনে কর্তাদের সমস্ত বন্দোবস্তই গোলমেলে।' এত বড় সুযোগ আর আসবে না, তাড়াতাড়ি ও আসল কথাটা পেড়ে বসল, 'এখানে সারা বছরই কাজ করতে হয়, এমন কি নতুন বছরের দিনেও ছুটি নেই। আমাদের কোন কথায় কেউ কান দেয় না।'

এরপর আর কথা এগোল না, কারণ ইতিমধ্যে ট্রেন একটা ছোট-স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাক্‌স্‌-পেঁটরা নিয়ে একদল যাত্রী নেমেছে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে এবং দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে স্টেশনের বাইরে যাবার গেটের দিকে। কারও কারও একটু ইতস্ততঃ ভাব। যেন ভেবে দেখছে ট্রেনে কোন কিছু ফেলে এসেছে কিনা। কামরার ভেতর যারা রয়ে গেছে তারা ঈর্ষা ও উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে কাঁচের জানালার ওপর নাক চেপে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে

কেউ নামে নি কিন্তু প্রায় আধ ডজন সৈন্য উঠেছে কামরাটার ভেতর। মেঝের ওপর ভারী বুটের বাজখাঁই আওয়াজ, চামড়ার বেল্‌টের ঝলসানি। ওদের সঙ্গে রয়েছে নানারকম বাজীতে ঠাসা চারটে প্রকাণ্ড বড় বড় বাক্‌স। বাক্‌সগুলো লাল টক্‌টকে কাগজে মোড়া, মোড়কের ওপর সোনালী কাগজের আঁকিঝুঁকি। সেগুলো এত বড় যে কোথায় রাখা হবে তাই ঠিক করতে পারছে না কেউ। জুতোর মশমশানি, ত্রস্ত আনাগোনা, চড়া গলার কথাবার্তা, তবুও বহুক্ষণ পর্যন্ত বাক্‌স চারটে একটা সমস্যা হয়ে রইল। অবশেষে একজন লোক—দেখে মনে হয় ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার—বলল যে ওগুলোকে মেঝের ওপরেই রাখা হোক। প্লেটুন কমাণ্ডার সেই কথা পুনরাবৃত্তি করতেই নীচু হয়ে আদেশ পালন করল লোকগুলো, পরে টান হয়ে দাঁড়িয়ে গোড়ালি ঠুকল একবার। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার স্যালুট ফিরিয়ে দিয়ে ডিস্‌মিস্‌ করে দিলেন ওদের। ভারী বুটের বাজখাঁই আওয়াজ উঠল আর একবার, ধূসর টুপি, ধূসর সাজপোশাক, ধূসর ফেট্টির একটা আবর্ত পাক খেয়ে গেল।

কার যেন গলা শোনা গেল, 'চট্‌পট্‌'। অনুগতভাবে বেরিয়ে এল ওরা। ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ বেজে উঠল, শব্দটা কেমন যেন চাপা। তারপর আলো-ছায়ার চাঞ্চল্য, চাকার ঘড় ঘড় আওয়াজ, স্টেশন ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল ট্রেনটা।

কামরার এদিক ওদিক পায়চারি করছে ওয়েটার, যেন কিছু একটা মতলব আছে ওর। দু-একবার আড়চোখে তাকিয়েছে সৈন্য দুজনের দিকে। যাতায়াতের পথ আটকিয়ে মেঝের ওপর উদ্ধত ভঙ্গীতে বসানো বাজীর বাক্‌সগুলোর দিকেও চোখ পড়েছে মাঝে-মাঝে, কিছু বলবার সাহস নেই ওর। ক্ষুদে সুইর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে এল ও। ছাড়া ছাড়া অসংবদ্ধ আলাপ—সেই একই বিষয় এবং একই ভাষা, কিন্তু এবার নিজের দুঃখদুর্দশার বিবরণ আরো একটু সন্তোষজনকভাবে যোগ করে দিতে পেরেছে ও। ক্ষুদে সুই আবার তার মেয়ে বন্ধুদের কথা বলেছে।

কিন্তু ও সেই বাজীর বাক্‌সগুলোর অস্তিত্ব ভুলতে পারছিল না। ক্ষুদে সুইর কাছ থেকে উঠে এসে ও কামরার এদিক ওদিক ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে পায়চারি করতে লাগল। কোণের ছোট টেবিলের ওপর পিস্তলটা রেখে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার সাহস অবশ্য প্লেটুন কমাণ্ডারের হয় নি। কিন্তু টুপি খুলে রেখে সেও প্রবলভাবে মাথা চুলকোতে শুরু করেছে। সিনিয়র অফিসার যেন জেগে না ওঠে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে জুনিয়র অফিসারটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ গদগদভাবে

হাসল ও। 'কি যেন বলছিলাম আমি', আমতা আমতা করে এমনভাবে ও কথা বলল যেন কিছু একটা দোষ করে ফেলেছে, 'ও হ্যাঁ, বলছিলাম কি, ওই বাজীর বাক্সগুলো তাকের ওপর রেখে দিলে বোধ হয় ভাল হত।'

'কেন?' মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাঁকা দৃষ্টিতে, ওর দিকে তাকিয়ে অফিসারটি জিজ্ঞেস করল।

'মানে, লোকে হয়ত অসাবধানে ওর ওপর পা দিয়ে ফেলবে, সেই জন্যেই আর কি', উত্তর দেবার সময় মাথাটা কচ্ছপের মত সেঁদিয়ে দিল দুই কাধের ভেতর।

'বটে! কার এত সাহস শুনি? কেন যাবে সে ওই বাক্সগুলোর কাছে?' গোল গোল ভাঁটার মত চোখ দুটো খোঁচ করে অফিসারটি জিজ্ঞেস করল।

'তা তো বটেই, তা তো বটেই!' বিনীত হাসিতে ওয়েটার গোল হয়ে উঠল, মুখটা দেখাল আরো ছোট—যেন প্রকাণ্ড একটা অদৃশ্য পাথর ওকে চেপে ধরেছে, 'ওখানে থাকলেও কিছু ক্ষতি নেই। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন জানতে পারি কি?'

'ফের যদি গোলমাল করতে চাও তো তার আগে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক, এস।' অফিসারটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। সিনিয়র অফিসারের দুর্ব্যবহারে আগে থেকেই তার মেজাজটা ভাল ছিল না। এই অবস্থায় যে কোন ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করে ফেলবার জন্য সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কিন্তু এই ধরনের বোঝাপড়া করবার কোন ইচ্ছা ওয়েটারের ছিল না। সেখান থেকে দ্রুত অদৃশ্য হল ও। চ্যাঙের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, 'এক্ষুণি ইনসপেক্টর আসবে, হুজুর।'

ইতিমধ্যে চ্যাঙ ও চিয়াওর মধ্যে অকপট বন্ধুত্ব হয়েছে। টিকেট দেখা শুরু হল। দু-জন ইন্সপেক্টর, পেছনে তিনজন লোক। ফরসা গায়ের রঙ, উঁচানো নাক। দ্বিতীয় জনের মাথায়ও একই ধরনের সোনালী ফিতে লাগানো টুপি, কিন্তু লোকটি বেঁটে। গায়ের রঙ ময়লা, মুখে সব সময়ই হাসি লেগে আছে। প্রথমজনের রুক্ষ ব্যবহারে যে সব যাত্রী চটে ওঠে, তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করবার একটা ক্ষমতা কি করে যেন আয়ত্ত করছে দ্বিতীয়জন। যতক্ষণ ওরা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় থেকেছে ততক্ষণ দুজনের মুখেই একটা গমগমে ও ভারিক্কী ভাব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে লোকটির মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এর পর যখন ওরা প্রথম শ্রেণীতে যাবে

তখন দুজনেই হাসবে উদার ভাবে। তৃতীয় জন তিয়েনৎসিন-এর লোক। আকারে দৈত্যকায়, হাতে পিস্তল, কোমরের বেলটে থাকে থাকে সাজানো টোটা। চতুর্থজনও দৈত্যকায়, শান্‌টুঙ-এর লোক। তার কাছেও টোটাভর্তি বেলট্‌ ও পিস্তল। কিন্তু এছাড়াও একটা লম্বা তরোয়াল আছে তার কাছে। পঞ্চমজন সেই ওয়েটার। মাথাটা নিয়ে হয়েছে ওরা যন্ত্রণা—ঘাড়ের ওপর মাথাটা সব সময়ই নড়বড় করছে এবং মাথাটা ঠিক জায়গায় রাখবার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হচ্ছে ওকে।

ক্ষুদে সুইর সামনে এসে দলটি মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। ওরা সকলেই ক্ষুদে সুইকে চেনে। তার ফ্যাকাশে হলদে মুখ আর কালো দাঁতের সঙ্গে সবাই পরিচিত। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে লোকে যেমন হাসে তেমনি হাসি ফুটে উঠল ক্ষুদে সুইর মুখে। কেমন একটা বিশ্রী মুহূর্ত। প্রথম ইন্‌সপেক্টরটি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরিচয়সূচক মাথা নাড়ল। তিয়েন্‌ৎসিনের দৈত্যকায়টি হাসল তার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই সুইচ টিপে বন্ধ করবার মত মিলিয়ে গেল সেই হাসিটুকু। শান্‌টুঙের দৈত্যকায়টি এক হাত ঠেকাল টুপির মাথায়, তার চোখের মধুর দৃষ্টিটুকু যেন বলতে চাইছে, 'আজ একটা লম্বা গল্প বলব। কিন্তু একটু সবুর কর, এই সব বাজে হাঙ্গামা আগে চুকুক।' ওয়েটারের মনে হল যে এই টিকেট দেখার ব্যাপারটা বড় বেশীক্ষণ ধরে চলেছে। দলটি আবার চলা শুরু করতেই সে বলল, 'একটু বসো ভাই, এক্ষুণি আসছি। আজ খুব বেশী যাত্রী নেই, টিকেট দেখা এক্ষুণি শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমি আসব'। ক্ষুদে সুই আবার একা পড়ে রইল, একটা ছায়া সরে গেল তার মুখ থেকে, আবার বসে পড়ল সে।

একটু পরেই ওয়েটার দলটির নাগাল ধরল। কিন্তু দলের সঙ্গে সঙ্গে গেল না। কাউ-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কাউমশাই, হুজুর।' কিন্তু দলের নেতা একটু বিরক্ত হল ওর এই ফোঁপরদালালিতে। কাউকে নমস্কার জানিয়ে ও বলল, 'ম্যানেজারসাহেব, আজকাল কেমন আছেন? ট্রেনে লম্বা পাড়ি দেবার পক্ষে বছরের সেই সময়টা কিন্তু একটু দেরীই হয়ে যায় বলতে হবে।' কাউ সামান্য একটু হাসলেন—তাঁর মর্যাদা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি, এই ঘটনায় তা আরো বেড়ে গেছে যেন। বিড়বিড় করে কি তিনি বললেন শোনা গেল না; মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানালেন। তারপর হাসলেন আর একবার। প্রহরী দুজন নিশ্চলভাবে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই সমস্ত আলাপ আলোচনায় তারা যোগ দিতে পারে না; জীবনের ক্ষেত্রে

তাদের স্থান অনেক নীচুতে, সকলের সঙ্গে কথা বলার অধিকার তাদের নেই—নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্য তারা শুধু বুক ফুলিয়ে থাকে আর ঋজু টান ভঙ্গীতে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে এই সুযোগে চ্যাঙ ও চিয়াওকে টিকেট দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হতে খবর দিয়েছে ওয়েটার। ওর হাতেই তারা টিকেট দুটো দিল। দেখে ও আশ্চর্য হল যে টিকেট দুটো ফ্রী পাস এবং ভদ্রলোক দুজনের প্রতি ওর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল যেন। চ্যাঙের পাসটা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে। দিল ও কিন্তু চিয়াওর বেলা তা করল না। সাহসে ভর করে তাঁর পাসটা হাতে রাখল দেখবার জন্য। এই পাসের ওপর স্পষ্টভাবেই একটি স্ত্রীলোকের নাম লেখা, কিন্তু চিয়াও যে পুরুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইন্‌স্‌পেক্টর দুজন একটু দূরে সরে, গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কানাকানি করল কিছুক্ষণ। একটু পরে তাদের মাথা নাড়ার ভঙ্গী দেখে বোঝা গেল দুজনে এই সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌচেছে যে নতুন বছরেব দিনে স্ত্রীলোকের পাসে পুরুষ ভ্রমণ করলেও ক্ষতি নেই। মাফ চাইবার ভঙ্গীতে ওয়েটার চিয়াওর টিকেট দু'হাতে ফিরিয়ে দিল।

এদিকে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার নাক ডাকাচ্ছে। ইনসপেক্টরদের ঢুকতে দেখেই প্লেটুন কমাণ্ডার আসনের ওপর পা তুলে এমন একটা ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলেছে যেন মনে হয় কোন রকম গোলমাল সে এতটুকু বরদাস্ত করবে না। পথের মাঝখানে রাখা বাজীর বাক্সগুলো নজরে পড়ল ইন্‌স্‌পেক্টরদের। এতগুলো চমৎকার বাজী একসঙ্গে দেখে মুগ্ধ হয়ে মাথা নাড়ল শান্টুঙের লোকটি। কামরাটা পার হয়ে দরজার সামনে পৌছবার পর প্রথম ইন্‌স্‌পেক্টরটি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়েটারকে বলল, 'ওদের বলে দিও যেন ওই বাজীর বাক্‌স্‌গুলো তাকের উপর উঠিয়ে রাখে।' ওয়েটারের সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করে দ্বিতীয় ইনস্‌পেক্টর তাড়াতাড়ি বলল, 'তার চেয়ে ভাল হয় তুমি নিজেই যদি ওগুলো উঠিয়ে রাখ।' কাঠির মত সরু ঘাড়টা পেণ্ডুলামের মত দোলাতে দোলাতে ওয়েটার একটিও কথা না বলে সায় দিল। কিন্তু মনে মনে ও ভাবছে, 'কথাটা নিজেদের মুখে বলবার সাহস নেই—কেমন কিনা—আর আমারও বয়ে গেছে, আমি শুধু ওই ঘাড়ই নাড়ব—ঘাড় নাড়া মানেই করে ফেলা নয়, ও দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ।' খাঁটি কথাটা বুঝে নিয়েছে ও—বাজীর বাক্‌স্‌গুলো কিছুতেই নাড়ানো চলবে না।

ক্ষুদে সুইর কাছে ফিরে গিয়ে ও আশ্চর্য হয়ে দেখল, লোকটি কেমন নেতিয়ে

পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ও বুঝতে পারল ওর এক গ্লাস জল দরকার। কোন কথা না বলে কেটলিটা নিয়ে এল ও। ক্ষুদে সুই তার পকেট থেকে কি একটা জিনিস বের করে নিল—জিনিসটা যে কি তা ভাল করে ও দেখতে পেল না। কিন্তু ওর কেমন যেন সন্দেহ হল যে সেটা আফিমের বড়ি। জিনিসটা বাঁ হাতের তালুতে রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরল সে। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে তার, মুখটা, কাগজের মত ফ্যাকাশে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে মুখের উপর, অস্পষ্ট বাষ্পের মত কি যেন বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে, গরমে চাপানো পেঁয়াজের মত চকচক করছে মুখটা।

তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল সে। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে অস্থিরভাবে, চোখ দুটো বোজা। এক চুমুক জল নিল মুখের ভেতর, গাল দুটো ফুলে উঠল গোল হয়ে। কিছুক্ষণ পরে সে চোখ খুলল, হলদে ফ্যাকাশে মুখটা ভরে গেল অকুণ্ঠ হাসিতে।

'ভাতের চেয়েও এটির দরকার আগে, এটি না হলে একবেলাও চলে না, বাবা!' ক্ষুদে সুই বিড়বিড় করে বলল।

'ঠিক কথা, কিছুতেই চলে না', ওয়েটার সায় দিল।

বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই! ট্রেনের চাকাগুলো একসঙ্গে গান গেয়ে উঠেছে। ওপরে তারাভরা নিথর আকাশ। মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে পাহাড়, গাছ, গ্রাম, শ্মশান। অন্ধকারে সমানে মাথা কুটছে ইঞ্জিনটা। ধোঁয়া, কালি আর স্ফুলিঙ্গ ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে এবং আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পর মুহূর্তেই। অবিশ্রান্ত একটানা ছুটে চলেছে ট্রেনটা—অন্ধকারের পর অন্ধকার; এক ফালির পর আর এক ফালি। একটা সরু জঙ্গলের পাশে খানিকটা জায়গায় বরফ পড়েছিল—জায়গাটা এক মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। তারপর আর দেখা গেল না। বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই! সব কটা আলো জ্বালানো উত্তাপের ঢেউ উঠছে। যাত্রীরা মুমূর্ষু, ঘুমোবার ইচ্ছা নেই কারুও। বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই! পুরনো বছরের বিদায় অনুষ্ঠান, দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পানীয়, পূর্বপুরুষদের অর্ঘপ্রদান, তুলট কাগজের লিখন, আগুনে বোমা, পুলিপিঠে, মিঠাই, ভোজ আর মদ—এগুলো হঠাৎ অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে ওদের কাছে। আচ্ছন্ন করেছে ওদের দৃষ্টি, শ্রবণ, স্বাদ, ঘ্রাণ। মাঝে মাঝে হয়ত একটু হাসির আভাস ফুটে ওঠে ঠোঁটের ওপর—কিন্তু পর মুহূর্তে যেই মনে পড়ে যে ওদের শারীরিক উপস্থিতিটা

এখনো এই ট্রেনের ভেতরেই, তক্ষুণি মিলিয়ে যায় সেই হাসিটুকু। বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই! অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার। তারা-ভরা নিথর আকাশ। বরফ্ ঢাকা জমির ওঠা-নামা। নিঃশব্দ, নিশ্চল, নির্নিরীক্ষ্য। পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে অন্ধকার। এর যেন শেষ নেই। এক অনন্ত পথের গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে আলোকোজ্জ্বল ট্রেনটা। হিংস্র অন্ধকার উদ্যত হয়ে উঠেছে চারপাশে। ট্রেনটা প্রবল চেষ্টা করছে এই অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই!

তাকের ওপর থেকে দুবোতল পরিস্রুত মদ নামিয়ে দিয়ে চ্যাঙ চিয়াওকে বললেন, 'এতক্ষণে আমরা দুজনেই দুজনের কাছে পুরনো বন্ধুর মত হয়ে উঠেছি। এবার এই জিনিসটা একটু চেখে দেখলে কেমন হয়? নতুন বছরের দিনে একটু আমোদ আহ্লাদ না করবার কোন কারণ থাকতে পারে না।'

তারপর এক গ্লাস মদ চিয়াওর হাতে দিয়ে আবার তিনি বললেনঃ 'খাটি ঈন্কো মদ বিশ বছরের পুরানো। বাজারে এ জিনিস পাওয়া যায় না। আসুন।'

ভদ্রতার খাতিরে চিয়াও প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। চ্যাঙকে তিনি কি দিয়ে আপ্যায়ন করবেন তাই ভাবতে লাগলেন মনে মনে।

মদের গ্লাশের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, হাত দুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাকের ওপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পৌটলা নামিয়ে আনলেন তিনি।

পোঁটলা খুলতেই দেখা গেল তার ভেতর অনেকগুলো ছোট ছোট পোটলা। একটা একটা করে টিপে টিপে পরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তিনি তিনটে পোটলা বার করলেন। পোঁটলা তিনটের ভেতর ছিল শুকনো লিচু, খেজুর আর মশলা-দেওয়া আচার। পোটলাগুলো খুলে তিনি চ্যাঙের সামনে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমরা এখন পুরনো বন্ধু। এ নিয়ে আর ভদ্রতা দেখাবেন না।'

চ্যাঙ একটা লিচু তুলে নিলেন, তাঁর আঙুলের চাপে লিচুটা ফেটে গেল। সেই আওয়াজটুকু শুনে কেমন মজা লাগল তাঁর—আজকের এই নতুন বছরের দিনে এই আওয়াজটুকুর প্রয়োজন ছিল যেন। ওদিকে চিয়াও আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছেন মদের গ্লাশে, সমস্ত মদটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত চ্যাঙ অপেক্ষা করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল?'

'চমৎকার!' চিয়াও ঠোঁট চাটলেন, 'চমৎকার। এত ভাল জিনিস আর খাই নি।'

দুজনে একে অপরের গ্লাশে মদ ঢাললেন আবার। আস্তে আস্তে অলক্ষ্যে দুজনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। অনর্গল কথা বললেন দুজনে—পারিবারিক কথা, চাকরির কথা, অর্থোপার্জনের কষ্টের কথা, স্ত্রী পাসের কথা। গ্লাশে গ্লাশে ঠোকাঠুকি, হৃদয়ে হৃদয়ে জানাশোনা, চোখে চোখে অশ্রুর আবেগ, শরীরে শরীরে উত্তাপ। দুজনেই উদার হয়ে উঠেছেন। আর একটা পোঁটলা খুলে কমলালেবু বার করলেন চিয়াও। বাকী বোতল দুটোর দিকে তাকিয়ে চ্যাঙ বললেন, 'আর ওই দুটো ফেলে রেখে কি লাভ! শেষ করে ফেলা যাক। আমি একটা, আপনি একটা। এক ফোঁটাও পড়ে থাকবে না। আমরা এখন পুরনো বন্ধু। আসুন, আসুন।'

'আমি কিন্তু খুব বেশী অভ্যস্ত নই।'

'কোন ভয় নেই। বিশ বছরের পুরনো, নরম আর শাঁসালো মদ। দেখবেন, আপনার একটুও নেশা হবে না। ভগবানের ইচ্ছা, আমরা দুজনে বন্ধু হই। আসুন।'

চিয়াওকে অকৃত্রিম সম্মান দেখানো হল। নিজের বোতলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন চ্যাঙ—অল্প একটুই অবশিষ্ট আছে। শার্টের কলারটা খুলে ফেললেন তিনি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, জিভটা আড়ষ্ট। কথা এখনো বন্ধ হয়নি। কিন্তু কথাগুলোকে শোনাচ্ছে ছাড়া ছাড়া প্রলাপের মত। আত্মসংযম একেবারে হারিয়ে ফেলেন নি তিনি। এখনো ইচ্ছা করলে তিনি নিজের অবচেতন আবেগকে সংযত করতে পারেন। একবার এই চেষ্টা করতে গিয়েই তিনি তাঁর নতুন পাওয়া বন্ধুর সামনে প্রায় বেসামাল হয়ে উঠেছিলেন এবং তার ফল হয়েছিল ঝগড়া বা অভদ্র ব্যবহার নয়—উল্লাস ও আনন্দ।

ওদিকে চিয়াও আধ-বোতলের বেশী খেতে পারেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এক প্যাকেট সিগারেট বার করে একটা তিনি ছুঁড়ে দিলেন চ্যাঙের দিকে। সিগারেট ধরালেন দুজনেই। সিগারেট মুখে চ্যাঙ আধ-শোয়া অবস্থায় আসনে ঠেস দিয়ে মনের আনন্দে পা-দোলাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু গলাটা যেন পুড়ে গেছে, স্বর বেরুচ্ছে না। ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করে নাক দিয়ে নিশ্বাস ছাড়ছেন তিনি। সিগারেট হাতে চিয়াও ঠেস দিয়ে বসেছেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উল্টো দিকের আসনের পায়াগুলোর দিকে। বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছে দপ্ দপ্ করে, ঢেকুর উঠছে মাঝে মাঝে। মুখটা ফ্যাকাশে, কেমন জ্বালা করছে সমস্ত শরীর।

বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই! চ্যাঙের মনে হল ভয়ংকর গতিতে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। বুকটা ধড়ফড় করছে, চারদিকে সব কিছু মুখর হয়ে উঠেছে যেন। মাথাটা শূন্যে বন্ বন্ করে ঘুরছে আর মাছির মত শব্দ করে উঠছে গুন গুন করে। আশেপাশের সমস্ত জিনিস নাচছে, জ্বলে উঠছে লাল লাল বৃত্তের মত। গুন্ গুন্ শব্দটা থামতেই আবার তাঁর বুকের অস্বাভাবিক ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেল! শরীরের শক্তি সামান্য ফিরে আসতেই চোখ খুলে একটু তাকালেন তিনি। এমন একটা ভান করলেন যেন তাঁর কিছুই হয় নি। তারপর হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে নিবে-যাওয়া সিগারেটটা ধরিয়ে নিলেন আবার এবং দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। একটা হঠাৎ সবুজ আগুনের শিখা দপ্ করে জ্বলে উঠল টেবিলের ওপর। মদের গন্ধ পাওয়া গেল। ছড়ানো গ্লাশ আর বোতলের চারপাশে পাক খেতে খেতে ছড়িয়ে পড়ল আগুনটা। উঁচু হয়ে উঠল আরও, লকলকে শিখা বিস্তার করল চারদিকে। হাতের সিগারেটটায় আগুন ধরতেই স্বপ্ন থেকে চমকে জেগে উঠলেন। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সিগারেটটা। তারপর টেবিল চাপড়াতে শুরু করলেন আগুন নেবাবার জন্যে। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁর হাতের ধাক্কায় গ্লাশ আর বোতলগুলো উল্‌টে পড়ল। রামধনুর মত বিচিত্র রঙের লকলকে শিখা নাগাল পেয়ে গেল খোলা পোঁটলাগুলোর। আগুনে ঢেকে গেল চ্যাঙের মুখ, পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে হল চিয়াওর। টেবিলের ওপরকার আগুনের শিখা উঁচু হয়ে হয়ে উঠল, তাকের ওপর থেকে পোঁটলাগুলো যেন একটু নেমে এল সেই আগুন ধরবার জন্যে। এক জায়গার আগুন মিশে যেতে লাগল অন্য জায়গার আগুনের সঙ্গে। চিয়াওর সর্বাঙ্গ গ্রাস করে ফেলল সেই আগুন। ছাই হয়ে গেল চোখের ভুরু, মাথার চুল পুড়তে লাগল চড় চড় শব্দে। তারপর তাঁর ঠোঁটের ওপর লেগে থাকা মদটুকুতে আগুন ধরে গেল আর তখন তাঁকে দেখে মনে হল আগুন নিশ্বাসী দৈত্যের মত। হঠাৎ, পপ, পপ্ পপ্… মেসিনগানের গুলির মত মনে হল শব্দটা। প্লেটুন কমাণ্ডার সবেমাত্র একটু চোখ খুলে তাকিয়েছে, এমন সময় একটা বোমা ফেটে পড়ল তার নাকের ওপর। স্ফুলিঙ্গ আর রক্ত ছিটকে বেরিয়ে এল জোরালো পিচকিরির মত। উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মত ছোটাছুটি করতে শুরু করল সে। তার পায়ের তলায় শরীরের চারপাশে—সর্বত্র বোমা ফাটছে। কানে তালা লাগানো শব্দ—যেন মাইন পোতা জমির ওপর এসে পড়েছে ওরা। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখবার আগেই ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে আগুন গ্রাস করে ফেলেছে। যখন

সে চোখ খুলে তাকাবার চেষ্টা করছিল, তার ডান চোখে সোজাসুজি বোমা ফেটেছে একটা।

ওদিকে কাউ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রথমেই তাকিয়ে দেখেছেন নিজের মালপত্রের দিকে। কয়েকটি পোঁটলা ইতিমধ্যেই জ্বলতে আরম্ভ করেছে— —আর ওদের ওপরে, নীচে চারদিক থেকে আগুনের বেড়াজাল ঘন হয়ে আসছে। একটা লকলকে শিখা এগিয়ে আসতেই হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মেঝের ওপর থেকে এক পাটি জুতো খুলে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে জানলার শার্শির ওপর ছুঁড়ে মারলেন। জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে চান তিনি। জানলার কাঁচ ভাঙতেই এক ঝলক দমকা বাতাস ছুটে এল কামরার ভেতর আর আগুনটা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। তাঁর জামার ফার লাগানো কলার, চারটে বিছানা, পাঁচটা বাক্স, পোশাক—পরিচ্ছদ—সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ট্রেন ছুটতে লাগল তেমনিভাবে, —তেমনি শোঁ—শোঁ বাতাস, বোমাফাটার শব্দ, বুনো জানোয়ারের মত কাউয়ের ছোটাছুটি।

ট্রেনে যাতায়াতের ব্যাপারে ক্ষুদে সুই একজন পাকাপোক্ত লোক। শব্দগুলো সে শুনেছে, কিন্তু কুঁড়েমি করে একবারও চোখ খুলে তাকায়নি। অবশেষে তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুন এল এবং ছড়িয়ে পড়ল তার সারা শরীরে। গরম-বোধ হতেই সে উঠে বসেছে। আগুন আর ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না তার। বোমা ফাটছে সমানে, তার সঙ্গে যে আফিম ছিল তা গলে গিয়ে পুড়তে আরম্ভ করেছে আস্তে আস্তে। আফিম পোড়া মিষ্টি গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করা সত্ত্বেও পা দুটো নাড়াতে পারল না সে। জড়োসড়ো ভঙ্গীতে বসা শরীরটা পুড়তে লাগল ফেনিয়ে ওঠা আফিমের মত এবং পুড়তে পুড়তে ছোট এতটুকু হয়ে গেল।

সুতরাং ক্ষুদে সুই আর নড়ল না। ওদিকে মদের নেশায় চ্যাও বেহুঁশ, গাছের গুঁড়ির মত নিশ্চল। চিয়াও, কাউ আর প্লেটুন কমাণ্ডারকে পাগলের মত ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। বেঞ্চের উপর উপুড় হয়ে চিৎকার করছে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার। কামরার সর্বত্র আগুন, গন্ধকের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। এখন আর বোমা ফাটার শব্দ নেই—সবগুলো ফেটে গেছে। কিন্তু শব্দটা না থাকলেও ধোঁয়াটা ভারী হয়ে রয়েছে। অবশেষে যারা ছোটাছুটি করছিল, তারা আর ছোটাছুটি করল না। যারা চিৎকার করছিল, তাদের

চিৎকার থেমে গেল। ট্রেন তেমনিভাবে ছুটে চলেছে। তেমনি শোঁ শোঁ বাতাস, ঘন ধোঁয়ার ভেতরে লকলকে আগুনের শিখা মাথা কুটছে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে। ধোঁয়াটা দুধের মত সাদা। জানলায় জানলায় আছড়িয়ে পড়ছে আগুন। সেই আগুনে স্বচ্ছ হয়ে গেল কামরাটা, আকাশ সন্ধানী আলোর মত দূরবিস্তৃত আগুনের শিখা ঝিলিক দিয়ে উঠল; যেন সহস্র মশাল একসঙ্গে জলে উঠেছে।

ছোট একটা স্টেশনের কাছাকাছি এসে ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে গেল, কিন্তু থামল না। হাতল টানতে টানতে ট্র্যাকম্যান মনে মনে বলল, 'আগুন।' সবুজ আলো দোলাতে দোলাতে সিগন্যালম্যান মনে মনে বলল, 'আগুন?' টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রহরীরা মনে মনে বলল, 'আগুন।' স্টেশন মাস্টারের আসতে দেরী হয়েছিল। যখন সে এল ট্রেনটা স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেছে—কিন্তু কেমন একটা নেশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতার ভেতর সেও যেন দূর থেকে দেখল ট্রেনে আগুন লেগেছে। এই দেখাটাকে চোখের ভুল বলে মনে করাই নিরাপদ মনে করল সকলে। সিগন্যালম্যান আলো নিবিয়ে দিল। হাতল টেনে রেলের লাইন যথাস্থানে ফিরিয়ে আনল ট্র্যাকম্যান। রাইফেল হাতে বিশ্রাম ঘরে ফিরে এল প্রহরীরা। আগুনের কথা প্রত্যেকেরই মনে পড়তে লাগল বারবার। কিন্তু কেউ তা মুখে স্বীকার করল না। ক্রমে কথাটা সবার মন থেকেই মুছে গেল; তখন একমাত্র চিন্তা হল, কি ভাবে উৎসবের আনন্দ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়। সবাই মিলে একসঙ্গে বাজী ছুঁড়ল, মদ খেল আর 'মাজঙ্' খেল—যেন পৃথিবীর কোথাও কোন গোলমাল নেই।

স্টেশন ছাড়িয়ে আসবার পর ট্রেনের গতি বেড়েছে। ফুঁসে উঠেছে বাতাস, ফট্‌ফট্ শব্দ হচ্ছে আগুনের। চোখ ঝলসানো গোলা ছুটছে রকেটের মত। অন্ধকার রাত্রি, সারিবাঁধা অগ্নি-উদ্‌গারী লণ্ঠনের মত দেখাচ্ছে ট্রেনটাকে। আগুনে পোড়া কঙ্কালটা ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। দাহ্যবস্তুর অভাবে আগুনের শিখাগুলো সামনে পেছনে আবর্তিত হচ্ছে। অবশেষে তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটায় আগুন লেগে গেল। প্রথমে বেরুল ধোঁয়া। ধোঁয়ার সঙ্গে গন্ধ ভেসে এল—মাংস ও আসবাব পোড়া মিষ্টি মিষ্টি তীব্র একটা গন্ধ। তারপর আগুন। 'আগুন! আগুন! আগুন!' ভয়ে ও আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগল সবাই! মাথার ঠিক রইল না কারও। লাফিয়ে পড়বার জন্যে কেউ কেউ জানলা ভেঙ্গে ফেলল, কিন্তু সাহস হল না। অনেকে ছোটাছুটি করতে লাগল, কিন্তু পরস্পর

ঠোকাঠুকি লেগে পড়ে গেল আবার। আর কয়েকজন আসনের ওপরেই নিশ্চল হয়ে রইল ; একবার চিৎকার করে উঠতে পারল না পর্যন্ত। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল আর আতঙ্ক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন চেষ্টাই সফল হল না। যাত্রীরা আর্তনাদ তুলল, হাত দিয়ে মাথা আড়াল করল, কাপড় ঝেড়ে ঝেড়ে আগুন নেবাল, ছোটাছুটি করল, কামরার বাইরে লাফিয়ে পড়ল···

প্রচুর উপকরণ আর মানুষে ঠাসা নতুন একটা উপনিবেশ আবিষ্কার করে প্রচণ্ড উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছে আগুন। লম্বা লম্বা জিভ বাড়িয়ে লেহন করছে ; জড়িয়ে ধরছে পাকে পাকে, আবর্তিত হচ্ছে, ধোঁয়ার আড়ালে, জানলার বাইরে। এখানে ওখানে ; ফুঁসে ফুঁসে উঠছে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে। এক অদ্ভুত খামখেয়ালী নাচ শুরু করছে সহস্র সহস্র শিখা, ছুটে আসছে তালগোল পাকিয়ে, ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে ধূমকেতুর মত—আবার একসঙ্গে জড়ো হয়ে দেখাচ্ছে যেন লাল সবুজ আগুন পুকুর। ধোঁয়া আর আগুন। মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে আগুন, তারপরেই নিস্তেজ হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার হঠাৎ স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার ভেতর থেকে। শরীরের মাংস পুড়বার সময় আর মাথার চুল ঝলসে যাবার সময় শব্দ হচ্ছে নানা রকমের। যাত্রীদের আর্তনাদ, বাতাসের গর্জন, আগুনের ফট্ ফট্ আওয়াজ, জ্বলন্ত গাড়ী, ভারী ধোঁয়া—এ এক চমৎকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

পরের স্টেশনে ট্রেনটা পৌছল। এখানে ট্রেনটা থামবার কথা, সুতরাং থামল। সিগন্যালম্যান, টিকেট ইন্‌সপেক্টর, প্রহরী, স্টেশন মাষ্টার, সহকারী-স্টেশনমাষ্টার, আশেপাশের লোকজন—সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল জ্বলন্ত গাড়ীগুলোর দিকে। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারল··—কারণ স্টেশনে না আছে দমকল, না আছে আগুন নেবাবার কোন ব্যবস্থা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা নিঃশব্দ ও নিশ্চল, অলস মন্থর গতিতে একরাশ নীল ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠছে।

পরে খবর বেরুল যে কামরাগুলোর ভেতর থেকে বাহান্নটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়বার ফলে নিহত—এমন এগারোটি মৃতদেহ লাইনের ধারে ধারে পাওয়া গেছে।

দেওয়ালী উৎসবের পর—অর্থাৎ, নতুন বছরের প্রায় পনের দিন পরে একজন ইন্‌স্পেক্টর এলেন। প্রথমে তিন দিন কাটল তাঁকে সরকারী অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে—তদন্ত করবার অবসর তাঁর আর হল না। তার পরের তিন

দিন তিনি কতগুলো অপরিহার্য ব্যক্তিগত কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত রইলেন। তারপর তদন্ত শুরু হল।

দেখা গেল, কেউ কিছুই জানে না। ট্রেনের গার্ড, দুজন ইন্‌স্‌পেক্টর, তিয়েনংসিন ও শানটুঙের লোক দুটি, ওয়েটার—কেউ বলতে পারল না কি ভাবে আগুন লেগেছে। বিভিন্ন স্টেশনের টিকেট বিক্রীর হিসেবের সঙ্গে সংগৃহীত টিকেটের হিসেব মিলিয়ে দেখা গেল তেষট্টিটা টিকেট পাওয়া যাচ্ছে না। আর ঠিক এই তেষট্টিটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া হল যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন টিকিট বিক্রী হয় নি। তাই ধরে নেওয়া হল যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটা খালি ছিল এবং আগুনের সূত্রপাতও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে নয়।

তদন্তের শেষে ওয়েটারকে আবার জেরা করা হল। ও বলল যে, ও কিছুই জানে না। আগুনটা যখন লাগে তখন ও ভোজন কামরায় ছিল। বিচারে স্থির হল যে ওয়েটার নিঃসন্দেহে দোষী এবং নিজের কর্মস্থান ত্যাগ করেছে বলে ওর শাস্তি হওয়া উচিত। সুতরাং নিয়ম মত ওয়েটারের চাকরি গেল।

ইন্‌স্‌পেক্টর এই দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করলেন—অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভঙ্গীতে বিবরণটি লিখিত।

'আমার ভারী বয়ে গেছে', ওয়েটার ওর বৌকে বলল, 'ওদিকে ডিউটির বেলা নতুন বছরের দিন বেরুতে হবে। আর যখন সব গোলমাল হয়ে যায়, ওঁনারা ভাবেন যেন ওই পচা রেল কোম্পানীর চাকরি পেলেই আমরা না খেয়ে মরব।'

'ওসব বাজে কথা রাখ!' ওর বৌ উত্তর দিল, 'আমি ওই জন্যে ভাবছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে অমন তরকারীটা পুড়ে গেল।'

অনুবাদ: অমল দাশগুপ্ত

লম্বনাসা

মাও তুন

বৃহত্তর শাংহাই নগরীর ত্রিশ লক্ষ নরনারীর মধ্যে আমাদের নায়কের স্থান বুঝি সকলের নীচে।

'আধুনিক গৃহ-স্থপতির গৌরব' চার তলা বিপুল আয়তন খাড়াখাড়া ঘরগুলির কালো মিশমিশে প্রকাণ্ড লোহার ফটক গলিয়ে ঢুকে পড়তে প্রায়ই দেখতাম ওকে। রাস্তার কুকুরগুলোর সঙ্গে সেও সিমেণ্ট বাঁধানো জঞ্জালের ডাস্টবিনের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেত। খুঁজতো এঁটোকাঁটার মধ্যে 'মূল্যবান' কিছু পাওয়া যায় কি না। কুকুরগুলো এসে লুফে নেবার আগেই মাংস লেগে-থাকা একটা হাড় সে যদি ছিনিয়ে নিতো, সে তখন হাড়টা সযত্নে পরখ করতো। কিন্তু হাড়গুলো প্রায় এম্‌নি নোংরা হয়ে থাকতো যে তাকেই আবার কুকুরগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিতে হোত। আত্মরক্ষার ক্ষমতা কুকুরের বুঝি অনেক বেশীই। ক্বচিৎ কোনদিন যদি পঁচা আপেল বা আধখানা পাকা শালগম কুড়িয়ে পেতো সে জঞ্জালের মধ্যে তখন তার খুশী দেখে কে? এগুলোর দিকে কুকুরগুলো বড় একটা নজর দেয় না। তার সরু সরু ক্ষুদে আঙ্গুলগুলি বুঝি কাঁপতে থাকে আনন্দে।

কুকুরগুলোর মত সেও উবু হয়ে কুঁকড়ে উঁকি মেরে দেখতো সিমেণ্ট বাঁধানো ডাস্টবিনটার তলাকার ছোট দরজাটার দিকে। কোনদিন হয়তো পুরানো একটি বোতল, ভাঙ্গা একটা খেলনা যা কোন বড়লোকের ছেলে হয়তো ফেলে দিয়েছে তার নজরে পড়তো। সে তখন ক্ষুধার কথা ভুলে যেত কিছুক্ষণের জন্য। সরু হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে জঞ্জাল ঘাটতে শুরু করে দেয় সে। কিছু কুড়োবার আগ্রহে ডাস্টবিনের মুখে ছোট দরজাটার মধ্যে তার গোটা দেহটাই গলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু প্রায়ই তার পিঠে এ সময় এসে পড়তো বিরাশীসিক্কা ওজনের স-বুট এক লাথি। লাথির এই অভিজ্ঞতা থেকে সে ঠিক ধরে নিত, 'উঁচু ও বাড়ীর' দারোয়ানটি মারল লাথিটা। আর এ লাথি খেয়ে কুকুরগুলোর মত সেও অমনি সটকে পড়তো মিশমিশে কালো

লোহার প্রকাণ্ড ফটক গলিয়ে। বেরুতো এমনি আর কোন আঁস্তাকুড়ের সন্ধানে। পেশা তার এমনি বিপদজনক।

যেদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ত সে দিন সে পাহারাওয়ালার চোখ এড়িয়ে আধুনিক 'গৃহ-স্থপতির গৌরব' খাড়াখাড়া সেই চার তলা বাড়ীগুলোর পেছনের দরজায় গিয়ে হাজির হ'ত। আর যদি দরজাটা খোলা থাকত ও রাঁধুনীটি যদি এ সময় গত রাত্রের বাসি এঁটোকাঁটা আঁস্তাকুড়ে ফেলতে আসতো সে তখন ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইতো। সে হয়তো তখন আধমগ পাতলা খিচুড়ী পেয়ে যেত। অথবা রাঁধুনীটি নাক সিটকাতো ওকে দেখে। কিংবা হয়তো একটু সহানুভূতির কথা বলতো যার কোন মূল্য নেই তার কাছে।

'যা ভাগ্—ভাগ, আজ কিছু নেই। জানিস্ পয়সা দিয়ে লোকে কেনে এ সব। পচাই তৈরী করতে চাষীদের কাছে ওরা এসব বিক্রি করে।'

এসব ঘটনা সাধারণত ঘটতো ভোরবেলাই যখন বড়লোকের ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা বিছানায় ঘুমিয়ে আরাম কচ্ছে।

পরে বেলা হলে ওকে আমরা দেখতে পাব কোন মুখর রাস্তার চৌ-মাথায়। ভুঁড়িওয়ালা কোন ভদ্রলোক আর হাইহিল জুতো তার কোন তন্বী সহচরীর পিছু পিছু ছুটে চাপা কম্পিত স্বরে সে বলতে থাকে ঃ

'বাবু সাব, মেম সাব, কিছু 'সৎকাজ' করে যান!'

অথবা সুচৌ নদীর খাড়ির উপর পুলটার কাছে এসে ছোকরাটাকে লক্ষ্য করতাম, নেংটি ইঁদুরের মতো ভীড়ের মধ্যে থেকে সে এসে হাজির হোতো রিক্সাওয়ালাদের আড্ডায়। আর রিক্সা সোয়ারদের রিক্সায় চাপতে সহায়তা করতো। তারপর আরোহীদের নিকট হাত পেতে অনুনয় করতো ঃ

'দয়া করুন, একটা 'সৎকাজ' করে যান।'

এমনি ধারা মেহনতের জন্য সে বড়জোর এক আধটা পাই পয়সা হয়তো পায়। কোন কোন দিন তাও না। কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য এমনি কাজ করতে যাওয়ার বিপদ অনেক। পুলিশ দেখে ফেললে লাঠি বাগিয়ে অমনি তেড়ে আসতো শিক্ষা দিতে। কিংবা 'সৎ কর্ম' করতে অনুমতি দিলেও কিংবা পুলিশ তা দেখে না দেখলেও, পুলের দুই মাথার মুখে আর সব ছোকরাদের কাছ থেকে কিন্তু নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। আমাদের নায়কের চাইতে বয়সে যারা বড় আর অভিজ্ঞ, তারা তাকে দেখে অমনি মুখ খিস্তি করে উঠতো। মেরে বসতো। 'স্বাধীন কাজের' এই তো হ'লো দশা!

ঝুঁকির এই পেশাতেও আছে আপন আপন বাণিজ্যিক এলাকা। এসব

নির্দিষ্ট এলাকায় নিজস্ব মালিকানাও তাদের বাঁধা আছে। আর তাদের প্রত্যেকের উপরে রয়েছে একজন করে সর্দার। স্বাধীন প্রতিযোগিতার স্থান কই এই ব্যবসায় !

তবু অনেক সময় আমাদের নায়ক বেশ খানিকটা সাফল্য অর্জন করতো।

সেটা সাধারণত যখন বড় লাল ও সবুজ নাইলন আলোর সিগন্যাল জ্বলে ওঠে আর নির্জন গলির মুখের আলোগুলি যখন মিট্ মিট্ করে জ্বলতো, আমাদের নায়ক তখন করতো কি, সমবয়সী আরো পাঁচ, ছয়, এমন কি জনা দশেক তার মতো আওয়ারাদের সঙ্গে অন্ধকার গলির মধ্যে ওৎ পেতে থাকতো। অপেক্ষা করে থাকতো যে পর্যন্ত রেস্টুরেন্টের কোন ছোকরা বাবুদের রাত্রির শেষ খাবার খাইয়ে রেস্টুরেন্টে ফিরে কিনা এঁটো বাসনকোসন নিয়ে। তার বয়সের অপর সব আওয়ারাদের মত সেও থাকত ওৎ পেতে। রেস্টুরেন্টের ছেলেটার বয়সও খুব বেশী না। বারো কি তেরোর বেশী নয়। অনেক সময় এসব ডিস্ খালিই থাকতো। কালো বাটিগুলিতে যে কটি ভাত পড়ে থাকতো তাতে ছোট একটি ছেলের খিদেও মিটতো না। অবশ্য বরাতের জোরে কোন দিন হয়তো বাটিগুলোতে খানিকটা ঝোল লেগে থাকতো কিংবা কয়েকটা হাড্ডি আর কিছুটা সব্জী পড়ে থাকতো। হাঁড়িতেও যতটুকু ঠাণ্ডা ভাত এঁটে থাকতো তাতে সুস্থ একটি কুকুরের ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে না। আমাদের নায়ক আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের অধিক শক্তিমত্তার মুখে রেস্টুরেন্টের ছোকরাটি বাধা দিতে সাহস পেত না। নায়ক আমাদের পেটের খিদে মিটিয়ে নিত খানিকটা এভাবে। ডিস্গুলির ঝোলঝাল চেটেপুটে পরিষ্কার করে নিয়ে সে তখন লাফাতে লাফাতে চলে যেত।

কিন্তু বেশীদিনই আমাদের নায়কের কপালে জুটতো গালমন্দ, মারধোর আর পদাঘাত। রাস্তার কুকুরগুলোকেও এর চেয়ে বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয় না।

২

আমাদের নায়কের মত এমনি ধারা জীবন বৃহত্তর শাংহাই-এর ত্রিশ লক্ষ নরনারীর মধ্যে ক'জন ছেলেমেয়ে যাপন করে সঠিক আমাদের জানা নেই।

অথবা, অন্যভাবে বলতে গেলে বৃহত্তর শাংহাই-এর ত্রিশ লক্ষ নরনারীর মধ্যে কতজন ছেলে-মেয়ে তাদের বিছানায় যখন আরামে ঘুমায় তখন আমাদের নায়ক জঞ্জালের স্তূপ থেকে তাদেরই ফেলে দেওয়া খেলনা কুড়াতে গিয়ে পাহারা-ওয়ালার লাথি খায়, তাও সঠিক করে বলতে পারি না। আমরা অবশ্য এ

নিয়ে এখন মাথা ঘামাচ্ছি না। মাথা ঘামাচ্ছি না ওদের সংখ্যার মধ্যে খুব একটা তফাৎ আছে কিনা তা নিয়ে কিংবা যেসব ছেলেমেয়ে এখন তাদের বিছানায় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে তাদের সংখ্যা নিয়ে।

কিন্তু একটা জিনিস নিঃসন্দেহে জানি, বৃহত্তর শাংহাই-এর ত্রিশ লক্ষ নর-নারীর মধ্যে আমাদের নায়কের বয়সের তিন-চার লক্ষ বালক বালিকা কোন না কোন সিল্ক ফ্যাক্টরী, দেশলাই কল, ইলেকট্রিক বালব তৈয়েরীর কারখানায় বা এমনিতর কোথাও কাজ করে থাকে। সকাল ছ'টা থেকে রাত ছটা পর্যন্ত তাদের রক্ত শুষে নিতে থাকে যন্ত্র-দানবগুলি! বলা বাহুল্য, যে ছোট ছোট ধনীর দুলাল শান্তিতে এখন ঘুমোচ্ছে, তাদের ও তাদের বাপ মায়ের খাদ্য ও পুষ্টির রসদ যোগায় এদেরই রক্ত।

বালব ফ্যাক্টরী বা এমনি কোন কল কারখানার ফটক দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে ক্লান্ত অবসন্ন কুঁকড়ানো দেহখানি নিয়ে ওরা যখন বেরিয়ে আসতো, তাই দেখে আমাদের নায়কের চোখদুটি বুঝি টাটিয়ে উঠতো। উঠতো যেদিন পেটটা তার মোচড়াতে থাকতো খিদের চোটে। হোলই বা কুঁড়ে আস্তানা, তবুও ওদের ঘরে ফিরবার একটা ঠাঁই আছে। খানকয়েক ভুষিমাখা মোটা মোটা রুটি অন্ততঃ ওদের হয়ত জুটবে। ভোর পাঁচটা অবধি কোন ছাদের তলায় ঘুমোবার একটা আস্তানা হয়ত মিলবে।

অবশ্য একথা তার কখনও মনে হয়নি, বছর কয়েক পরে এ সব ছেলে-মেয়েদের যাদের সে আজ হিংসে করছে, তাদেরই তাজা রক্তটা শুষে নেবে কলকারখানাগুলি। আর রাস্তায় পড়ে ওরা বমি করতে থাকবে। কুকুরগুলোর মুখ থেকে মাংসের হাড় কেড়ে নেবার শক্তিটুকুও আর থাকবে না। রিক্সা টেনে পুল পারাপার করবার মুরদও না।

কিন্তু এসব কথা কেন? আমার নায়কের কথায় ফিরে আসা যাক।

স্পষ্ট মনে করতে পারছে না সে। কিন্তু তার যখন জন্ম হয়, তখন তাদের যেন বাড়ী ছিল। শাংহাই-এ যে-বছর যুদ্ধ শুরু হল আর 'লৌহপক্ষী'গুলো যখন আগুনে বোমা ফেলেছিল, সে কথা আজ তার মনে পড়ে না। বড় বড় দালানগুলির উপর কিছু বোমা পড়েছিল আর পড়েছিল গরীব লোকজন যে এলাকায় বাস করে তার উপর। আর সে থেকে তাদের বাড়ীঘর সব লোপাট হয়েছে।

আর সে থেকে যে তার বাপ-মা কোথায় উধাও হলেন, আজও তা সে জানে না। ওঁরা যে দেখতে কেমন ছিলেন, তাও সে মনে করতে পারে না।

মাত্র সাত বছর তখন তার বয়স। আশে-পাশে কোথাও যদি ওঁরা থেকেও থাকেন, তা তার নজরে কখনও পড়েনি। ভোরবেলায় হয়ত কাজে বেরিয়ে পড়েছেন আর হয়ত বাড়ী ফিরেছেন সন্ধ্যার পর। কোথাও কোন কলকারখানার রসদ হয়ত ওদেরও যোগাতে হচ্ছে।

একদা তারও যে বাপ-মা ছিল আর দুর্ঘটনায় সে যে তাঁদের হারিয়েছে, তা সে এখনও ভুলতে পারেনি। বাপ-মায়ের সঙ্গ ছাড়ার পর আরও বহু শিশু ও বৃদ্ধাদের বিপুল ভিড়ের মধ্যে সে যে কি করে মিশে গিয়েছিল তা তার মনে আছে। মনে আছে, বিপুল ঐ জনতাকে তখন খানিকটা করে পাত্‌লা খিচুড়ি আর মাঝেসাঝে খানকয়েক পোড়া পোড়া ভুষিমাখা রুটি বিতরণ করা হোত। মাস ছয়েক এমনিভাবে বুঝি কেটেছিল তাদের। তারপর জাঁদরেল গোছের এক ভদ্রলোক এসে একদিন তাকে হঠাৎ এক ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন একজনের পর একজনকে। মনে আছে, তার পালা এলে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ

'বাড়ী কোথায় ?'

সে মাথা নাড়লে।

'আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে ?'

এবারও সে মাথা নাড়লে।

জমকালো ভদ্রলোকটিও এবার মাথা নাড়লেন। কাগজের উপর খস্‌খস্ করে কি যেন লিখলেন। তারপর ডাকলেন আর একজনকে। দিন কয়েক পর আমাদের নায়ককে রাস্তায় এসে আস্তানা গাড়তে হোল। স্তব্ধ হতবাক্ হোল সে। কি করবে সে কিছুই ঠিক করতে পারলো না। এই অবস্থায় পাড়া আর সব ছেলেদের দংগলে সেও পড়লো ভিড়ে। কোন কোন দিন দিব্যি তাদের কেটে যেত। আর কোন কোন দিন নিজেদের মধ্যে করতো এরা মারামারি। এক সময় সে রাস্তার কুকুরগুলোর সঙ্গে দিব্যি খাপ খাইয়ে নিত। আর কোন সময় হয়ত শুরু করে দিত ঝগড়া। এ কয় বছর ধরে এমনিধারা জীবন সে কাটিয়ে আসছে। বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার মত লোকদের বুঝি এমনিভাবে জীবন যাপন করতে হয়।

৩

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের নায়কের জীবন আপাতদৃষ্টিতে খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও কার্যতঃ কিন্তু তা নয়। প্রত্যেকদিন মস্ত চাঞ্চল্যকর কিছু একটা সে করবেই। কিন্তু বিশেষ চাঞ্চল্যসন্ধানী কোন সংবাদপত্রের

সংবাদদাতা তাতে কোন সাংবাদিক গুরুত্ব আরোপ করবেন কিনা, তা ওঁরাই জানেন। সে যাক, অতি তুচ্ছ ওর জীবনের একটা বিশেষ ঘটনার কথাই ধরা যাক।

সেটা ছিল কোন মাস বা কোন বছর, সঠিক বলতে পারি না। তবে দিনটা ছিল খুব চমৎকার—খুব গরমও না, খুব শীতও না। ঝড়-বাদলাও না, খরখরে রোদও না। দিনটি যে তার জীবনে বিশেষ স্মরণীয় তার কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে :

বেলা তখন প্রায় দুটো। বিকেলের পড়ন্ত রোদে শাংহাই-এর সাধারণ শৌচাগারের ইঁটের কোঠাবাড়ীর দেওয়াল ঘেঁষে বসে সে তখন ঝিমুচ্ছিল। এটা হ'লো তার আস্তানা। আর তা দখল করতে রক্তপাতও তাকে কম করতে হয়নি। আর তার এই আবিষ্কারের পেছনে ছোট্ট একটা ইতিহাসও বুঝি রয়েছে।

বেশ কিছুকাল আগে সুন্দর এ সাধারণ শৌচাগার গৃহটি যখন প্রথম সে দেখে, তখন অবাক বনে গিয়েছিল। লেখাপড়া জানে না সে। উপরে সাইনবোর্ডে কি লেখা আছে পড়তে সে পারেনি। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছোট্ট এ দালানটা কারও বাড়ী বা কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অফিসঘর কিনা সে ভেবে উঠতে পারলে না। লম্বা কালো গাউন পরা মোটাসোটা এক ভদ্রলোক এক সময় এসে ঢুকলেন ঘরটার মধ্যে। কোমর বন্ধনীতে পিস্তল ঝোলানো এক পুলিশও ঢুকলো তার মধ্যে। তারপর এলেন সাহেবী পোষাকপরা এক ভদ্রলোক—বাঃ রে! যত সব বড় বড় লোক যে যাওয়া-আসা করছে—! মাতব্বর গোছের লোকজন যারা মর্জি হ'লে লাথি মেরে বসতে পারে তাদের, তাঁরাই যে সব এখানে যাওয়া আসা করছে! বাড়ীটি নিশ্চয়ই কোন অফিসঘর হবে।

কাছ ঘেঁষতে ভয় করে তার। চোখ তুলে তাকায় সসম্ভ্রমে। কিন্তু পাশের আর একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল হঠাৎ একটি মেয়ে। ওকে দেখে কিন্তু বড়লোকের মেয়ে বলে মনে হয় না। পরে ঢুকলো একটি ছেলে। সেও অনেকটা তার মতই। বড় একটা কেউকেটা নয়। কি সাংঘাতিক! সাহসে বুক বাঁধলো সে। এগিয়ে গিয়ে এক পা উঁকি মেরে দেখলো সে। আর তখনই সে বুঝতে পারলো বিশিষ্ট লোকজন সব ছোট্ট ঘরটার মধ্যে কোন কাজ সেরে নিচ্ছে।

দূরঃ, এই! সে মিছেমিছি বোকা বনলো। ভয় করছিল অকারণ। প্রতিশোধ নিতে চাইলে সে। প্রথম চোটে তার মনে হোল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে নোংরা করে রাখে সে যেখানে সেখানে। কিন্তু যখন দেখলে নতুন লোক এসে দোর

গোড়ায় বসা বুড়ীটার হাতে একটা পাই পয়সা গুঁজে দিল তখন তার ধারণা হ'লো বিশেষ কিছু একটা উদ্দেশ্যের জন্য যেন জায়গাটা। সে পূর্বে লক্ষ্য করেনি। তবু অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে সাহস হ'লো না তার। পরিবর্তে খানিকটা সে থুথু ফেল্লে। আর দরজার মুখে দেওয়ালের কিছু দূরে একটা ঠাঁই বেছে নিয়ে বসে পড়লে।

তখন অবশ্য সে বিশেষ এলাকাটা সংরক্ষণের কথা বড় একটা ভাবেনি। ভাবলে যখন আর একটা ছেলে এসে তার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়লো পা ছড়িয়ে,—এ সত্যি বাড়াবাড়ি।

'আরে, এ আবার কোত্থেকে এসে জুটলো! বেজন্মা, কচ্ছপ একটা!' গলা খেঁকিয়ে উঠল সে।

'গালাগালি করছিস কেন-রে তুই, ঘেয়োমাথা কোথাকার?'

তারপর শুরু হ'লো মারামারি। কেউ কারো কম নয়। দু পক্ষই সমান। আমাদের নায়কের মাথাটা কিন্তু দেওয়ালের ইঁটের এক স্থানে গেল ঠুকে। আর ছুটলো রক্ত। অপর ছোকরাটা বুঝি ভয় পেয়ে গেল। ব্যাপারটা এতখানি গড়াবে সে বুঝি ভাবেনি। কিংবা সে এরই মধ্যে নিজেকে বিজয়ী মনে করলে। তাই সে কেটে পড়ল। আমাদের নায়কের অধীনে এল এলাকাটা। সে থেকে জনসাধারণের প্রসাধনকক্ষে প্রাচীর বরাবর স্থানটি তার ব্যক্তিগত এলাকায় পরিণত হ'লো।

সেদিন থেকে সে সাধারণ শৌচাগারের খুঁটিনাটি বিষয়ে ওয়াকিফহাল হোয়ে গেল। যে বৃদ্ধাটি দরজার মুখে বসে 'প্রসাধনী কাগজ' বিক্রি করছিল তার সঙ্গে সে ভাব করে নিলে। দিনটা ছিল ভারী চমৎকার। গরমও নয়, শীতও নয়। বাদলাও না আর খরখরে রোদও না। তার ব্যক্তিগত স্থানটিতে সে দেওয়াল ঘেঁষে বসে ঝিমুতে লাগল। পৃথিবীটাকে দিব্যি তার ভালই লাগে। এমনি ধারা দিনের একদিন।

শৌচাগারে ছোটার 'তাড়ার সময় নয়।' বুড়ীটা তার মাড়ী কামড়াতে থাকে। মনে হয় কিছু যেন চিবুচ্ছে। দেওয়ালের ওপাশে কাকে উদ্দেশ্য করে কি যেন সে বললে তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে।

'হ্যাঁ রে লম্বনাসা! আমি এক্ষুণি আসছি, আমার এখানটায় একটু বসবি?'

কি? লম্বনাসা! লম্বনাসা আবার কে? ছেলেটা সহসা উঠে মাথা তুললে। তাকাল এদিক—ওদিক। বুড়ীটা তাকে সম্বোধন করছে কিনা বুঝে উঠতে পারলে না। বুড়ীটা আবার বললে:

'এখানটায় এসে একটু বস রে, লম্বনাসা? আমি এক্ষুণি এসে পড়বো। কিছু মনে করিস না, দাদা।'

বুড়ীটা তাকেই লম্বনাসা বলে ডাকছে! তাই শুনে তার তখন খুব রাগ হ'লো। বাপ-মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তার একটা ভাল নাম ছিল বৈকি! নামটা সে এখন জানে না। রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতো তখন। ঐ নির্দিষ্ট নাম ধরে তাকে কেউ আর ডাকে না। প্রথম প্রথম সে অবশ্য তার সাংগাত্‌দের নিকট ঐ নামের কথা পেড়েছিল। ওরা কিন্তু ঠোঁট কুঁচকে মজা লুটতে লাগলো বিকৃত করে তার সে নামটাকে। পরে নামটা সে ভুলে যায়। সাংগাত্‌রাও তাকে কখনও লম্বনাসা নামে ডাকে নি। আর সব ছেলে ছোকরাদের চাইতে তার নাকটা হয়ত একটু লম্বাই। সাংগাতদের মধ্যে দৈহিক অপটুতার সূত্র ধরে কারো নামকরণ করা অপমানেরই। যেমন কোন পুঁচকে ছোকরার মাথায় যদি একগাদা পাঁচড়া বেরিয়ে থাকে, তাই বলে তাকে কি তখন বলতে আছে ঘেয়োমাথা?

আমাদের নায়কও মনে মনে বিরক্ত হ'লো। বুড়ীটা তাকে লম্বনাসা বলে ডাকছে দেখে সে কিছুটা খুশীও হ'লো। কেননা, এ বুঝি প্রথম তাকে মানুষ হিসাবে কেউ গণ্য করলো। কাজের দায়িত্ব আরোপ করল তার উপর।

'তোমার ওখানটায় বসতে বলছ? বেশ, কিন্তু বেশী দেরী কোর না। আমার আবার অনেক কাজ রয়েছে।' সে জবাব দেয় ব্যস্ত-সমস্ত মানুষের মত। দু পা টেনে সে আবার উঠে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধা ওর হাতে একগাদা 'প্রসাধনী কাগজ' দিয়ে চলে গেল। কিছুদূর গিয়েই সে আবার ঘাড় ফিরালে। ওকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলে:

'পঁচিশখানা কাগজ আছে দেখিস্ কিন্তু, লম্বনাসা, পঁচিশখানা!'

'সে আমি গুণে নেবো'খন।' জবাব দিলে সে। কাগজ ক'টা তারপর সে গুণতে শুরু করলে।

নতুন কাজে মিনিট দশেক যেতে না যেতেই সে হাঁপিয়ে উঠলো রীতিমতো। উদ্দেশ্যহীন আধঘণ্টা রাস্তার কোন মোড়ে চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কিংবা বসে কাটিয়ে দিতে পারে রাস্তাটা সেখানটায় মোড় নিয়েছে তার কাছটায়। কিন্তু তাতে কোন ঝুঁকি নেই। এখন রেহাই পেলে হয়।

'বুড়োমাগীটা আমার হাত-পা এখানটায় বেঁধে রেখে গেছে', সে বিড়বিড় করে উঠল। স্বাধীন চলাচলে এমনি ধারা বাধা পেয়ে সে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সে চলেই যাচ্ছিল—এমনি সময় এল এক খদ্দের। একটি পয়সা ছুঁড়ে দিলে

সে। লম্বনাসা তখন একখানি কাগজ ওর হাতে তুলে দিলে। কাগজখানা তুলে দিয়েই এক নতুন অনুভূতিতে তার বুকটা কেঁপে উঠলো। সে তাহলে সত্যিই 'ব্যবসা' করছে! সে করলে পুলক অনুভব। তার কাছ থেকে প্রথমে কাগজ সওদা না করে ভেতরে কারোর ঢোকা হচ্ছে না। কাগজের ভাঁজের মধ্যে পয়সাটা রেখে সে কাগজগুলো রাখলে গুছিয়ে।

সাধারণ শৌচাগারে ছোটার এখন বুঝি সময়। হরেক রকমের লোক সার বেঁধে আসতে লাগলো। পয়সা এসে জমতে লাগলো কাগজের বাক্সটার মধ্যে। দেখতে দেখতে পাঁচ-ছয়টা পয়সা জমে উঠলো। বিক্রেতা উঠলো অনেকটা উত্তেজিত হয়ে। প্রথম বেচাকেনার ব্যাপারে সে একেবারে আনকোরা। দ্বিতীয়, এর আগে অত পয়সা সে কখনও চোখে দেখেনি।

কাগজ বেচার ফাঁকে খানিকটা ফুরসত পেয়ে সে কাগজগুলি গুছাতে শুরু করলে। প্রথম তিনটি পয়সা সে কুড়িয়ে এক জায়গায় সাজিয়ে রাখল। তারপর চতুর্থ পয়সাটা একবার হাতে নিয়ে যাচাই করলে। আপন ট্যাঁকে গুঁজতে যে ইচ্ছে হ'লো না, এমন নয়। কিন্তু পরিশেষে, পয়সাটা সে রেখে দিলে কাগজের ভাঁজের মধ্যে। তারপর পাঁচ, ছয় পয়সা।

দেখতে দেখতে পয়সার সংখ্যা দাঁড়ালো বারোটা। তারপর বুঝি এল খানিকটা ঢিমে হয়ে।

বারোটা পয়সা! এক ইঞ্চি সমান উঁচু পয়সাগুলো পড়ে আছে গাদা হয়ে। বিড়াল যেমন নেংটী ইঁদুরটাকে নিয়ে খেলতে থাকে আমাদের নায়ক বুঝি তেমনি গাদাশুদ্ধ পয়সাগুলো দু'হাতে ওজন করে দেখতে লাগলো। একখানি হাত পয়সা রাখবার বাক্সের দিকে আধা-পথ নিয়ে গিয়ে আবার সরিয়ে নিলে সে। অন্য হাতখানি আনলে ছেঁড়া সার্টের পকেটের কাছাকাছি। তারপর হঠাৎ কি যে হ'ল, বিড়ালের মুখ থেকে যেন ইঁদুর ছানাটি পড়ে গেল টপ করে! পয়সাগুলো ছড়িয়ে পড়লো কাগজের ভাঁজে। পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে আবার সাজিয়ে রাখলো। ফের আবার সাজানো পয়সার স্তূপ থেকে আধখানটা সে তুলে নিলে খাঁ করে। হাতে করে এবার সে আর পয়সা কটা ওজন কোরে দেখলে না। ক্ষিপ্র হস্তে তার পকেটের দিকে ঠেলে সিধে চালান করে দিলে। পয়সা রাখবার কাগজের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে হাতখানি তার পকেটের মধ্যে হয়ে গেল স্তব্ধ। পয়সাগুলি সে আবার হাত ফিরিয়ে দিত যদি না সে মুহূর্তে বুড়ীটা এসে হাজির হ'তো।

হঠাৎ চমকে উঠলো সে খানিকটা। তারপর মুখ তুলে সম্ভাষণ জানাল।

আর এদিকে পকেটের মধ্যে তার পয়সাগুলো এক-এক করে গলে পড়তে লাগলো।

বৃদ্ধা হন্তদন্ত হয়ে বুঝি ছুটে আসছিল। সে এবার হাঁপাতে লাগলো। ঠোঁট দুটি তার কাঁপতে লাগলো। কাগজের স্তূপটা পাতলা হোয়ে এসেছিল। চোখ তুলে সে তাকালে ওদিকে আর তার উপর পড়ে থাকা পয়সাগুলোর দিকে।

'দেখলে তো, আমাকে তারিফ করতে হয় তোমার।' সে উঠে দাঁড়ালে। বললে চোখ ঠেরে তারপর ধীরে ধীরে কেটে পড়ছিল। কয়েক পা গিয়েই সে আবার ফিরে এল। বুড়ী তখন পয়সাগুলো গুণে নিয়ে কাগজটা গুণতে শুরু করেছে, সে বুঝি পালাচ্ছিল। আবার ভাবলে তার দরকার নেই।

'বাতাসে খানকয়েক কাগজ উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে নোংরা নর্দমার জলের মধ্যে।' গলা হাঁকিয়ে সে বলে উঠলো। আবার বলল: 'ওগুলো ওখান থেকে তুলে নিও। শুকিয়ে নিলে আবার নোতুনের মত দেখাবে।'

বৃদ্ধা এবার পয়সা আর কাগজের দামের মধ্যে পার্থক্যের হিসেবে ধরে ফেললে। অনেক কষ্টে সে এবার মুখ খুললে।

'লম্বনাসা, তুই কিন্তু সচ্ নস।'

'কি বলছ তুমি? বল্লাম তো, তোমার কাগজ বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল!'

সে জবাব দিল খানিকটা অপরাধীর স্বরে। তারপর কেটে পড়লো। খানিকটা দূরে গিয়ে সে আবার ফিরে দাঁড়ালে। পয়সাশুদ্ধ মুঠিটা তুলে ধরে বললে:

'হাতে কি আছে এবার বুঝে নে বুড়ী! ধরে নে এ তোরই পয়সা! হ্যা, হ্যা, হ্যা!'

হাসতে হাসতে সে রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করলে।

৪

আর একটু পরে আমাদের নায়ক ছোটাটা তার মন্থর করে আনলে। পকেটের মধ্যে পয়সা কটা সে গুণতে লাগলো আঙ্গুল দিয়ে।

সবশুদ্ধ পাঁচটা। এ বুঝি তার প্রথম পাঁচটা পয়সা হাতে এল। এত পয়সা দিয়ে কত কি-ই না কেনা-কাটা যায়। হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবলে, কিছু একটা এখন কিনে খেয়ে নিলেই তো হয়?···মিষ্টি কিনলে কেমন হয়? সাংগাতদের দেখিয়ে দেখিয়ে বেশ দিব্যি পেট ভরে খাওয়া যাবে। তা না হলে

তাকে ভিক্ষে করে খেতে হত, না হয় বাত্‌লাতে হোত অন্য কোন কার্যকরী মতলব। (যেমন রেস্তোরাঁর কোন বাসন-মাজা ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়েকুড়ে খাওয়া ওর কাছ থেকে।) মিষ্টি খাওয়া, তার কথা ছেড়ে দাও। কারো কাছে মিষ্টি খাওয়ার পয়সা চাইতে গেলে উনি অমনি এক ঘুষি বসিয়ে দেবেন নাকের উপর। আর রেস্তোরাঁর রাত্রির এঁটো খাবারদাবারের মধ্যে মিষ্টি বড় একটা পড়ে থাকে না। খানিকটা মিষ্টির স্বাদ আমাদের নায়ক একবার পেয়েছিল। আর সে স্বাদ এখনও তার মুখে লেগে আছে। পকেটের পাঁচ পয়সার বিনিময়ে তা' কিছুটা মিটিয়ে নিলে কেমন হয়?

পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন এক প্রশস্ত গলির মুখে সে দেখলো, কয়েকটি ছেলে-মেয়ে জটলা করছে। সেও থেমে পড়লো তাদের পাশে। না, মিঠাই বিক্রী হচ্ছে না। তবে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া হচ্ছে একখানি করে ছবির বই। ছবি দেখে দেখে বইগুলি আবার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

উল্টে-পাল্টে বইয়ের ছবি দেখে ফিরিয়ে দিতে আমাদের নায়কেরও যে এর আগে অনেকবার ইচ্ছা হয়নি এমন নয়। অন্য ছেলেমেয়েদের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে সে কতবার ছবি দেখেছে। কিন্তু যখনই ছবিটি বুঝবার চেষ্টা করেছে তখনই তার পাঠক পাতাটা নিয়েছে পাল্টিয়ে। খানকয়েক বই এমনি ধারা খুশী মত পাতা উল্টিয়ে দেখতে সংকল্প করল সে।

'পয়সায় বিশখানা করে বুঝি?'

খুব পরিচিত স্বরে শুধালে সে। 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার ফিরিয়ে দেব।'—

বই ফিরিওয়ালা চোখ তুলে দেখল ওকে আপাদমস্তক। তারপর তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেঃ

'যা পালা, ঘেয়োমাথা!'

'কী! মুখ খিস্তি করছো কেনো। দেখ, আমারও পয়সা আছে।' সে হাতের মুঠি খুলে ঘামে ভিজা চকচকে পয়সা পাঁচটা মেলে ধরলে।

'পয়সাপিছু পাঁচখানা করে কিন্তু।' ষ্টল-ওয়ালা বললে পয়সার দিকে হাত বাড়িয়ে। 'পাঁচ পয়সা যদি দাও তবে ত্রিশখানা বই দেখতে পাবে।'

'তা কেন! পয়সায় পনেরো খানা করে দেবে না কেন, শুনি?' এ বলে সে তার হাতের পয়সা কটা পকেটের মধ্যে রেখে দিলে। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটা বই পড়ছে তার হাতের বইখানির দিকে তাকালে।

দশটা নাগাত কেনা-বেচা বন্ধ হ'লো। বিশখানা বইয়ের পরিবর্তে ও খালি

দু'টি পয়সা মাত্র ষ্টল-ওয়ালাকে দিয়েছে। সবকটা বই তাও-পন্থী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে। সবাই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। মেয়েরাও সব ডানপিটে, তরবারি চালাতে ওস্তাদ্।

বই ক'খানির এক লাইনও সে পড়তে পারেনি। কেবল ছবিগুলোর আপন মনগড়া মানে একটা ধরে নিয়েছে। বইগুলি পরপর গ্রন্থাবলী পর্যায়ে। ছবিগুলিও তেমন ভাল আঁকা নয়। তার উপর অক্ষর পরিচয়ও নেই। সুতরাং কোনটা কি বুঝে উঠতে পারলো না। তাহোক, ধৈর্য সহকারে সে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলো। একটি ছবিতে দেখতে পেলো ছোট্ট এক শিশুকে কোলে নিয়ে একটি মেয়ে তরবারি নিয়ে লড়াই করছে ভয়ংকর আকৃতির একদল আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে (আর তাদের মধ্যে রয়েছে একজন সন্ন্যাসীও)। দু' ফলাওয়ালা একখানি প্রকাণ্ড তরবারি নিয়ে একজন তো মেয়ে আর শিশুটিকে আঘাত করলো। দুমুখো তরবারির সম্পর্কে আমাদের নায়কের সাধারণত, বেশ একটু কৌতূহল ছিল। এখন তা পরিণত হলো নিকৃষ্ট ঘৃণায়।

'এ যে অনেকটা 'জলে-পড়া কুকুরকে সবাই মিলে ঠ্যাঙান গোছের দেখছি ! কোন বেজন্মা না তা করতে পারে ? পাষণ্ড, কাপুরুষ কোথাকার !'

পাতাটা সে উল্টে গেল। পরের পৃষ্ঠায় দেখলো, মেয়েটি শিশুটিকে নিয়ে পালাচ্ছে বনের দিকে। আর তার পেছনে তরবারি বাগিয়ে আসছে ভীষণ আকৃতি ওই লোকগুলো। আর একটা পাতা সে উল্টিয়ে নিলে ব্যগ্র হাতে। মন্দ নয়। বনের ধারে এসে মেয়েটি এবার রুখে দাঁড়িয়েছে লড়াই-এর জন্য। আর এ চিত্রে দেখা গেল আর একজন সন্ন্যাসী কৃপাণ হস্তে ছুটে আসছে। যুদ্ধ করতে নিশ্চয়ই।

উনি কে এলেন সাহায্য করতে ? আমাদের নায়ক শুধালো উত্তেজিত হয়ে। তারপর আর একটা পাতা গেল সে উল্টিয়ে। সন্ন্যাসীটি যদি সত্যি ভাল হন তবে নিশ্চয় তিনি নারী ও শিশুটির সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবেন। সে নিজে হলে তাই করতো। পরের ছবিতে দেখা গেল ক্ষান্ত দিয়েছে ওরা লড়াইয়ে। চক্রাকারে ওরা দাঁড়িয়ে কি যেন সব বলাবলি করছে। সন্ন্যাসীটিও আছেন ওদের মধ্যে।

পড়তে পারলে হয়ত জানতে পারতো কি সব কথা বলাবলি করছে ওরা। সন্ন্যাসীটিও বা কাকে সাহায্য করলেন। সন্ন্যাসীটি বুঝি এবার কিছু বলছেন। কেননা তাঁর মুখ থেকে বেলুনের মত কি যেন সব বেরিয়ে আসছে। আর সে বেলুনের মধ্যে কি সব কথা যেন লেখা ! সে রীতিমত অবাক বনে গেল।

বুঝতে পারলো না অবশ্য কি লেখা আছে। তবে লড়াই যে থেমে গেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। মেয়েটির মুখ থেকেও কথার বেলুন যেন একটা বেরিয়ে আসছে।

পরের ছবিতেও দেখা গেল মেয়ে আর শিশুটিকে। বাদ বাকি সবাই (ভীষণাকার সে দুর্বৃত্ত আর সন্ন্যাসী দুজন) কিন্তু অন্তর্হিত হয়েছে। মেয়েটিও আর বনের মধ্যে নেই। এসেছে গৃহাঙ্গনে। এখন হাতে আর তরবারি নেই। বিছানার ধারে বসে আছে সে। মাথাটা পড়েছে সামনের দিকে ঝুঁকে। মুখখানি ক্লান্ত বিভ্রান্ত। শিশুটি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ওর মুখ থেকেও বেলুনাকার কি একটা যেন বেরিয়ে আসছে। শালা, কি লেখা আছে, কে জানে !

ঘুণাক্ষরে একবিন্দুও হৃদয়ঙ্গম হ'লো না আমাদের নায়কের। কাজেই শিল্পীর ওপর রাগ তার স্বাভাবিক।

'এখানটায় দরকারী এ অংশটুকু ভাল করে আঁকতে পারলো না, শালা ?' বিড় বিড় করে উঠলো সে।— 'আরও সব কথা দিয়ে বোঝাতে পারলো না ? মেয়ে আর ছেলেটার ঘরের কোণে এসে অমন করে লুকোবার কি দরকার ছিল ? তবে নিরাপদে যে ওরা বাড়ী ফিরলো তা ভাল—খুশীর কথা।' মেয়ে ও শিশুটির সুখসুবিধার জন্য সেও সচেষ্ট হয়ে উঠলো।

ওদের সম্পর্কে কিছু সে জানে না। তবে ওরা নিশ্চয় ভাল লোকই হবে। ওদের কি শেষ পরিণতি হ'লো তা জানতে সে ব্যগ্র হয়ে উঠলো। সন্ধান করলে ওদের সম্বন্ধে আর কোন ছবির বই আছে কি না। ছবিগুলি সে দেখলে যত্ন সহকারে। কোথায় ওরা লড়াই করছে শত্রুর সঙ্গে। তার কল্পনার সুতো ছিঁড়ে গেল। আগেকার কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে কুড়িখানা ছবির বই সে এমনি করে শেষ করে ফেললে।

'এই যে, কুড়িখানা বই-ই তোমার ফিরিয়ে দিলাম। মেয়ে আর বাচ্চাটিকে নিয়ে কোন বই থাকলে দাও।' প্রশ্ন করলে সে বইওয়ালাকে। পেটটা এ সময় তার খিদেয় মুচড়ে উঠলো। হাতখানি সে পেটের উপর একবার বুলিয়ে দিলে।

বইওয়ালা আর একজন ছোকরা-পড়ুয়ার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল। মলাটের উপর এক মেয়ের ছবিওয়ালা একখানি বই টেনে নিয়ে সে আমাদের নায়কের হাতে তুলে দিলে। এ মেয়েটি যে সে মেয়েটি নয় বেশভূষা দেখেই সে বুঝে নিলে। হাতে তরবারিও নেই তার। শারীরিক ভঙ্গী দেখানো গোছের

ঢঙে আঁকা ছবি। মনে ছাপ রেখে যায় এমনি ছবি বলে মনে হয়। খস্‌খস্‌ করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমাদের নায়ক বিরক্ত হয়ে উঠল। এবার সহসা তার মনে পড়ল নোতুন বইয়ের দামটা এখনও তার দেওয়া হয়নি। তাই সে বইটা তক্ষুণি আবার ফিরিয়ে দিলে। যাবার জন্য পা বাড়িয়ে সে বলে উঠল : 'না, বইখানা বিশেষ ভাল না।'

'তোমার কাছ থেকে দামটা এখনো পাই নি কিন্তু', বললে স্টল-ওয়ালা। স্টলের বইগুলি সে গুণে নিলে। 'বইগুলো দেখার জন্য তোমাকে আরো দু'পয়সা দিতে হবে', বললে লোকটা।

'কী! আমি শুধু তোমার বইগুলি পরখ করে দেখছিলাম আর তার জন্য তুমি পয়সা দাবী করছো?'

'কিন্তু আগে তো তুমি তা বলোনি?—বলেছিলে কি? তুমি যদি শুধু দেখতে চাইতে তাহলে একখানা বই দেখলেই তো পারতে। সব কটা বই এমনি করে ঘাঁটাঘাঁটি করার কি দরকার ছিল? গোটা তাকটাই তুমি উল্টিয়ে গেলে! এখন ঠকিয়ে সরে পড়তে চাইছো? ফেল আরও দু'পয়সা!'

'কে ঠকাচ্ছে?'

আমাদের নায়ক যেন একটু অপ্রস্তুত হল। বিষয়টি নিয়ে মনে মনে যত নাড়াচাড়া করতে লাগলো ততই পয়সা দুটো ফেলে না দিয়ে এখান থেকে সরে পড়ার কথা ভাবতে লাগলো সে। 'ঠিক আছে, লিখে রেখো, কাল পয়সা দিয়ে যাবো।'

'কোথাকার কে তুমি, তোমাকে আবার কে চেনে? ধার টার চলবে না।'

'সে কি, তুমি আমায় চেনো না? আমার নাম লম্বনাসা। ঐ যে ওখানে শৌচাগারের পাশে যে বুড়ীটা বসে থাকে ওকে জিজ্ঞেস কর না, ও বলে দেবে'খন।'

কথাগুলি বলেই আমাদের নায়ক জোরে পা বাড়ালে যাবার জন্য। এসব ব্যাপারে তার জুড়ি কমই আছে। পয়সা দুটোও বাঁচলো আর লম্বনাসা নামটাও জাহির করা হ'লো। নামটি আর তেমন খারাপ কি! ওর দলের কোন ছোকরা যদি নিজের ক্ষমতার বড়াই করতে চায় তাহলে সে কি তখন তার নাকের ডগা দেখায় না (যেমন করে সব দেশের বাচ্চারা নিজের বুক ঠুকে বড়াই করে—অনুবাদক)? নাকটা হচ্ছে দেহের অমূল্য সম্পদ।

৫

আমাদের হিরো বা নায়ককে এবার লম্বনাসা বলেই ডাকা হ'ক। এ নামে সে নিজেকে ডাকতে ভালবাসে। ওর জীবনে কিন্তু এর চাইতেও বেশী চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা ঘটেছিল।

সঠিক বলতে পারি না ব্যাপারটা যে কখন ঘটেছিল। তবে খুব বেশী পরে নয়। এরই বছরখানেক পরের ঘটনা হয়ত। দিনটা ছিল ভারী গুমোট। রোদ আর বৃষ্টির মাঝামাঝি।

তুপুর বেলার খাবার সময়। রাস্তাভর্তি লোকজন। আমাদের লম্বনাসা বিশেষ একটা জায়গা বেছে নিয়ে শাঁসালো লোকজনের সন্ধান করছিল ভিড়ের মধ্যে। ফিকিরে ছিল ভুলিয়ে ভালিয়ে ওদের কাছ থেকে কিছু একটা আদায় করার।

সুবেশ এক যুবক-যুবতীকে নিয়ে লম্বনাসা সহসা চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্ষিপ্রপদে ওদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল:

'দেন দিদিমণি, দেন দাদাবাবু, একটা পয়সা দেন।'

গলায় তার কাতর মিনতি। অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে এ শ্রেণীর লোকদের কিছুক্ষণ পিছু ধাওয়া করতে পারলে ফল পাওয়া যায়। এর একটু পরেই হয়ত তরুণীটি বিরক্ত হয়ে বলে উঠবে: 'জ্বালিয়ে খেল দেখছি, ছোঁড়াটা!' আর তখনই হয়ত যুবকটি ওর দিকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দেবে। দেবে হয়ত নিজের কান তুটোকে ঝালাপালার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য কিংবা হয়ত তরুণীর খানিকটা মন পাবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আজ অনেক দূর সে পিছু পিছু এমনি এক যুবক যুবতীর ধাওয়া করল। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। হাতে হাত রেখে তরুণ-তরুণী তু'জন আপন মনে কথা বলে চলল তো চলল! যেন কথার আর শেষ নেই। এবার ওরা মোড় ফিরলে। আর সামনে পড়ে গেল এক পুলিশ। লম্বনাসা থমকে দাঁড়াল। তরুণ-তরুণী গেল অনেকখানি এগিয়ে। তার পর পুলিশটার পাশ কেটে সে আবার ওদের পিছু নিলে। ওদের নাগাল পাবে কি না কে জানে? তবু সে এগিয়ে গেল। আশা ছাড়ল না। ওই যে দেখা যাচ্ছে। ওরা বুঝি একটু থামল।

লম্বনাসা দ্রুত পা চালিয়ে ছুটল ওদের দিকে। আর একটা মেয়েও গিয়ে একত্র হল তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে। কি যেন কথাবার্তা বলছে ওরা। হঠাৎ মেয়ে তু'টি শুরু করে দিলে ঝগড়া। একে অপরকে মেরে বসল। যুবকটি তু'জনকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগল আপ্রাণ। একবার একে আর একবার

ওকে পর্যায়ক্রমে বোঝাতে লাগল। লম্বনাসা যখন কাছে গিয়ে পৌছল তখন রীতিমত একটা ভিড় জমে গেছে কলহরতা মেয়ে দু'জনকে ঘিরে। আর যে যখন পারছে তাদের নানা উপদেশ দিচ্ছে।

ভিড়ের ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কির মধ্যে কেউ বুঝি পয়সার ছোট্ট একটা পুরিয়া ফেলে গিয়ে থাকবে। লম্বনাসার সেয়ান দৃষ্টি তা এড়াল না। তক্ষুণি সে তা তুলে নিল। পাছে আর কেউ তাহলে আত্মসাৎ করে নেবে। পরম নির্বিবাদে পুরিয়াটি সে তার পকেটে চালান দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের পা গলিয়ে ওখান থেকে সে কেটে পড়লে। আর সিধে গিয়ে উঠলে অপর ফুটপাথে। তারপর হেঁটে চললে দিব্যি শিষ দিয়ে দিয়ে।

এসব ব্যাপারে লম্বনাসা সব সময়ই ডানপিটে ও জোগাড়ে। এখনও অবশ্য সে অপরের পকেটে হাত চালাতে শেখেনি। সে পর্যায়ে এখনও সে এসে পৌছয় নি। তবে পূর্বে ক্ষেত্রবিশেষে সে তাতে পরোয়া করে নি। আগে অবশ্য কোথাও ইতস্ততঃ করলেও—যেমন বুড়ীর কাছ থেকে শৌচাগারের পাশে দরজার মুখে পাঁচটা পয়সা ভাঁড়িয়ে নেওয়ার সময় মনটা একটু খুঁত খুঁত করলেও সেটা তার শিশুসুলভ দুর্বলতা ভাবা সমীচীন হবে না। বরং সে বিশ্বাসহন্তা হতে চায় নি। বুড়ীটি আর যাই হোক বন্ধু হিসাবে ওকে তার কাজটা দিয়েছিল তদারক করতে। সে তো ওর সব কটা পয়সা মেরে দেয় নি?

৬

খরা আবহাওয়ায় লম্বনাসা যেখানে সেখানে বানিয়ে তোলে তার 'আস্তানা'। এ অবশ্য তার ও তাদের শ্রেণীর পক্ষেই খাটে। দিনের বেলা রাস্তা ধরে চলতে চলতে ওর সঙ্গে হয়ত দেখা হ'লো কোনখানে। কিন্তু রাত্রে যে সে কোথায় ঘুমিয়ে কাটায় তা জানবার উপায় নেই। তবে হ্যাঁ, সে যে বৃহত্তর শাংহাই-এ অবস্থান করছে তাতে নিশ্চয় কোন সন্দেহ নেই। রাতারাতি তার ডানা গজিয়ে সে যে কোথাও বেমালুম উধাও হয়ে যায়নি, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সে কি তাহোলে ক্ষেতের ইঁদুরের মত গর্ত খুঁড়ে মাটিতে ঢুকে পড়ল? তা অবশ্য এখনও অনুসন্ধান করা হয় নি। লেখককে বাধ্য হয়ে তাই এখানটা ফাঁক রাখতে হয়েছে। তবে এটুকুন তিনি জোর গলায় বলতে পারেন যে লম্বনাসার অস্থায়ী 'আস্তানা' আর যেখানেই হোক না কেন আশমান কি গর্তের মধ্যে নয়।

আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকতে পারে, বৃহত্তর শাংহাই-এর উত্তর

দিকে যেখানটায় চীনাপাড়া বিদেশীদের 'বিশেষ এলাকার' সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, সেখানে রয়েছে আগাছায় ভর্তি কুচি পাথরের এক মাঠ। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে 'জাপ সম্রাট বাহিনী' এখানটায় প্রথম গোলা বর্ষণ করেছিল। স্মরণীয় এ যুদ্ধ এলাকার মধ্যে গোটা কয়েক উঁচু দেওয়াল এখনও খাড়া রয়েছে; কোন কিছু বুঝি ওদের ধূলিসাৎ করতে পারবে না। এমনি এক দেওয়ালের গায়ে আছে শাংহাই-এর 'সুদিনের' স্মৃতি সিমেন্ট বাঁধানো এক আঁস্তাকুড়। ভাঙা ইটপাটকেল আর কাদায় ঢাকা ও জঞ্জালের পাত্রটিকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কুচি পাথরের একটি ঢিপি। লম্বনাসা কি করে কখন জানি না, এ 'বাসস্থানটি' আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় একটু পরিশ্রম করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সে ওটাকে তার শীতকালের মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিয়ে থাকবে।

এত কথা বললাম, তার পেছনে যে কোন ভিত্তি নেই তা নয়। কেউ কেউ বুঝি সত্যই ওকে তার নতুন 'বাড়ী' থেকে খোশ মেজাজে বেরিয়ে আসতে দেখেছে জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে কোন একটা দিন। দিনটা ছিল ভারী ঠাণ্ডা। কালো মেঘে ছেয়ে রয়েছে আকাশটা। সূর্য ওঠার নাম নেই। সকাল থেকেই বুঝি আকাশটা মুখ গোমড়া করে আছে। সেদিনও ভোরবেলা থেকে বৃহত্তর শাংহাই-এর কোন কোন এলাকায়—যেখানে গণ্যমান্য সমৃদ্ধিশালী ভদ্রলোকের বাস, তাঁদের ঘরে ঘরে বুঝি বিশেষ জপ-তপের ধূম পড়ে গিয়েছিল। সরকারী দপ্তরখানা বা তাঁদের ব্যবসাকেন্দ্র প্রভৃতিতে বেরুবার আগে 'মিনিট তিনেক' ধরে চোখ বুজে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ওঁরা ইষ্টনাম জপ করতে ভুলেন না।

সকাল থেকেই শাংহাই-এর এক প্রধান রাজপথে নানান শ্রেণীর লোক দলে দলে এসে জড় হোতে লাগলো ক্ষুব্ধ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত। মুখে তাদের আকাশ-ফাটা শ্লোগান। চার বছর আগে জাপানী গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

আমাদের দোস্ত লম্বনাসা সবে তার আস্তানা ছেড়ে বেরিয়েছিল সকাল বেলাকার কিছু খাবারের সন্ধানে। শোভাযাত্রাকারীদের দেখে প্রথম সে ভাবলে, ওরা কোন শবযাত্রা দলের অংশ বিশেষ হবে বুঝি। 'ক্ষুদে উ-সু নিপাত যাক' বলে সে সহসা বিড়্‌বিড়্‌ করে উঠল। 'শবযাত্রার শোকার্ত দলে ভীড়ে পড়া যাক। কে আর জানতে আসছে?' রাস্তাটা যেখানটায় মোড় নিয়েছে ওখানে এসে সে থমকে দাঁড়ালো। দেখতে লাগলো সে শববাহী দলের

নিশানা কাগজে তৈয়ারী মালা বা শবযাত্রীদের শোকসূচক কিছু দেখতে পায় কিনা। কিন্তু শবযাত্রীদের কারোর পরনে শোকসূচক কালো পোশাক পরিচ্ছদ দেখছি না যে? কেউ পরেছে চীনা গাউন, আর কেউ বা বুঝি সাহেবী ধরনের পোশাক-আশাক আর তাতে রয়েছে ছাত্র, শ্রমিক আর শিক্ষানবীশের দল। অনেকের হাতে রয়েছে ছোট ছোট পতাকাও।

শোভাযাত্রার অগ্রভাগ এগিয়ে চললো তো চললো। তার যেন শেষ নেই। বরং শোভাযাত্রাটা যতই এগিয়ে যেতে লাগলো, আশপাশের অলি-গলি থেকে লোকজন মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো বেরিয়ে এসে তাতে যোগ দিতে লাগলো শত শত হাজারে হাজারে। ক্রমশঃ তা ফেপে উঠতে লাগলো। মিছিলের সঙ্গে চলতে চলতে সাইকেল হাঁকিয়ে কেউ কেউ আবার হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করে চললো রাস্তার পাশে দাঁড়ানো দর্শকদের মধ্যে। কি যেন দু' একটা কথা বলতে লাগলো। সহসা মিছিলটি ফেটে পড়লো প্রচণ্ড চিৎকারে:

'চীনের মুক্তি চাই!'

হাজার কণ্ঠে সমবেত চিৎকার ধ্বনি।

লম্বনাসা চিৎকারের অর্থ একবিন্দুও বুঝে উঠতে পারলো না। তবে বুঝল এটা শবযাত্রার মিছিল নয়। খানিকটা সে দমে গেলো। তবু আগ্রহ তার কমলো না। কে যেন হাতে তার একখানা কাগজ গুঁজে দিল। বললে:

'এসো না খোকা, আমাদের সঙ্গে এসে স্বদেশী মিছিলে যোগ দাও!'

স্বদেশী মিছিলে সে-যে কোন কাজে আসবে লম্বনাসা বুঝে উঠতে পারলো না। শবযাত্রার মালা বয়ে নেবার কাজ তো নেই এখানে?...কিন্তু আমাদের লম্বনাসাকে এমনি ধারা হৈচৈ ভীড় থেকে আটকায় কে? সেও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললো।

মিছিল এগিয়ে চলেছে। লম্বনাসার আগে আগে চলছিল দুটি যুবক ও একটি তরুণী। কি যেন ওরা বলাবলি করছিল। একবিন্দু সে বুঝে উঠতে পারল না। ওদের কথাবার্তায় বিদেশী শব্দের যেন শেষ নাই। বিদেশী কথা শুনলে লম্বনাসার ভয়ানক রাগ হয়। বিদেশীরা যখন তখন তাকে মেরে বসে। যে সব চীনের লোক বিদেশী কথাবার্তা বলেন তাঁরাও কম নন্। বরং তাঁদের মারে জ্বালাটা বেশী।

মিছিলের পুরোভাগটি বুঝি এবার বাধা পেল। ওদিক থেকে চিৎকার ভেসে আসতে লাগলো। চলতে চলতে সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। লম্বনাসার আশেপাশে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর—প্রতিবাদে মুখর।

'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও! বিশ্বাসঘাতকদের ধ্বংস করো!'

মিছিলের পশ্চাৎভাগ থেকে ভেসে আসতে লাগল চিৎকারের পর চিৎকার :

শোভাযাত্রার অগ্রভাগটি এবার বজ্রকণ্ঠে ফোঁসে উঠলো :

'দেশদ্রোহীর দল নিপাত যাক!'

'১৯৩২-এর ২৮শে জানুয়ারী দীর্ঘজীবী হোক!'

'নিপাত যাক—নিপাত যাক—'

সামনের দিকে একটা কি যেন ঘটলো। চিৎকার সহসা থেমে গেল। কিন্তু মিছিলের পেছন দিকটা তখনও সমানে শ্লোগান দিয়ে চলেছে জঙ্গী দ্বিগুণ আওয়াজ তুলে :

'জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!'

লম্বনাসাও শ্লোগানে যোগ দিলে। তার পাশে পাশে যে ছেলেটি চলেছিল লম্বনাসা লক্ষ্য করলে, ছেলেটা তার ওভারকোটের বোতামগুলো আটকাতে বুঝি ভুলে গেছে। নীচের পকেট থেকে ছোট একটা টাকার ব্যাগ খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে। লম্বনাসা এ সব ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। নতুন অভিজ্ঞতা সে লাভও করেছে সম্প্রতি। মনিব্যাগটা বুঝি তাকে স্পষ্ট ডাকছে হাতছানি দিয়ে। ছেলেটার সে কাছ ঘেঁষে এল। আর সমানে চিৎকার করে বললো :

'কুত্তার বাচ্চা সব—নিপাত যাক!'

সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল এ মুহূর্তে। লম্বনাসা দেখলে পুলিশের দল পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মিছিলের উপর বর্বরের মত। নিষ্ঠুর হস্তে ছিনিয়ে নিতে লাগল তারা পতাকাগুলি। আর হেঁকে উঠল :

'শ্লোগান দেওয়া নিষিদ্ধ। শ্লোগান দেওয়া চলবে না!'

পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে লম্বনাসা কার দুখানি লম্বা পায়ের মাঝখান দিয়ে যেন সটকে পড়লে। দেখলে সে ছেলেটি আর একটি মেয়েকে পুলিশ এসে মার দিচ্ছে। ওদের হাতের পতাকা ছিনিয়ে নিচ্ছে। ছেলে ও মেয়েটির সাহায্যে অনেকে ছুটে এল। সাইকেল আরোহীর দল ঘণ্টা বাজিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। মিছিলের অনেকেও ওদের বেষ্টন করে ধরলো আর দেখতে না দেখতে শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ!

'মার মার, মারের বদলে মার দে!'

চিৎকার উঠলো ভীড় থেকে। লম্বনাসা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ভিতরে। এ আর তাকে কেউ বাৎলে দিতে হোল না। পুলিশের হাতে সে এতদিন

একতরফা মার খেয়ে এসেছে। ছাত্র আর মেয়েটির গায়েও হাত তুলতে পুলিশ যখন দ্বিধা করলো না, এবার তার বদলা নেবার পালা। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!

ভীড়ের মধ্যে কেউ বুঝি তার পতাকাটা ফেলে গিয়েছিল। লম্বনাসা তা কুড়িয়ে নিলে। তুলে ধরলে মাথার উপর। আর তা আন্দোলিত করতে লাগলে যথাশক্তি।

দক্ষযজ্ঞ অবশেষে স্তব্ধ হোল। শোভাযাত্রা আবার এগিয়ে চলল। পুলিশী আক্রমণের সময় ছাত্র আর মেয়েটির নিজ নিজ পতাকা বুঝি হাতছাড়া হয়েছিল। লম্বনাসার সঙ্গে ওরা এখন কদম কদম এগিয়ে চললো। ছেলেটির দিকে সে তার পতাকাটা বাড়িয়ে দিলে। বললে:

'এটি নাও, আমি আর একখানা নিচ্ছি!'

ছেলেটি স্মিত হাসি হাসলে। তারপর কি যেন বল্লে আর একজন ছাত্রকে। লম্বনাসা তা বুঝল না। বিরক্ত হয়ে সে তখন অন্য প্রসঙ্গ পাড়লে। সহসা শুধালে:

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'মিয়াওহোঙ-এ।'

'কেন, এসব পতাকা কিসের জন্য?'

'তোমার মনে পড়ে না বুঝি ভাই,' মিছিলের মেয়েটি বাধা দিয়ে এবার বলে উঠলে। —'চার বছর আগে শাংহাই-এর উপর জাপানীরা গোলাবর্ষণ করে যায়। জাপানী বোমারুরা নির্বিবাদে বোমা ফেলে—কত কত ঘর বাড়ি তাতে পুড়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে।' লম্বনাসা বললে।

'বেশ কথা, তোমার মনে আছে যখন তুমি কি তার প্রতিশোধ নিতে চাও না?'

লম্বনাসা এই শ্রেণীর কথাবার্তায় অভ্যস্ত না হলেও মর্মার্থ তার উপলব্ধি করলে। ফিক করে সে এবার হেসে ফেললে। সায় দিলে মাথা নেড়ে।

'চীনকে মুক্ত কর!'

আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে উঠলো আবার বজ্রনাদ। লম্বনাসা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি তুললে। মানে তার সঠিক বুঝলে কিনা সেই জানে।

'জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!'

'১৯৩২-এর ২৮শে জানুয়ারী দীর্ঘজীবী হোক!'

চারিদিক থেকে সমবেত জনতা আক্রোশে ফুলে উঠতে লাগলো ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে আক্রমণের কথা সে বুঝি এবার কিছুটা বুঝে উঠতে পারলো। সমানে তাই সে শ্লোগান দিয়ে চলল। খোলা ওভারকোট পরা সেই ছেলেটিও দু'হাত তুলে ফেটে পড়লো পকেট থেকে যে তার মনিব্যাগটা কখন পড়ে গেল সে জানতেও পারলো না। লম্বনাসার শ্যেন দৃষ্টি কিন্তু তা এড়ালো না। ক্ষিপ্রহস্তে সে তা তক্ষুণি তুলে নিল। হাত দিয়ে তা একবার যাচাই করলে। মুখে কিন্তু তার তখনও সেই চিৎকার :

'বিশ্বাসঘাতকদের নিপাত কর !'

'মিয়াওহোঙ্-এর দিকে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল !'

পাকা অভ্যস্ত হাত। লম্বনাসা টাকার থলেটা ফাঁকতালে এক সময় মালিকের পকেটে আবার রেখে দিলে। টেরও পেলে না ছেলেটি। বুকটা তার গর্বে বুঝি সহসা ফেপে উঠলো। দু'হাত ছুঁড়ে সে আবার চিৎকার করে উঠল :

'কুত্তার বাচ্চারা ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক! এগিয়ে চল, এগিয়ে চল মিয়াওহোঙ্-এর দিকে।'

মিয়াওহোঙ্ কোথায় বা জায়গাটা কেমন জানে না সে। তা হোক, ছেলে আর মেয়েটির উপর তার আস্থা রয়েছে। তারও যাওয়া উচিত বৈকি! ভাল কিছু একটা ঠিক ঘটেও যেতে পারে।

'চীনের মুক্তি চাই !'

লম্বনাসা যেখানটায় তার 'আস্তানা' গেড়েছিল সেই পাথরকুঁচির মাঠ পেরিয়ে [illegible] চললো মিছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেয়ালগুলো দেখে এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ [illegible] গেল মিছিলের মধ্যে। সমস্বরে সবাই আবার আওয়াজ তুললে :

[illegible]নের মুক্তি চাই !'

অনুবাদক : নিখিল সেন

সেকেলে প্রথা

চাও শু-লি

এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে আমাদের এ গল্প।

উত্তর চীনের হোপে প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ জুড়ে বিস্তীর্ণ যে পার্বত্য এলাকা, সেখানকার এক ছোট্ট পল্লীতে ঘটেছিল কাহিনীটি। ঐ পল্লী সম্পর্কে বলাবলি করত লোকে, 'উঁচু পাহাড়ের উপরকার গ্রামখানি রাজা-মহারাজাদের নাকি নাগালের বাইরে।'

তারপর দেশ যখন মুক্ত হোল, তখনও কিন্তু লোকে ও কথাটারই একটু রদবদল করে বলাবলি করত: উঁচু পাহাড়ের উপরকার ওই গ্রামখানি গণরাষ্ট্রের নাগালেরও বাইরে।' গ্রামখানি বহু দূরে ছিল বলে তার রীতি-নীতিও ছিল পঁচাত্তর বছর আগেকার সব! মেয়ে হলেই বিয়ের পর শাশুড়ীর গঞ্জনা আর মার-ধর হজম করতে হোত। বুড়ো হয়ে সে যখন একদিন শাশুড়ী হোত, সেও তার পুত্রবধূকে তেমনি করে বকুনি আর মার-ধর করতে কশুর কোরত না। পুত্রবধূর উপর সে যদি অমন ধারা ব্যবহার না-ই করল, জাঁদরেল শাশুড়ী বলে তাকে কি কেউ তখন পাত্তা দেবে?

প্রাচীন একটা প্রবাদ আছে যার মোদ্দা কথা হোল: 'ঘোড়ার মতই ব্যবহার করতে হয় স্ত্রীকে—নিয়মিত চাপতে হয় তার উপর, ঠ্যাঙাতে হয় নিয়মিত।" স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে পুরুষের এই হোল চিরাচরিত প্রথা। স্বামী যদি স্ত্রীকে ধরে না ঠ্যাঙালো, তবে সে আপন স্ত্রীকে ভয় করে চলে তাই প্রমাণ হয়ে গেল!

মেঙ্-এর পাও-পাও (শাশুড়ী) নিজ পুত্রবধূর উপর এমনিতর চিরাচরিত প্রথা সব মেনে চলতেন। শুধু তাই নয়, বিশেষ আর একটা গুণও তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুখরা। যৌবনে, এমন কি বিয়ের পরও তাঁর ছিল বিস্তর বন্ধু-বান্ধব। স্বামী অবশ্য এটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু এ নিয়ে স্ত্রীকে গাল-মন্দ করা তো দূরে থাক, মুখে টুঁ শব্দটি করলেই স্ত্রী অমনি দশ কথা শুনিয়ে দিতেন। স্বামীই যদি হালে পানি পেল না পুত্রবধূ তো কোন ছাড়! এ দিকে

গাঁয়ের অমন ধারা সেকেলে প্রথা ; ওদিকে আবার দজ্জাল পাও-পাও। মেঙ্-এর জীবন হয়ে উঠল অতিষ্ঠ। তা ছাড়া হতভাগিনীর কপালে আরও অনেক দুঃখ লেখা ছিল।

প্রথমতঃ, বাপের বাড়িতে তার কেউ ছিল না খোঁজ-খবর নেবার মত। যখন তার বয়স নয়, তখন তের বছরের এক বোন আর কোলের এক ভাইকে রেখে বাপ-মা দুজনেই মারা মান। আত্মীয়-স্বজন বলতে কেবল ছিল ওরাই। যে বাড়িতে দিদির বিয়ে হয়েছে সে বাড়ির সঙ্গে মেঙ্-এর শ্বশুর বাড়ির ছিল বিবাদ। ওরা তাই তার দিদিকে পর্যন্ত ছোট বোনের বিয়েতে আসতে দেয়নি। অতএব মেঙ্ যখন মার খায়, কে তখন তাকে উদ্ধার করতে আসবে ?

দ্বিতীয়তঃ, মেঙ্ গরীবের মেয়ে। বরপণ সে দিতে পারে নি।

তৃতীয়তঃ, মাকে ছোট বেলায় হারিয়েছে বলে সেলাইয়ের কাজ-টাজ সে শিখে নিতে পারেনি ভাল করে।

চতুর্থতঃ, তার পা দুখানা ছিল অনেকটা স্বাভাবিক আকারের। পা দুখানাকে তার যথারীতি বেঁধে দেওয়া হোত। কিন্তু পা বাঁধবার সময় সে বাঁধনটাকে দিত একটু ঢিলে করে। ফলে তার পা দুখানি স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে তেমন কোন বাধা পায় নি। শহরের লোকে পা-বাঁধা মেয়েদের দিকে যেমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, গাঁয়ের মেয়েরাও তেমনি স্বাভাবিক আকারের পা দেখলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত।

পঞ্চমতঃ, ছোটবেলা থেকে গৃহস্থালির কাজ-কর্ম সব কিছুই তাকে তদারক করে আসতে হয়েছে। ফলে যুক্তিসংগত তর্ক করতে শিখেছিল সে ; মর্জি-মাফিক যখন-তখন গাল-মন্দ হজম করতে প্রস্তুত ছিল না। মেঙ-এর পাও-পাও'কে তখন পায় কে ? বধূকে গাল-মন্দ, মার ধর করবার অছিলা একটা তিনি পেয়ে গেলেন।

যে মেয়ের বরাতে চব্বিশ ঘণ্টা খালি গাল মন্দই লেখা আছে, কান্না ছাড়া তার তখন উপায় কি ? বুকের ব্যথা হালকা করবার এ ছাড়া আর গত্যন্তর কই ? মেঙ্-এর কিন্তু গলা-ছেড়ে একটু কাঁদবার জো-টি ছিল না! বাপ-মা যদি বেঁচে থাকতেন তা হোলে না হয় তাঁদের কাছে গিয়ে একটু কান্নাকাটি করা যেত। বাপের বাড়িতে নিকট আত্মীয় স্বজন বলতে রয়েছে মাত্র বছর দশেকের তার এক ভাই। ওর কাছে গিয়ে গলা ছেড়ে একটু কাঁদা দূরে থাক, বরং কেঁদে উঠলে ওকেই সান্ত্বনা দিতে হয়।

স্বামীর সঙ্গে যদি তেমনি একটু বনিবনা থাকত তবে পাও-পাওর গঞ্জনা

খেয়ে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে খানিকটা চোখের জল ফেলা যেত। কিন্তু তার স্বামীটা হোল ওদেরই একজন যারা মার কথা শুনে বৌকে ধরে সাধারণতঃ ঠ্যাঙায়। মেঙ ওর কাছে গিয়ে কান্না-কাটি করুক আর গায়ে পড়ে ফের মার খাক্ আর কি!

সে যাই হোক, মেঙ যে প্রাণ ভরে কাঁদবার একটু সুযোগ পায় না, আমরা তা বলছি না। নিকটেই তার দিদির বাড়ি। দিদির সঙ্গে দেখা হলেই সে অবশ্য কাঁদতে পারে। পাশের বাড়িতেও থাকে বৌ একটা। তাকেও শাশুড়ীর গঞ্জনা হজম্ করতে হয় হামেশা। গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে তখন কাঁদতে পারে। তা ছাড়া মেঙ-এর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কাগজ তৈয়েরী করে থাকে। কাগজের ভিজে পৃষ্ঠাগুলি রোদে শুকাতে দিতে গিয়ে উঠানে, সে তখন কাঁদতে পারে। বেশীর ভাগ কান্না সে অবশ্য তখনই করে থাকে। দেয়ালে এক একবার কাগজ আটতে গিয়ে সে যখন ঘরে ফেরে, তার জামার প্রান্তটুকু তখন সপ্‌সপে হয়ে ওঠে চোখের জলে।

মেঙ একদিন কাঁদবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। কিন্তু কাঁদতে গিয়ে বিপদও আনল ডেকে। কলে গম ভাঙ্গাতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে একদিন কাঁদছিল, আর সে সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তার এক খুড় শ্বশুর। কাঁদছে কেন সে, তিনি জানতে চাইলেন। মেঙ যখন তাঁকে কেন সে কাঁদছে বলছিল, তার শাশুড়ী তখন সব শুনলেন আড়ি পেতে। অপর কেউ নয় আপন দেওর। মেঙ-এর গাও-পাওকে তিনি এজন্য মুখের উপর দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা শাশুড়ী দেওরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে সাহস পেলেন না। ভয়ও ছিল, কি জানি সে যদি তাঁর যৌবনের বেপরোয়া কীর্তিকলাপ সব বেফাঁস করে দেয়। তিনি তাই সাত তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন।

মেঙ যাতে বাইরের আর কারোর সঙ্গে—বিশেষ করে অপর কোন বধূর সঙ্গে,—কথাবার্তা কইতে না পারে, তার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন শাশুড়ী। কেননা, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারেন, বধূরা এক জায়গায় মিলিত হলে আপন আপন শাশুড়ীর ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আলোচনা করতে ভুলে না। মেঙকে অপর কোন বধূর সঙ্গে দেখলেই তিনি তাকে ধরে ঠ্যাঙাবার একটা সুযোগ খুঁজতে থাকেন। গম ভাঙ্গাবার কলের ঘটনাটা তিনি সহজ চোখে নিলেন না। মেঙ শুধু অপর পুরুষের সঙ্গে কথা কয় নি, মুখের উপরই তার যা-তা সমালোচনা করেছে। 'ছুঁড়িটা দেখছি যাকে দেখে তাকেই আমার নামে লাগাতে থাকে,' ভাবলেন বুড়ী শাশুড়ী। 'মুখটা ওর এবার বন্ধ করতে হবে।'

গম ভাঙা কলের চারদিকে খচ্চরের পায়ের খাঁজের যেমন কখনও অভাব হয় না, তেমনি শাশুড়ী যদি বউকে সাজা দেবার অছিলা খুঁজতে থাকেন, তারও তেমনি অভাব ঘটে না। দিন কয়েক পরের কথা। মেঙ একটু যেন অসাবধান হয়ে পড়েছিল। তাই কি করে একটা ফেটানো ঝাড়ন নষ্ট হয়ে যায়। পাও-পাও অমনি একটা অছিলা পেয়ে গেলেন। মেঙ-এর মাতৃকুলের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে তিনি অমনি শুরু করে দিলেন জঘন্যতম গালাগালি। মেঙ শাশুড়ীকে থামাবার চেষ্টা করে বললে :

'আর গালাগালি করবেন না। আমি ওটা সারিয়ে দেবো।'

'তুই গিয়ে তোর মারটা সারাগে—!'

'দিদির কাছ থেকে নতুন আর একটা না হয় চেয়ে আনছি।'

'তুই তোর মার কাছ থেকে চেয়ে আন্‌গে।'

মহামুস্কিল! সারিয়ে দিলে চলবে না; নতুন আর একটা আনিয়ে দিলেও চলবে না—খালি চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে গাল আর গাল। বধূ এক সময় ক্ষেপে উঠল। রেগে বলল :

'আমার নিজের মা মারা গেছেন অনেক বছর। এখন আপনিই হলেন আমার মা। খামাকা আপনি নিজে নিজেকে গালাগালি করছেন, মা!'

'তোর মার—'

'মা!'

'তোর মা—!'

'মা! মা! মা!'

পাও-পাও অবশেষে রণে ভঙ্গ দিলেন।

বধূও মুখের উপর সমানে জবাব দেয় দেখে তিনি দমে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, ছুঁড়িটার জিভের ধার দেখ্‌ছি কম নয় আমার চাইতে। আচ্ছা, এবার যাক, আরেকবার দেখে নেবো।

একদিন হয়েছে কি, মেঙ স্বামীর পুরনো একটা কোর্তায় তালি দিচ্ছিল। এক টুকরো কাপড় তালি লাগাতে গিয়ে দরকার হতে সে তার শাশুড়ীর কাছে গেল কাপড় চাইতে। শাশুড়ী বলে দিলেন, শ্বশুর মশাইয়ের নিকট গিয়ে চাইতে। এখন কথা হোল, শ্বশুরের কাছে চাইতে যাওয়া সেকেলে প্রথায় বারণ! মেঙ তাই জবাব দিলে, সে অত রীতি-নীতি জানে না। শ্বশুর মশাইয়ের কাছেই সে চাইতে যাবে। মেঙ-এর জবাব শুনে তো শাশুড়ী মহা খাপ্পা। কিন্তু গালাগালির ব্যাপারে তিনি বধূর সঙ্গে বিশেষ

এঁটে উঠতে পারবেন না ভেবে তৎক্ষণাৎ ছুটলেন মাঠে ছেলেকে ডেকে আনতে।

'এক্ষুণি বাড়ি এসে দেখে যা!' তিনি ফেটে পড়লেন ছেলের কাছে গিয়ে। '—তোর বৌকে নিয়ে আমি আর পারলাম না। ও আমায় জ্যান্ত গিলে খাবে দেখছি।'

ছেলেটার নাম মে। মার সঙ্গে সে তখুনি বাড়ি ছুটে এল স্বামী হিসেবে নিজ ক্ষমতা জাহির করতে। 'সেকেলে প্রথা'য় কোনরূপ যুক্তি-তর্ক শুনবার প্রয়োজন নেই। একগাছা বেত নিয়ে বৌকে সরাসরি ঠ্যাঙাতে থাকলেই হোল। কিন্তু মে-র সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। সতেরো বছর মাত্র তার বয়স। মেঙ-এর চাইতে এক বছরের ছোটই। বউ স্বামীর হাত থেকে বেতটা এক সময় ছিনিয়ে নিল।

সেকেলে প্রথার এ হোল চরম ব্যতিক্রম! বধূ কয়েক ঘা পিঠ পেতে নেবে তারপর মার এড়িয়ে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করবে। ইতিমধ্যে কোন বন্ধু বা পাড়া-পড়শী এসে পড়ে বাধা দেবে এবং স্বামী পুংগবকে শান্ত করবে—এই হোল চিরাচরিত রীতি। কিন্তু মেঙ পিঠ পেতে কয়েক ঘা মার খেলে না, মার এড়াতে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করলে না। উল্টো স্বামীর হাত থেকে সে তার কর্তৃত্বের প্রতীক শাসন দণ্ডটি পর্যন্ত নিলে ছিনিয়ে। ব্যাপারটাকে সে তার মর্যাদার চরম হানিকর বলে গ্রহণ করলে। একখানা কাস্তে তুলে নিয়ে সে তখন বধূর ভূরুর ঠিক ওপরটায় সজোরে বসিয়ে দিলে। প্রতিবেশীরা এসে পড়ার পূর্বেই বৌয়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল।

পাড়া-পড়শীরা সবাই মে-র কৃতকর্মের নিন্দা করতে লাগল। বলতে লাগল: 'স্ত্রীর মাথায় কি আঘাত করতে আছে? চোখে দেখা যায় না এমন কোন স্থানে মারলেই তো পারতে।'

স্বামী স্ত্রীকে ধরে মারল কেন সেকেলী প্রথায় তা শুধাবার কোন প্রয়োজন নেই। তাই সে কেন মার খেল, এ প্রশ্নটি কেউ করলে না।

ব্যাপারটার হৈ-চৈ উন্মাদনার আমেজ কেটে যেতে এক মেঙ ছাড়া এ নিয়ে আর কারো কোন উৎসাহ রইল না। মাথার অনেকখানি যে তার কেটে গেছে, কি করে কাটল, কেউ কারো কাছে এ জন্য কোন কৈফিয়ৎ পর্যন্ত চাইলে না। ভবিষ্যতে স্বামী এমন-ধারা খুশী মাফিক মারতে এলে, তা বন্ধ করা যায় কি করে? এমনতর জীবন আর কতকালই বা টেনে চলতে হবে?—মেঙ শুধালে নিজেকে।

এ গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার পথ কই? মেঙ তাই ঠিক করলে আত্মহত্যা করবে! খানিকটা আফিং তাই সে গিলে বসল। যতখানি খেলে প্রাণ যায় ঠিক ততখানি নয়। বাড়ির লোকজন জানতে পেরে তাকে বেশ করে খানিকটা নোংরা জল খাইয়ে দিলে। ফলে ভীষণভাবে সে বমি করতে সুরু করলে।

'বলি, আফিং খেতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি! তা বেশ তো! ঘরে তো আরও এক গামলা পড়ে আছে, সবটা খেয়ে নিলেই পারতে।' পাও-পাও টিপ্পনী কাটলেন।

মেঙ জানালে যে তাতে বরং অধিক খুশী হবে। কিন্তু বুড়ী শাশুড়ী গামলাটা আর নিয়ে এলেন না।

আরেক দিন মেঙ ক্ষেত থেকে বাড়ি ফিরলে তার পাও-পাও অমনি বলে উঠলেন: ফিরতে আজ নাকি ভীষণ দেরী হয়েছে মেঙ-এর। তিনি তাই বধূকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। এক গ্রাস খাবারও তিনি তাকে দিলেন না খেতে। তার দিদি আর পাশের বাড়ির বউটি মেঙকে দেখতে এসে উঠানের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। সে কিন্তু তাদের ভিতরে ডেকে আনতে সাহস পেল না। অবশেষে এক সময় সে ছাঁচতলায় ঘুমিয়ে পড়ল কাঁদতে কাঁদতে। ঘণ্টা কয়েক পর যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন স্বামী আর শাশুড়ী শুরু করে দিয়েছে নাক ডাকাতে। মাথার উপর একরাশ তারা খালি মিটমিট করছে আর তার জামা-কাপড় সব রাত্রির কুয়াশায় ভিজে গিয়ে হয়ে উঠেছে সপ্‌সপে।

পরদিন দুপুর কেটে গেল তবু কিন্তু কেউ তাকে খেতে ডাকল না। হতাশায় তাকে তখন পেয়ে বসল। তাই তার স্বামী আর শাশুড়ী যখন খেয়ে দেয়ে দিব্যি দিবা-নিদ্রায় রত, পা টিপে টিপে সে তখন ঘরে গিয়ে ঢুকল আর গলায় দিলে দড়ি। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, পাশের বাড়ির বধূটি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ঠিক এ সময় এসে উপস্থিত। মেঙকে ঘরের কড়িকাঠে ঝুলতে দেখে সে চিৎকার করে উঠল উচ্চস্বরে। বধূটির আর্ত চীৎকার শুনে পাড়া-পড়শীরা সব ছুটে এল। মেঙ সে যাত্রা রক্ষা পেল। আধ-মরা বোনের দেহটাকে বুকে নিয়ে দিদি তার ফুঁপিয়ে উঠল।

মেঙ এর দুঃসহ জীবনধারা গড়িয়ে চলল ঢিমে তালে।

১৯৪২ সালে এক সরকারী প্রতিনিধি গ্রামে এলেন একটি নারীসঙ্ঘ গড়ে

ভুলতে। সঙ্ঘের সভানেত্রী পদে কে বেশী উপযুক্ত গাঁয়ের লোকদের তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। ওদের অনেকেই মেঙ-এর নাম প্রস্তাব করল। মেঙ বেশ যুক্তি দেখিয়ে কথাবার্তা বলতে পারে, বললে সবাই। কিন্তু প্রস্তাবটা মেঙ-এর পাও-পাওর কাছে পাড়তে সাহস পেল না কেউ। রাষ্ট্র-প্রতিনিধি তখন নিজেই বৃদ্ধা শাশুড়ীর নিকট ছুটলেন। কথাটা তাঁর কাছে পাড়তেই মুখের উপর তিনি না করে দিলেন। বললেন :

'না, না, ও হোল আধ-পাগলাটে গোছের। ওসব কাজ সে কিছুতেই পারবে না।'

প্রতিনিধিটি তখন তাঁকে বিস্তর বোঝালেন, অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না! তাঁর মুখে সেই একই কথা। মেঙ-এর কাজটা করায় পাও-পাওর ঘোরতর আপত্তির মূল কারণ কিন্তু শ্রীযুত 'প্রায়' নিয়ু। শ্রীযুত নিয়ু 'সংস্কৃত কুওমিঙ্‌টাং'-এর গুপ্তচর। তাঁর সংস্কার কার্য এখনো পুরো হয়নি বলেই চাষীরা তাঁকে 'প্রায়' এ আখ্যা দিয়েছিল।

কুওমিঙ্‌টাং সেনাপতি 'সংঘর্ষ-বাধাতে-ওস্তাদ' জু-র সৈন্যদল যতদিন গাঁয়ে ছিল শ্রীযুত 'প্রায়' তখন ছিলেন গ্রামের একজন কেউ-কেটা ব্যক্তি। পরে জু-র সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং গ্রামটির প্রাক্তন কর্তা জাপ অধিকৃত এলাকায় পালিয়ে যায়। শ্রীযুত 'প্রায়' নিয়ুও বার কয়েক গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসেন। চল্লিশ সংখ্যক কুওমিঙ্‌টাং বাহিনী তখনও পাশের এক জিলা অধিকার করে বসেছিল। শ্রীযুত নিয়ু সেখানকার জনকয়েক সামরিক অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

মেঙ-এর শ্বশুরদের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর ঘনিষ্ঠ। কয়েক বছর আগে মেঙ-এর শ্বশুরকে কাগজের ব্যবসা চালাবার জন্য জমিটুকু বিক্রয় করতে হয়েছিল। শ্রীযুত নিয়ুর কাছ থেকে তিন বিঘা আধ কাঠা জমি তিনি বর্গা নেন। শ্রীযুত নিয়ুর স্ত্রীরও যৌবনে মেঙ-এর শাশুড়ীর মত বিস্তর পুরুষ বন্ধু ছিল। বিশিষ্ট 'বাবু'দের ওঁরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিতেন। এজন্য দু'জনের মধ্যে অনেক দিন থেকে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শ্রীযুত নিয়ু মেঙ-এর শ্বশুরদের জমিদার এবং প্রতি বছর উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৭০ ভাগ ওঁরা নিয়ে গেলেও নিয়ুদের তাঁরা নিজেদের বন্ধু বলে জাহির করতে ভুলতেন না। দুই গিন্নীর প্রীতি ও হৃদ্যতা ছাড়াও নিয়ুরা হলেন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি।

জু-র অধীনস্থ কুওমিঙ্‌টাং বাহিনী যখন ভেঙ্গে গেল, আঞ্চলিক জনসরকারই তখন সরকারীভাবে গ্রামটাকে শাসন করতে লাগল।

অবশিষ্ট সভ্য জগৎ থেকে গ্রামটা ছিল একান্ত বিচ্ছিন্ন। তাই শ্রীযুত নিয়ুর মুখের সংবাদগুলোতে চাষীরা সহজেই হোত অভিভূত। জাপানীরা গ্রাম আক্রমণ করতে আসবে উনি হয়ত জানিয়ে দিলেন। কিম্বা জানালেন, ৪০ নম্বর কুওমিঙ্‌টাং বাহিনী এসে পড়েছে এবার। যে গুজবই তিনি ছড়ান না কেন, কমিউনিষ্ট অষ্টম রুট বাহিনী যে 'কোন কাজের না' এটা যোগ করতে তিনি পিছু-পা হোতেন না।

মেঙ-এর শ্বশুর কিন্তু শেষের এ মন্তব্যে পুরো সমর্থন জানাতে পারতেন না। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের গোড়ায় তাঁর কাগজের ব্যবসা একেবারে ডুবতে বসেছিল। কিন্তু 'অষ্টম রুট বাহিনী' গ্রামে আসতে ব্যবসা তাঁর আবার উন্নতির মুখ দেখল। নয়া শাসনের দু'বছরের মধ্যে তিনি সরকারকে এত পরিমাণে কাগজ বিক্রয় করলেন যে, তিনি তাঁর পুরনো জমি পুনরায় কিনে নিতে সক্ষম হলেন। 'অষ্টম রুট বাহিনী' যে 'কোন কাজের না' তিনি তা পুরো মেনে নিতে কিছুতেই পারলেন না! তবে শ্রীযুত নিয়ু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। উনি কি আর বাজে কথা বলবেন?

শ্রীযুত নিয়ুর কথা মেঙ-এর শ্বশুর সবটা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তার শাশুড়ী কিন্তু নিয়ু গিন্নীর একান্ত অনুগতা শিষ্যা। কে তাদের কাগজ কিনল বা না কিনল, কিম্বা পুরানো জমি তাঁদের কি করে ফিরে এল তাতে পাও-পাওর খুব একটা যায় আসে না। নিয়ু গিন্নীই হলেন তাঁর প্রধান কাণ্ডারী।

নিয়ু গিন্নী যদি বলেন যে কুওমিঙ্‌টাং ৪০নং বাহিনী এবার আসছে, বৃদ্ধা অমনি ধরে নিলেন ওরা কাল না হোক পরশু দিন নির্ঘাৎ এসে পড়বে। নিয়ু গিন্নী যদি বলেন যে গ্রামের সব কয়টা প্রতিনিধিকে ওরা গুলী করে মারবার আয়োজন করছে; বৃদ্ধা অমনি সকলের বাড়ী ছুটলেন শবাচ্ছাদনের কাপড় যোগাড় করবার জন্য বলে আসতে আত্মীয় স্বজনদের।

অমনিতর পাও-পাও যে মেঙকে নারীসঙ্ঘের সভানেত্রী হতে দেবেন, কখনো কি ভাবতে পারেন আপনারা কেউ?

বৃদ্ধার একগুঁয়েমীতে রাষ্ট্রপ্রতিনিধি অবশেষে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। রেগে গিয়ে বলে উঠলেন:

'ওকে কাজটা করতে দেবেন না তো আপনাকেই করতে হবে।'

শাপে বর হোল। নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি তিনি ঠিক জায়গায় কোপ মেরে বসেছেন। এতক্ষণ ধরে শাশুড়ী আপত্তি জানাচ্ছিলেন, কারণ গ্রাম্য-প্রতিনিধিত্ব করা তাঁর মতে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। আজ হোক বা কাল

হোক, ৪০ নং বাহিনী একদিন ঠিক আসবে। এবং এদের সবাইকে ধরে গুলী করে মারবে, তাতে তাঁর খুব একটা যায় আসে না। তবে কি ওরা তাকে এই সঙ্গে না জড়িয়ে ছাড়বে? নিজেই তিনি নারীসঙ্ঘের সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করুন সরকারী প্রতিনিধি যখন প্রস্তাব করলেন, তিনি তখন হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বিচার করে দেখলেন, নিজে সরাসরি ও পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার চাইতে মেঙ-এর মারফৎ জড়ান বরং ভাল। বললেন, 'না-না, আমি কেন, মেঙই নিক কাজটা'।

সরকারী প্রতিনিধির জয় হোল। মেঙ নারীসঙ্ঘের সভানেত্রী নিযুক্ত হোল।

সভানেত্রীর কাজ করতে গিয়ে মেঙকে প্রায় নানা সভা-সমিতিতে যোগদান করতে হোত। কিন্তু শাশুড়ী এটা পছন্দ করতেন না। তবে বউকে তিনি বাধাও দিতেন না। বাধা দিতে গেলে ওরা যদি তাঁকেই আবার সভানেত্রী হতে বলে? অষ্টম রুট বাহিনী যতই হোক না কেন 'কোন কাজের না', তবু তাদের তিনি মিছামিছি খোঁচাতে সাহস করতেন না। কেন না তিনি জানতেন, যদি ৪০নং বাহিনী এসে না পড়ে এবং আজ যদি তিনি অষ্টম রুট বাহিনীর খোলাখুলি বিরুদ্ধতা করতে যান, সরকারী প্রতিনিধি তাঁকে ধরে ঠিক জিলা সরকারের নিকট বিচারের জন্য চালান দেবে। কোথাকার জল তখন কোথায় গিয়ে গড়াবে, কে জানে? তার চাইতে ছুঁড়িটা যেতে চায় যাক তার সভা-সমিতিতে।

মেয়েদের আবার সভা-সমিতিতে যাওয়া! যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড! বুড়ী শাশুড়ী ভাবেন মনে মনে। ওরা ওখানে গিয়ে কি সব আলাপ-আলোচনা করে, শুনতে তাঁর আগ্রহও কম হয় না। কিন্তু ওখানে গিয়ে তা শুনে আসতে তাঁর ভয়ও হয়। তিনি সেখানে যান আর এদিকে চল্লিশ নং বাহিনী আসুক আর অষ্টম রুটগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে অভিযুক্ত করুক আর কি! তবু কৌতূহল তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। মেয়েদের আলোচনা তিনি একদিন শুনতে গেলেন।

হায় হায়! একি সব শুনছি গো! মেয়েরা আবার স্বাধীন হতে চায়! শাশুড়ীদের মার-ধর করতে দেবে না, নিজের স্বামী একটু গালমন্দ করবে, তাতেও মানা! পায়ের বাঁধন ছিন্ন করতে চায় গো! চায় কাঠ চিরতে, জল তুলতে, জমি চষতে গো! শীতকালের অবসর সময়ে লেখাপড়া শিখতে ইস্কুল যেতে চাইছে গা!

এ যে বিদ্রোহ রীতিমত! ভাবলেন শাশুড়ী। স্বামী আর শাশুড়ীরা ধরে ঘরের বৌ-ঝিদের যদি না মারবে তবে মারবে কে? মারধরের রীতি ওরা আদৌ পছন্দ করছে না বুঝি? আর এ যে পা বাঁধার ব্যাপার—মেঙকে এজন্য কত মারধর গালমন্দই না করেছেন। তবুও যদি সে রাজী হোত। এখন সবটাই খুলে ফেলতে চাইছে বুঝি? বৌ-ঝিদের এসব কাণ্ড-কারখানা কি মেয়েদের মত হচ্ছে! ওদের শাসন করা যে আজকাল কঠিন হয়ে উঠেছে রীতিমত। তার উপর দু'পাতা লেখাপড়া শিখলে ওরা মাথায় চড়ে বসবে না? সংসার রসাতলে যেতে বসেছে গো—রসাতলে যেতে বসেছে!

বৃদ্ধা শাশুড়ী কি মনে করলেন তা নিয়ে মাথা ঘামালে মেঙ-এর চলে না। সে দেখলে সরকারী প্রতিনিধির সাহায্যে কাজ তার সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। অনেক সভায় গেল সে। শীতকালের স্কুলেও সে যেতে লাগল নিয়মিত। কোন বাড়ির বউকে তার স্বামী কি শাশুড়ী মারধর বা গাল-মন্দ করলে অমনি সে মেঙ-এর কাছে ছুটে আসতে লাগল নালিশ করতে। মেঙ-ও তা সরকারী প্রতিনিধির নিকট গিয়ে যথাসময়ে জানাত। তারপর বৈঠক ডাকা হোত। অপরাধীকে দশজনের সামনে তখন সমালোচনা করা হোত; ভবিষ্যতের জন্য ওকে করে দেওয়া হোত সাবধান।

আগের চাইতে পুরোদমে মেঙ কাজ করে চলল তাদের সঙ্ঘের। তার শাশুড়ী অগত্যা হাল ছেড়ে দিলে। তাকে কাঠ কাটতে বা জল আনতে দেখে ওরা ঠোঁট কুঁচকে নিজেদের অসম্মতি সূচক একরূপ শব্দ করত। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পেত না।

গাঁয়ের সব মেয়ে কিন্তু মেঙ-এর শাশুড়ীর মত নয়। বহু বউ-ঝি মেঙ-এর উদাহরণ করে তাদের পায়ের বাঁধন ছিন্ন করলে আর কাজ কর্ম করতে লাগল পুরুষদের মত।

গাঁয়ের সব ব্যাটাছেলেও মেঙ-এর স্বামী পুংগবটির মত নয়। অনেকেই বেশ প্রগতিশীল। ক্ষেত-খামারের বহু ছোট ছোট কাজ ওরা মেয়েদের করতে দিতে রাজী হোল। ফলে মাঠের ভারী ভারী কাজ-কর্মের দিকে পুরুষরা নজর দেবার সুযোগ পেলে।

এক কৃষক তো বলে উঠল: শ্রীযুত প্রায় নিখু যে বলেন, 'অষ্টম রুট বাহিনী কোন কাজের না। কিন্তু আমি তো দেখছি, ওদের কাজকর্মগুলি বেশ ভালো!'

মেঙ সম্বন্ধে অপরে যাই ভাবুক তার শাশুড়ী কিন্তু ভাবেন, মেঙ গোল্লায় যাচ্ছে দিন দিন। এজন্য একটু মারধর বা গালমন্দ করবারও উপায় নেই।

বুড়ীকে তাই গায়ের ঝাল গায়েই মেটাতে হয়। গায়ের জ্বালা নিয়ে তিনি একদিন পাড়ায় বেরুলেন। পথে দেখলেন নিয়ু গিন্নী চলেছেন তাঁর সামনে দিয়ে। নিয়ু গিন্নীর উপদেশমালা শুনবার জন্য তিনি দ্রুত পা চালালেন। ডেকে বললেন: 'অ দিদি, একটু দাঁড়াও না!'

কিন্তু নিয়ু গিন্নী বুঝি তাঁর ডাক শুনতেই পাননি। তিনি তাই একরূপ ছুটে গিয়ে তাঁর মূর্তিমতী ঠাকরুণটিকে ধরে ফেললেন। নিয়ু গিন্নী কিন্তু তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালেন না। সাংঘাতিক গোটা কয়েক কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন:

'ভবিষ্যতে আমাদের বাড়ীর সঙ্গে তোমাদের কারও দেখা-সাক্ষাৎ যত কম হয় ততই ভাল, ভাই! তুমি তো তোমার ছেলের বৌয়ের বাঁধন-ছাড়া পা নিয়ে খুব ফুটানি দেখিয়ে বেড়াও। কিন্তু চল্লিশ নম্বর বাহিনী যখন আবার আসবে, ওরা বলবে: ও হোল আট নম্বর বাহিনীর কারো বউ। ওরা তখন ওর সঙ্গে তোমাকে সুদ্ধ জড়াবে। তোমাদের সাত-পাঁচের মধ্যে আমরা বাপু থাকতে চাই না।'

তাই শুনে মেঙ-এর শাশুড়ী তো মূর্ছা যান আর কি? কোথায় মনের দুঃখ জানিয়ে একটু গায়ের জ্বালা মেটাবেন, তা না কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! বিপদের উপর বিপদ! রুদ্ধশ্বাসে তিনি বাড়ি ছুটে এলেন। তারপর ছেলেকে সব জানালেন। ভেবে-ভেবে ওরা কিন্তু কোন কূল-কিনারা করে উঠতে পারলে না। বসে বসে খালি ভাবা—থেকে থেকে খালি মাথা নাড়া আর ঠোঁট কুঁচকে শোক-ব্যঞ্জক খালি শব্দ করাই হোল সার।

রেন নামে এক গুপ্তচরের বিরুদ্ধে সভায় অভিযোগ জানাতে গাঁয়ের লোকেরা সব একদিন পাশের শহরে যাবে ঠিক করল। নিয়ুরা এসে সবাইকে নিষেধ করতে লাগল: 'খবরদার, চল্লিশ নম্বর বাহিনীর সঙ্গে রেনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। সভায় হল্লা করতে যাচ্ছো তো, কিন্তু নিজ নিজ মাথা দিতেও এবার প্রস্তুত থেকো।'

তাই শুনে মেঙ-এর স্বামী আর শ্বশুর-শাশুড়ীরা বাড়ি থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। এ বিষয়ে ওঁরা কেউ মেঙ-এর সঙ্গে কোন সরাসরি পরামর্শ করলেন না। তবে তাঁদের শুকনো মুখ দেখে আর রেনের বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ জানাতে যাচ্ছে তাদের মাথার উপর যে বিপদের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে—এমনি সব আশংকা বাণী শুনে শুনে মেঙও কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। যার কাছে গিয়ে সে কথাটা পাড়ে, সেও কিন্তু তাকে যেতে নিষেধ করে বসে।

মেঙ তাই একটু ইতস্ততঃ করলে। তারপর সরকারী প্রতিনিধির কাছে গিয়ে সরাসরি কথাটা পাড়লে ঃ 'আচ্ছা, আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?'

'আপনাকে যেতে অবশ্য কেউ বাধ্য করবে না', তিনি জবাব দিলেন। '—তবে গ্রামের প্রায় সবাই যাচ্ছে, আপনি একজন মহিলা সমিতির কর্মী হয়ে যদি না যান, কেমন দেখাবে বলুন তো ?'

নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেঙ যেতে রাজী হোল। তবে মনে মনে ঠিক করলে, সভায় গিয়ে সে চুপ করে থাকবে ! কিছু বলবে না।

শহরের উন্মুক্ত সভাস্থল লোকে লোকারণ্য। শহরের নামকরা নাটক অভিনয়েও কখনও অত লোক হয় না। একজনের পর একজন চাষী উঠে গায়ের ঝাল মিটিয়ে রেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল, রেন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। 'অত লোক যখন ভয় পাচ্ছে না, তারও বা ভয় কিসের ?' —ভাবলে মেঙ। সেও শীঘ্র গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অপরাধীর ন্যায্য বিচারের দাবী জানিয়ে চীৎকার শুরু করে দিল।

এরপর থেকে মেঙ আরও সাহসী হয়ে উঠল। শ্রীযুত 'প্রায়' নিয়ু কর্তৃক বহু প্রচারিত 'হিসেব নিকেশের দিনের' গুজবে সে আর কান দিলে না। সভায় মেঙ-এর কীর্তির কথা শুনে তার শাশুড়ীর তো হৃদকম্প উপস্থিত। ভয়েই তিনি অস্থির। এক বৌয়ের অপরাধে গোটা পরিবারের উপরই হয়ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে। পরিশেষে একদিন তিনি সর্বনাশী ছুঁড়িটার কবল থেকে রেহাই পাবার পথ একটা ঠাওরে নিলেন। ছেলেকে ডেকে বললেন ঃ

'এ বছর ফসল তো তেমন ভালো হয় নি। সবাই মিলে খে গেলে বছর কুলিয়ে উঠবে না। তাই বলছিলাম কি, বউকে নিয়ে তুই সিয়াং ইউয়ান শহরে দাদার বাড়ি থেকে দিন কয়েকের জন্য ঘুরে আয়।'

বাড়িতে সত্যিই খাবারের টানাটানি শুরু হয়েছিল। আর শাশুড়ীর কাছ থেকে অন্তত: দিন কয়েক দূরে থাকবার একটা সুযোগ মিলবে। মেঙ এ প্রস্তাবে খুশীই হোল। কিন্তু সমস্যা হোল, সে এখন যায় কি করে ? সমিতির কাজ-কর্ম নিয়ে তাকে এখন খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। গাঁয়ের মেয়েদের একটা পাঠশালা নিজে সে পরিচালনা করছে। সেদিন রাতে পাঠশালা থেকে সে বুঝি একটু আগেই বাড়ি ফিরেছিল। আড়ি পেতে শুনতে পেল, শাশুড়ী তার স্বামী মে-র সঙ্গে যাবার ব্যাপার নিয়ে কি যেন আলোচনা করছেন। পাও-পাও বলছেন ঃ

'সিয়াং ইউয়ানে ওকে কোন রকমে নিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে দিস

বিক্রী করে। বয়েস তোর এখনও বেশী না। ফের তোকে আমি বিয়ে দেবো।'

'অষ্টম রুট বাহিনীর ডর নেই তোমার? ও কি বলে দেবে না ভাবছো?' শুধাল বুঝি মে।

'ও বলে দেবে কি করে? ও শহর যে এখনো জাপানীদের দখলে।' পাও-পাও বুঝি খুশীতে ফেটে পড়লেন।

মেঙ-ও তাই শুনে তক্ষুণি সরকারী প্রতিনিধির কাছে ছুটে গেল। পরামর্শ চাইলে, এ ক্ষেত্রে তার করণীয় কী।

'এ ব্যাপার তুমি কিছুই জানো না তেমনি ভান করো।' তিনি মেঙকে উপায় বাতলে দিলেন। বললেন: 'বলবে, এখন তুমি যাবে কি করে? তোমার হাতে কত কাজ।'

শাশুড়ীর অমন চমৎকার ফন্দিটা অবশেষে মাঠেই মারা গেল। এর কিছু দিন পর কুওমিঙ্‌টাং চল্লিশতম বাহিনী ও নতুন পঞ্চম বাহিনী জাপানীদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ল। এবং কিছুদিন পর দেশদ্রোহীরা অষ্টম রুট বাহিনীর হাতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হোল। বিজয় লাভের এ খবর গাঁয়ে যাতে পৌছুতে না পারে শ্রীযুত নিয়ু চেষ্টা করলেন বিস্তর। কিন্তু পারলেন না। এমন কি যারা তাঁর 'হিসেব-নিকেশের দিনের কাহিনী' বিশ্বেস করতো তাদের কাছেও নিয়ু আর কল্কি পেলেন না। কেউ ওঁকে আর বিশ্বেস করতো না। সবাই জানল: ওঁদের আরাধ্য দেবতার পতন ঘটেছে।

নিয়ুর মুখ বন্ধ হোল। মেঙকে আজ-কাল সমিতির কাজ স্বাধীনভাবে করে যেতে কোন বাধা পেতে হয় না।

গত কয়েক বছর থেকে চাষ-বাসের সময়টা বড় অস্বাভাবিক যাচ্ছিল। বিশেষ করে এই গ্রীষ্মে। কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টির নাম নেই। ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বাজরার শীষগুলি মোমবাতির শলতের চাইতে আর বেশী বাড়ল না—আর শস্যের রোঁয়াগুলি লম্বায় মানুষের পায়ের গোড়ালির চাইতে বেশী বড় হোল না। আধ একর ক্ষেত ঘুরে বেড়ালেও ফসল-তোলার ঝুড়ি তোমার ভর্তি হবে না। তারপর বর্ষাকাল যখন শুরু হোল একমাস ধরে খুব জোর জল হোল। মাঠের আগাছাগুলি শস্যের মাথাকে উঠল ছাপিয়ে। ফলে ফসল বিশেষ কিছু মিলল না।

ক্ষেতে বুনো আগাছা তুলবার জন্য সরকার থেকে লোক নিয়োগ করা হোল। মেঙ তার গাঁয়ের মেয়েদের সংগঠিত করে আগাছা তোলার কাজে

লেগে গেল। পর পর কয়েক বছরের অজন্মায় বহু চাষী হতাশ হয়ে পড়েছিল। অনেকে বলে উঠল :

'আমাদের আর বাঁচতে হবে না। এখন আর রাজ্যের আগাছা বেছে কি হবে শুনি ?'

ওরা কিন্তু এসব বলে নিজেদের গায়ের ঝালটাই মিটাতে লাগল। যেই দেখল মেঙ আর তার মত আরো অনেক প্রগতিশীলা বধূর উঠান তোলা আগাছায় ভরে উঠল, ওরা তখন আপন বধূদেরও আগাছা তোলার কাজে মাঠে পাঠাতে সম্মত হোল। এ সময় শরৎকালের দমকা হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি সব ঝরতে সুরু করলে। মেঙ-রা জনা পঞ্চাশেক মেয়ে মিলে প্রায় আট টনের মত বুনো আগাছা সংগ্রহ করলে। গাঁয়ের আশে-পাশে এক প্রকার শুকনো খাগড়া প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। বাজারে ওসব খাগড়ার চাহিদা দারুণ। কথাটা শুনেছিল মেঙ। খাগড়া কুড়নোর ব্যাপারে সহায়তা করতে এবার অপর মেয়েদের আর সাধাসাধি করতে হোল না। দেখতে দেখতে তাদের উঠান সব শাক-সবজিতে ভরে উঠল। ওরা উঠানের দিকে তাকায় আর মেঙ-এর কথা মনে করে সস্নেহে। পুরুষদের আগ্রহও দেখে কে ? গিন্নীদের ওরা খাগড়া সংগ্রহের কাজে এগিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। বলাবলি করতে লাগল :

'না, বৌটার ঘাড়ে বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে বটে !'

মেয়েরা সবাই মিলে ১০ হাজার টন খাগড়া সংগ্রহ করলে। আর স্থানীয় ২০ হাজার মুদ্রায় তা বিক্রী হয়ে গেল। অপর অপর গাঁয়েও ছড়িয়ে পড়ল মেঙ-এর নাম। সবাই পঞ্চমুখ হয়ে উঠল তার কর্মনিপুণতায়।

আপনারা হয়ত ভাবছেন, আকাল থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে সাহায্য করেছে বলে মেঙ-এর শাশুড়ী তাকে এবার একটু সুনজরে দেখবেন। কিন্তু তা না। বন-বাদাড় থেকে মেঙ যেসব শাক-সবজি তুলে আনে তা খেতে শাশুড়ীর কোন আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু বৌয়ের বাইরে যাওয়া নিয়ে। তিনি তাই কানাকানি করতে লাগলেন, মেঙ্ একদল ছোঁড়াকে 'টাটকা হাওয়া খাইয়ে' রীতিমত নষ্ট করছে। ঐ কথাটা চালু হয়েছে জন কয়েক অত্যাচারী খনি মালিকের ব্যবহার থেকে। ওরা করত কি, নিজেদের খনিতে মজুর খাটাবার জন্য শ্রমিকদের কিনে আনত ক্রীতদাস হিসেবে। এ সব শ্রমিক সপ্তাহে একদিন ঘণ্টা খানেকের জন্য খালি অনুমতি পেত খনি থেকে বেরুতে। অনুমতি পেত মুখ দেখতে সূর্যের। সেই থেকে 'টাটকা হাওয়া খাওয়া' কথাটা চালু হয়েছে।

মেঙ 'টাটকা হাওয়া' খায় খাক শাশুড়ীর তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। ক্ষেতের আগাছা বাছা কিংবা ফসল তোলার কাজে সহায়তা করাকেও তিনি কিছু মনে করেন না। তবে কিনা ঘরের বৌ-ঝিরা কবে কোথায় যাবে আর যাবে না, তা কিন্তু পুরোপুরি নির্ভর করবে শাশুড়ীর অনুমতির উপর। 'সেকেলে প্রথা' মতে কোন বধূকে যদি কোথাও যেতে দেওয়া হয় তা হোলে বেশ কয়েকবার শাশুড়ীর মুখঝামটা হজম করতে হবে তাকে। আর তার যদি ফিরতে একটু দেরী হোল, তবে মুখঝামটা, গালমন্দ, মারধোর করার অধিকার রইল শাশুড়ীর।

শাশুড়ীর অনুমতির নাম নেই বরং খুশী মাফিক স্বাধীনভাবে চলা-ফেরাই করে থাকে মেঙ। অপর বধূদেরও মন্ত্রণা দেয় তার মত চলাফেরা করতে। মেঙ-এর পাও-পাও তাই দেখেন আর ভাবেন: কালে কালে কি উচ্ছন্নেই না যাচ্ছে দেশটা!

শুধু একা নন মেঙ-এর পাও-পাও। আরও বহু পাও-পাও-ও এ কথাই ভাবতে লাগল আর উঠে-পড়ে লাগল সর্বনেশে ভাবধারা সব বন্ধ করতে। এদিকে শ্রীমতী 'প্রায়' গিন্নী রটিয়ে বেড়াতে লাগলেন যে বুনো গাছ-গাছড়ার মধ্যে কোনরূপ পুষ্টিকর খাদ্যপদার্থই নেই। তাই শুনে কোন কোন বাড়ির বুড়ী শাশুড়ী আপন বধূদের সবজি সংগ্রহ করতে মাঠে যেতে আর দিলে না। মেঙ তখন মেয়েদের বিশেষ সভা ডাকলে। অনুরোধ করলে, গুজবে কান দেওয়ার আগে অভিযোগগুলি একবার পরখ করে দেখতে।

মেঙ যখন শাক সবজি আর খাগড়া সংগ্রহের ফলাফলের কথা ভাবছিল, তার শাশুড়ী তখন বধূর গুণপনার হিসেব নিচ্ছিলেন। আর তাতে দেখলেন: বধূ হিসেবে মেঙ একেবারে অপদার্থ।

লক্ষ্মীবৌ বলতে বৃদ্ধার ধারণা ছিল অনেকটা এইরূপ: বধূ চুল আঁচড়াবে, ঝাড়ুর হাতলের মত চুলের ঝুঁটি বাঁধবে, পা বলতে হবে তার ত্রিভুজাকার ছোট ছোট দুই তাল থ্যাবড়ান মাংস পিণ্ড, সে চায়ের জল ফুটাবে, ভাত রান্না করবে, গম ভাঙাবে, রান্না পরিবেশন করবে, গরম জল ঢালবে, মেঝে ঝাড়ু দেবে, ঝাড়া-মুছা করবে ঘরের আসবাবপত্র সব, ভোর রাত্রি থেকে দুপুর রাত্রে বিছানায় বিশ্রাম না নেওয়া পর্যন্ত এক মুহূর্ত অবসর কাকে বলে জানবে না সে। অপরিচিত কেউ এলে অমনি কপাটের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে। শাশুড়ী না বললে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাইরের কেউ, এমন কি, কাক পক্ষীটি পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে জানতে পারবে না এ জীবনে।

লক্ষ্মী বধূর যতগুলি গুণ থাকা উচিত, বৃদ্ধা শাশুড়ীর যৌবনে ততগুলি গুণ যদিও ছিল না, তবু মেঙ-এর কাছ থেকে তিনি কিন্তু তার ষোল আনাই দাবী করলেন। তা ছাড়া পদে পদে তিনি মেয়েটার খুঁৎ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। চুলটা নাকি তার ঢেউ খেলান; তা নিয়ে আবার নাকি পেছনে খোঁপা বাঁধতে চায়; পা দুখানাও কেমন যেন বেয়াড়াভাবে বেড়ে উঠেছে দিন দিন। সারা দেশময় তাই নিয়ে আবার ঘুরে বেড়াচ্ছে ফুর ফুর করে। গাঁয়ের আশে-পাশে ঘুরে এসেও তৃপ্তি নেই। দশ 'লি' পর্যন্ত যাওয়া চাই। শাশুড়ীর সঙ্গে যদি কোন ব্যাপারে একটু সলা-পরামর্শ করত! সব ব্যাপারেই পরামর্শ করতে অমনি ছোটে সরকারী প্রতিনিধিদের কাছে। গালাগালি করা যাবে না; শাসনেও বশে আসে না; বিক্রীও করা যায় না—মহা মুস্কিল! বহু রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়ে বৃদ্ধা মহিলা অবশেষে এক বুদ্ধি ঠাওরালেন। ঠিক করলেন, ওদের পৃথক করে দিয়ে পরিবারের সব সম্পত্তি সমান দু'ভাগে বিভক্ত করবেন।

নিয়ু গিন্নীকে সাক্ষী রেখে মেঙ পৃথক হতে এই সর্তে রাজী হলো যে স্বামী-স্ত্রী ওরা দু'জনকে ৪ 'মৃ' সমতল জমি এবং ৪ 'মৃ' ঢালু জমি দিতে হবে। খাদ্য আর মজুত শস্য অংশ ভাগ করা হোল না। কেন না, বৃদ্ধা শাশুড়ী জানালেন, ফসল এবার ভাল ওঠে নি। আর সঞ্চিত শস্য সবই খাওয়া হয়ে গেছে।

*　　*　　*　　*　　*

বাড়ি ফিরে মেঙ কিন্তু জানতে পারলে, সে প্রতারিতই হয়েছে! কেন না, যে জমিটা সে ভাগে পেয়েছে তা লিখে দেওয়া হয়েছে তার স্বামীর নামে। তাই নাকি 'সেকেলে প্রথা'। দু'দিন যেতে না যেতে স্বামী তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করলে আর ফিরে এল লক্ষ্মী ছেলের মত আপন মায়ের নিকট।

বছরের শেষের দিকে মেঙ-এর খাদ্যাভাব দেখা দিল। সমবায় সমিতি থেকে তাকে তখন ধার নিতে হোল। জেলা মহিলা সমিতিও তার দুরবস্থার কথা জানতে পেরে সাহায্য করবে স্থির করলে। প্রথমে ওরা মেঙ-এর শাশুড়ীর নির্মম ব্যবহারের খুব নিন্দা করলে। তারপর ভাবলে, মেঙ-এর মত একজন ভালো কর্মীকে তার নিজ কাজ করে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করাই উচিত। ওরা তাই মেঙকে জেলা মহিলা সমিতির স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত করলে আর মাঝে মাঝে খাবারও পাঠাতো। সমিতির একজন ভাল কর্মী হিসেবে মেঙ বারবার নিজের পারদর্শিতা প্রমাণিত করতে লাগল। এ জানুয়ারীতে (১৯৪৪)

সে 'চাষী-বীরাঙ্গনা'রূপে নির্বাচিত হোল। অপর গ্রামে গিয়েও সে মহিলা-নেত্রীদের শেখাতে লাগল তার নিজ পদ্ধতির কথা। উপদেশ দিলে: বুদ্ধি খাটিয়ে আপন আপন সমস্যাগুলির সমাধান করতে। বললে: নিজেদেরই প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। কাজ করে যান; দেখবেন আপনাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে অপরেও।

বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলিও মেঙ-এর পদ্ধতিমত কাজ করে চলল। ফলে সারা জেলায় শস্য-উৎপাদন বিপুলভাবে বেড়ে গেল। কি পরিমাণ বাড়ল তা আমাকে আর লিপিবদ্ধ করে যেতে হবে না। আপনারাই সংবাদপত্রে তা পাঠ করেছেন।

শাশুড়ী আর তার স্বামী অমন খাপ্পা কেন মেঙ-এর উপর, আমায় প্রশ্ন করছেন? পা দুখানি ওর একটু বড়ো বলে ওরা কি ভয় পায়? চলবার সময় সে তাদের এগিয়ে যাবে বলে কি? কিংবা বেশী সে কাজ করে বলে? অথবা এ জন্যেই কি যে ক্ষেতের আগাছাগুলো তুলে জমিটাকে দিলে সাবাড় করে?

না! অমন কথা কেউ তাদের বলতে শুনে নি।

কেউ কেউ বলছিল: আমি নাকি মেঙ-এর স্বামী আর তার পাও-পাওকে এবং শ্রীযুত ও শ্রীমতী নিয়ুকে অনেকটা খাটো করে চিত্রিত করেছি। ওঁরা এও জানতে চেয়েছেন, এঁদের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটবে না, আমি কি তাই বোঝাতে চেয়েছি?

আমি তাঁদের বলি: মেঙ তো চাষী বীরাঙ্গনা। বয়স মাত্র তার তেইশ বছর। দূর ভবিষ্যৎ এখনো পড়ে আছে তার সামনে। বহু ঘটনা ঘটবে; বহু লোক আসবে তার চলার পথে। অপেক্ষা করা যাক; দেখা যাক, কালের যাত্রার সঙ্গে পা ফেলে কারা চলতে পারে সমান তালে—আর কারা পড়ে পিছিয়ে।

অনুবাদ: নিখিল সেন

জাপান

'আর বেশী না। শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই-একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক বসে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল—এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়ে স' দাঁড়ায়। তাকে যে অতি অল্পের মধ্যে সরে যেতে হয় তার কারণ এই যে জাপানী পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।…' ('জাপান যাত্রী')

জাপানী কাব্যের মূল সুরটি সুন্দরভাবে এখানে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু বাক্‌সংযম নয়, জাপানী কাব্যে ভাবের সংযমও রয়েছে। এখানেই জাপানী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। 'হৃদয়ের মিতব্যয়িতা'।

কেবল ক্লাসিকের যুগ নয়, আধুনিক যুগেও। হিরোসিমা আর নাগাসাকির চিতাভস্ম থেকে যে হাস্নোহানার পুষ্পকোড়ক গজিয়ে উঠেছিল আধুনিক জাপানী সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে যুদ্ধোত্তর বা সমকালীন যুগ বলা হয়। আর এই যুগের লেখক গোষ্ঠীর অগ্রণী হলেন উজাকু-আকিতা, কিয়োসি ইগুচি, উরিকো নিয়ামোটো, ওগাওয়া মেসেই, নাওগা শাইগা, আকুতাগাওয়া রাইউনোসুকে, ওসামু দাজাই, উকিয়ো মিসিমা, সকুনোসুকি ওদা, সুয়াও নাকামুরা, ইয়াসুনারী কাওআবাতা প্রমুখ অনেকেই। এঁদের প্রায় সকলেই বিশিষ্ট কথাশিল্পী। ছোটগল্প রচনাতেও সিদ্ধহস্ত।

মাকড়সার সুতো

আকুতাগাওয়া রাইউনোসুকে

একদিন বুদ্ধ নন্দনকাননের পদ্ম সরোবরের ধারে বেড়াচ্ছিলেন একা। সরোবরের পদ্মগুলি ফুটে আছে যেন শাদা মুক্তো। তাদের সোনালী গর্ভকেশর আর পরাগ থেকে উৎসারিত আশ্চর্য সুগন্ধ সমস্ত বাতাস পরিপূর্ণ করে রাখছিল অবিরল। স্বর্গে তখন সকাল।

বুদ্ধ সরোবরের কিনারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালেন। পদ্মপাতাগুলির ফাঁক দিয়ে অকস্মাৎ নিচেকার দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর। নন্দনকাননের পদ্মসরোবরের একেবারে তলাতেই ছিল নরক। সেই কাকচক্ষু জলের ভিতর দিয়ে সবই দেখা যাচ্ছিল—অনন্ত অন্ধকার অভিমুখে প্রবাহিত ত্রিপথের নদী এবং সেই অন্ধকার ভেদ করে ওঠা সুতীক্ষ্ণ সূচী পর্বতের চূড়ো। তারপর বুদ্ধের দৃষ্টি পড়ল কণদত্ত নামে একটি লোকের প্রতি। নরকের অতলে সে অন্যান্য পাপীদের সঙ্গে কিলবিল করছিল। কণদত্ত ছিল এক ভয়ানক দস্যু। অনেক পাপকাজ সে করেছিল—নরহত্যা, লোকের বাড়িতে আগুন লাগানো। তবে একবার একটা ভাল কাজ করেছিল সে। একবার গভীর এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় সে দেখল রাস্তার মাঝে একটা ছোট্ট মাকড়সা যাচ্ছে গুটি গুটি। সে ওটাকে মাড়াবার জন্য পা তুলল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবল: না না, এটা খুবই একটা ছোট্ট প্রাণী। এটা মারা খুব লজ্জার কাজ হবে। সে মাকড়সাটাকে বাঁচিয়ে দিল।

নরকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুদ্ধের মনে পড়ে গেল কীভাবে কণদত্ত মাকড়সার জীবন রক্ষা করেছিল। তিনি ভাবলেন সেই পুণ্যকর্মের বদলে তিনি সম্ভব হলে তাকে নরক থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করবেন। সৌভাগ্যক্রমে চারদিক তাকিয়ে তাঁর নজরে পড়ল স্বর্গের একটি মাকড়সা সুন্দর রূপোলী সুতোয় জাল তৈরি করছে পদ্মপাতার ওপর।

বুদ্ধ নীরবে সেই মাকড়সার তৈরি সুতো হাতে তুলে নিলেন। তারপর সেটিকে মুক্তোর মতো শাদা পদ্মদলের মাঝখানে যে ফোকড়টি ছিল তার ভিতর

দিয়ে নামিয়ে দিলেন একেবারে নরকের নিচে। এখানেই কণদত্ত অন্যান্য পাপীদের সঙ্গে নরকের বুকে রক্তের নদীতে ডুবছিল আর ভাসছিল।

সর্বত্র নিকষ কালো অন্ধকার। হঠাৎ কখনো যদি দেখা যেত যে সেই অন্ধকার ফুঁড়ে কিছু একটা বেরোচ্ছে সেটা হল সূচী পর্বতের চূড়োর ভয়ংকর ঝিলিক। সমাধির স্তব্ধতা সবখানে বিরাজিত। একমাত্র শব্দ শোনা যায় পাপীদের। ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস। এর কারণ নরকের নানারকম অত্যাচার সহ্য করার পর পাপীরা এই জায়গায় এসেছে। জোরে চেঁচাবার ক্ষমতাও তাদের আর নেই। তাই জবরদস্ত দস্যু হলেও কণদত্ত রক্তের নদীতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মুমূর্ষু ব্যাঙের মতো বাঁচবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারছিল না।

কিন্তু তারও সুযোগ এল। ঐদিন কণদত্ত রক্তের নদী থেকে মাথা তুলে যখন ওপরের দিকে তাকাল তখন সে দেখতে পেল মাকড়সার তৈরি একটি রূপোলী রঙের সুতো স্বর্গ থেকে ঝিলমিল করতে করতে সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে নেমে আসছে। এটি দেখে সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। ভাবল, এই সুতো ধরে বেয়ে সে যদি ওপরে যতদূর গেছে ততটা উঠতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই নরক থেকে সে পালাতে পারবে। এমনকি ভাগ্য ভাল হলে সে স্বর্গেও পৌঁছে যেতে পারে। তাহলে তাকে আর সূচী পর্বতে ঘষটানো হবে না কিংবা রক্তের নদীতে চোবানো হবে না।

একথা চিন্তা করতে না করতেই সে দুহাতে খুব শক্ত করে সুতোটা ধরে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে উপরে বেয়ে উঠতে লাগল। সে ডাকাত ছিল বলে এসব বিষয়ে খুবই পাকাপোক্ত ছিল তার অভিজ্ঞতা।

কিন্তু কেউ জানে না কত লক্ষ যোজনের ব্যবধান স্বর্গ থেকে নরক। তাই যত চেষ্টাই করুক না কেন সে সহজে বের হতে পারল না। কিছুটা বেয়ে ওঠার পর সে অবসন্ন হয়ে পড়ল। আর এক ইঞ্চিও ওপরে উঠতে পরল না।

আর কিছু করতে না পেরে সে বিশ্রাম নেবার জন্য থামল। সেই সুতোতে ঝুলে থেকে সে যত দূর চোখ যায় তাকাল নিচের দিকে। যথাসাধ্য শক্তিতে বেয়ে ওঠার জন্যই সে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল যে সেই রক্তের নদী যার ভিতর থেকে সে সবেমাত্র উঠে এসেছে সেটা অনেক নিচে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। সেই ভয়ংকর সূচী পর্বতের অস্পষ্ট ঝিলিক মাত্র দেখা যাচ্ছিল নিচে। এভাবে যদি ওপরে উঠতে পারে তাহলে সহজেই সে নরক থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে বলে ভাবল।

মাকড়সার সুতোটাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কণদত্ত হেসে উঠল। এবং

আনন্দের স্বরে সে বলে উঠল : পেয়েছি পেয়েছি! এমন আনন্দের উচ্চারণ এখানে আসার পর আর কখনো সে করেনি।

হঠাৎ সে দেখতে পেল যে নিচে সেই সুতো বেয়ে ওপরে উঠে আসছে আরও অসংখ্য পাপী, যেন পিঁপড়ের সারি। এ দেখে কণ্দত্ত মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা নাড়ল। বিস্ময়ে এবং ভয়ে বোকার মতো তাঁর মুখের হাঁ ঝুলতে লাগল। এই সামান্য সরু সুতো যা তার একার ভারেই ছিঁড়ে যাবার জোগাড়, কী করে এতগুলি মানুষের ভার সহ্য করবে?

যদি মাঝপথে শূন্যে এটা ছিঁড়ে যায় তাহলে এত চেষ্টার পর সে যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে ঝপাং করে আবার সেই নরকে গিয়ে পড়বে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পাপী ইতিমধ্যে তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে কিলবিল করে সেই অন্ধকার রক্তের নদী থেকে উঠে আসছিল সরু ঝিলিক দেওয়া সুতোটা বেয়ে বেয়ে। সে যদি এখনই তাড়াতাড়ি একটা কিছু না করে তাহলে সুতোটা দু'টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ে যাবে। তাই কণ্দত্ত চেঁচিয়ে উঠল : 'এই নরকের কীট পাপীরা, এই মাকড়সার সুতোটা আমার। কে তোদের অনুমতি দিল ওপরে আসবার? নেমে যা, নেমে যা।'

যেই না বলা, তক্ষুণি মাকড়সার সুতোটা, যার এতক্ষণ পর্যন্ত ছিঁড়বার কোনো লক্ষণই ছিল না, দু'টুকরো হয়ে গেল যেখানটায় কণ্দত্ত ঝুলছিল। চীৎকার করার সময়ও সে পেল না। সেই অতল অন্ধকারে লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে সে খাড়া নিচে পড়ে গেল।

সেই স্বর্গের মাকড়সার সুতোটার সরু ছোট টুকরোটা শুধু চন্দ্রহীন নক্ষত্রহীন আকাশে তখনও ঝিলিক দিচ্ছিল।

নন্দনকাননের পদ্ম সরোবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ সব ঘটনাই খুব কাছে থেকে দেখলেন। তিনি দেখলেন কণ্দত্ত একটা পাথরের টুকরোর মতো ডুবে গেল রক্ত নদীর একেবারে তলায়। এ দেখে বিষণ্ন মনে তিনি আবার হাঁটতে সুরু করলেন। কণ্দত্তের নিষ্ঠুর হৃদয় শুধু নিজেকেই বাঁচাতে চেয়েছিল। তাই আবার তার নরকে পতন। এ সবই বুদ্ধের চোখে খুবই বেদনাদায়ক প্রতিভাত হল। কিন্তু নন্দনকাননের পদ্মসরোবরের পদ্মগুলি এ সব কিছুর দিকেই দৃষ্টি দিল না।

মুক্তোর মতো শাদা ফুলগুলি বুদ্ধের পায়ের কাছে দুলতে লাগল। তাদের দোলার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী গর্ভকেশর থেকে উৎসারিত অনুপম সুগন্ধে ভরে গেল বাতাস।

স্বর্গে তখন বেলা প্রায় দুপুর।

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

তিল

ইয়াসুনারী কাওআবাতা

কাল রাতে আবার সেই তিলটির স্বপ্ন দেখলাম।

হ্যাঁ তিল। শুধু কথাটা লিখলেই বুঝতে পারবে। মনে আছে তো, কত বকুনিই না তোমার কাছে খেয়েছি ওটার জন্যে।

ওটা আছে আমার বাঁ কাঁধে কিংবা বোধ হয় বলা উচিত পিঠের উপরেই—একটু উঁচুতে।

'বেশ তো একটা শিমের বিচির মতো বড় হয়ে উঠেছে; ওটার পিছনে আরো লাগো, তারপর আরও ভালো করে শিকড় গজাতে শুরু করুক।'

তুমি এইসব বলে আমাকে বকতে। তুমি বলতে, তিল হিসাবে এটা একটু বেশি বড়; কিন্তু চমৎকার গোল আর একটু উঁচু।

যখন আমি ছোট ছিলাম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই তিলটা নিয়ে কত খেলা করেছি। মনে আছে, তুমি যেদিন ওটাকে প্রথম দেখলে, কি লজ্জাই না পেয়েছিলাম।

এমনকি আমি তো কেঁদেই ফেলেছিলাম, মনে আছে, তুমি কি রকম অবাক হয়ে গিয়েছিলে।

'কি হচ্ছে সায়োকো, থামো দিকি। যত ওটাতে হাত দেবে, তত বড় হয়ে যাবে।'

আমার মাও আমাকে বকতেন। আমি তখন একেবারে ছোট। তারপর থেকে অভ্যাসটা আমায় পেয়ে বসল একান্তভাবে। মার বকুনিটা ভুলে গেলাম, কিন্তু অভ্যাসটা থেকে গেল।

তুমি যখন ওটা প্রথম দেখলে, তখন তোমার স্ত্রী হয়েও আমি যেন শিশু হয়ে গেলাম। তুমি পুরুষ মানুষ; আমার কী যে লজ্জা করেছিল, তা হয়তো তুমি বুঝতে পারবে না। না, লজ্জার চেয়ে ভয়ই বেশি। তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যেন একটা মারাত্মক ব্যাপার বলে মনে হল।

মনে হ'ল, বুঝি আমার গোপন কিংবা নিজস্ব বলতে কিছুই রইল না—রইল না আর সামান্যতম আশ্রয়।

তুমি তো দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লে, মাঝে মাঝে একটু নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছিল; কিন্তু সেই হাতটা তিলটার দিকে অতর্কিতে এগোচ্ছিল, আমি যেন চমকে উঠেছিলাম।

'আচ্ছা, আমি আর আমার তিলটাতে হাত দিতেও পারব না?' ভাবলাম আমার মাকে লিখব। কিন্তু সে কথা মনে হওয়া মাত্র নিজেই অনুভব করতে পারছিলাম, আমার মুখখানা যেন লাল হয়ে তেতে উঠেছে।

'একটা তিলের জন্যে এত মাথা ঘামাবার কি আছে?'—তুমি একদিন বলেছিলে। শুনে আমি খুশিই হয়েছিলাম, এমন কি মাথাও নেড়েছিলাম। কিন্তু আজ মনে হয় নিজের এই অভ্যাসটার ওপর আমার আর একটু দরদ থাকলে ভালো হত।

তিলটার জন্যেও বেশি চিন্তা আমার ছিল না। মেয়ে মানুষের গলার নিচে তিল আছে কি না, তা তো আর কেউ উঁকি মেরে দেখতে যায় না। কখনো কখনো মনে হত সেই চলতি কথায় যাকে বলে 'বদ্ধ ঘরের মতো, অসূর্যম্পশ্যা' মেয়েদের সম্পর্কে ব্যবহার হয় যেকথাটা—সেই যে যাদের শরীরে কোন ত্রুটি আছে তাদের সম্পর্কে। অবশ্য একটা তিলকে কিছু বিকলাঙ্গ বলা চলে না নিশ্চয়।

'আচ্ছা বলতো, তিলটা নিয়ে খেলা করার অভ্যাস আমার কি করে হল?'

আর তুমিই বা এর জন্যে এত রাগ করলে কেন?

'থাম দিকিনি,' তুমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে। কত যে তুমি আমাকে বকেছ এ নিয়ে তার হিসেব নেই।

'আচ্ছা তুমি বাঁ হাতটা ব্যবহার কর কেন?'—একদিন বিরক্ত হয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করলে।

'কেন আমার বাঁ হাতে কি?'

তোমার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছিলাম।

সত্যি, এর আগে লক্ষ্যই করিনি যে বাঁ হাতটাই ব্যবহার করি বটে।

'সত্যি,' আমি আমার ডান হাতটা তুললাম। 'আশ্চর্য।'

'আশ্চর্য কেন?'

'কিন্তু আমার পক্ষে বাঁ হাত দেওয়াটাই যেন স্বাভাবিক মনে হয়।'

'ডান হাতটাই কাছে।'

'পিছন দিকে যে।'

'কিন্তু গলার সামনে দিয়ে হাতটা পিছনে এনে, তারপর ঘাড়ের পিছনে পৌছুতে হয় তো!'

তুমি যা কিছু বলছিলে, তার সঙ্গে আমি যেন সহজে একমত হতে পারছিলাম না। কিন্তু তবু যখন তোমার কথার উত্তর দিচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল যে এই বাঁ হাতখানা এই জায়গায় আনতে গিয়ে আমি যেন নিজেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিলাম। এ যেন নিজেকেই নিজে নিজে আলিঙ্গনের চেষ্টা। মনে মনে ভাবলাম, 'আমি ওর উপর নিষ্ঠুর হচ্ছি।'

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাঁ হাতটা ব্যবহার করতে ক্ষতি কি?'

'ডান হাতই হোক আর বাঁ হাতই হোক, অভ্যাসটা খারাপ।'

'জানি।'

'কতবার তোমাকে বলেছি, চল কোনো ডাক্তারের কাছে; ওটাকে কাটিয়ে ফেললেই হয়।'

'আমি পারব না। আমার লজ্জা করে।'

'এর আর কি?'

'একটা তিলের জন্য আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া!'

'বহু লোকই যায়।'

'মুখের মধ্যিখানে হলে না হয় হত। কিন্তু গলার মধ্যে একটা তিল, তার জন্যে আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া। ডাক্তারও হাসবে। ভাববে আমার স্বামীর পছন্দ নয় তাই।'

'তুমি ডাক্তারকে বল্লো যে তোমার একটা অভ্যাস, ওটাকে নিয়ে খেলা করা; সেই জন্যেই।'

'আচ্ছা, তিলের মতো সামান্য জিনিস—তাও আবার এমন জায়গায় যে দেখাই যায় না—এর জন্যে এত ব্যাপার কেন?'

'আমি তিলটা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না, যদি না তুমি ওটার পিছনে সব সময় পড়ে থাকতে।'

'কিন্তু আমি তা করতে চাই না।'

'কিন্তু তুমি যা একগুঁয়ে। আমি চিরকাল বললেও তোমার তো কোনো চেষ্টা নেই বদলাবার।'

'আমি চেষ্টা করি। এমন কি রাতে গলাবন্ধ জামা পরেও দেখেছি যাতে হাতটা ওখানে না পৌঁছুতে পারে।'

'কিন্তু বেশি দিন নিশ্চয় তা করনি।'

'হাত দিলে ক্ষতিটা কি?'—এবার আমিও যেন আবার পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা করলাম।

'এমন বিশেষ কোন ক্ষতি আছে কিনা জানি না। তোমাকে এ অভ্যাসটা ছাড়তে বলছি কারণ, আমি এ পছন্দ করি না।'

'কিন্তু তোমার এত অপছন্দ কেন?'

'তা নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই। ওটাকে নিয়ে খেলা করার অভ্যাসটা তুমি ছেড়ে দেবে।'

'আমি কি কখনো তা করবো না বলেছি?'

'যেই তুমি ওটাতে হাত দাও, তোমার মুখের চেহারাতেও কেমন যেন অদ্ভুত অন্যমনস্ক ভাব এসে যায়।'

বোধ হয় তুমি ঠিকই বলেছিলে। তোমার এই কথাটা যেন সোজা আমার বুকের মধ্যে এসে বিঁধে গেল। আমার মাথা যেন সম্মতিতে নুয়ে এলো।

'এর পর আমাকে হাত দিতে দেখলে, আমার হাতে চড় লাগিয়ো। হাতে কেন গালেই মেরো।'

'আচ্ছা, তোমার এজন্যে দুঃখ হয় না? এত সামান্য একটা বদ অভ্যাস তুমি নিজের চেষ্টায় ছাড়তে পারছ না?'

আমি উত্তর দিলাম না। তুমি যে কথাটা এইমাত্র বললে আমি তারই কথা ভাবছিলাম।

ওই ভঙ্গিটা, বাঁ হাতটা গলার উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে, তিলটায় হাত দেওয়া, নিশ্চয় এমন কুৎসিত দেখায়। আর এমন যেন সঙ্গীহীন একা। একাকীত্ব—এমন সুন্দর কথাটা এখানে ব্যবহার করতে আমার সংকোচ লাগছে। একজন মেয়ে মানুষের পক্ষে নিজের ছোট্ট সত্তাটুকু নিয়ে স্বার্থপরের মতো থাকা—না, এর ক্ষমা নেই। তাছাড়া তুমি ঠিকই বলেছ: 'অদ্ভুত অন্যমনস্ক'।

হয়তো এইটাই একটা প্রমাণ যে আমাদের দুজনের মধ্যে কিছুটা ফাঁক থেকে গেছে। আমি নিজেকে উজাড় করে দিতে পারি নি। হয়তো আমার নিজের অন্তরতম মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন তিলটাতে হাত দিই। ওটাতে হাত দিলে ছোট বেলাকার মতো আমি যেন আমার নিজস্ব স্বপ্নলোকে চলে যাই।

'কিন্তু নিশ্চয় তুমি আমার উপর আগে থেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলে, তা না হলে সামান্য একটা অভ্যাসের জন্য এত কথা উঠত না। যদি তুমি খুশি থাকতে, তাহলে হয়তো এটাকে হেসে উড়িয়েই দিতে।'

সেই ভাবনাটাই আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। আমি এই ভেবে অস্বস্তি

বোধ করেছিলাম যে এমন লোকও তো থাকতে পারে যার কাছে এই অভ্যাসটা মনে হবে অতি মনোরম।

আমার সন্দেহ নেই যে আমার ওপর তোমার ভালবাসা ছিল বলেই তুমি প্রথম ওটা লক্ষ্য করেছিলে। কিন্তু এমনি ছোট ছোট বিরক্তিই হয়তো বিবাহ বন্ধনের মাঝখানে তাদের শিকড় ঢুকিয়ে দেয়। সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতিতে কিছুই হয়তো যায় আসে না। হয়তো আবার এমন বহু দম্পতি আছে, যাদের মধ্যে সব জায়গায় গরমিল। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে, যারা সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলে, তারাই পরস্পরকে ভালবাসে; আর যাদের মধ্যে বিরোধ, তারা পরস্পরকে ঘৃণা করে তাও নয়। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, তুমি যদি আমার ঐ ত্রুটি লক্ষ্য করতে, তা হলেই বোধ করি ভালো হত।

কিন্তু তুমি রেগে আমাকে মারতে এলে।

আমি কেঁদে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন আমাকে এতটা সহ্য করতে হল? সামান্য একটা তিলেতে হাত দিয়েছি বলে? কি করে এ রোগ সারবে?'

তুমি যেন রাগে কাঁপতে লাগলে। আমি বুঝতে পারছিলাম তোমার অনুভূতির গভীরতা। তাই আমি কিছু মনে করিনি। অথচ অন্য কেউ শুনলে বলত, কি নিষ্ঠুর স্বামী। কিন্তু হঠাৎ তুমি আমাকে মারাতে, আমাদের দুজনের মনের ভাব যেন খুলে গেল।

'আমি ছাড়তে পারব না। আমার হাতদুটো বেঁধে রাখো।'

আমার হাত দুখানা তোমার বুকের কাছে নিয়ে জড়ো করে ধরলাম। তোমার কাছে গভীর আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে।

খুশি হলাম তোমার দৃষ্টিতে। তুমি তাকিয়ে দেখছিলে বাঁধা হাত দুখানি দিয়ে চুলটা মুখের উপর থেকে সরাতে চেষ্টা করছিলাম। এইবার বোধ হয়, এতদিনকার অভ্যাসটা সারবে, আমি মনে মনে ভাবলাম।

কিন্তু বলা যায় না কি উদ্ভট চিন্তা আমার মনে জমা হত যদি তখন কেউ তিলের কথা উল্লেখ করত।

'আচ্ছা, আমার ওপর তোমার শেষ অনুরাগটুকুও চলে গেল বলেই কি আবার অভ্যাসটা ফিরে এলো? তুমি কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলে যে যা হয় করগে, আমি হাল ছেড়ে দিলাম, তুমি এমন ভাব করতে যেন দেখতেই পাওনি।'

তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। এত বকুনি, মার খেয়েও যা

সারেনি, তা আপনি সেরে গেল। মারাত্মক ওষুধে যা সারে নি তা সেরে গেল নিজে থেকে।

'জান আমি আর তিলটা নিয়ে খেলা করি না।'—কথাটা এমনভাবে বললাম যেন ব্যাপারটা আমি সেই মাত্র লক্ষ্য করেছি। তুমি তাকালে। কিন্তু যেন কোনো উৎসাহ নেই। যদি তোমার উৎসাহই নেই, তবে কেন একদিন অতটা বাড়াবাড়ি করেছিলে—এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল। আবার হয়তো তুমিও প্রশ্ন করতে চাইছিলে যে যদি অত সহজেই ছেড়ে দিতে পারলে অভ্যাসটা তবে কেন এতদিন তা কর নি? কিন্তু তুমি কথাই বললে না।

যে অভ্যাসে কিছু যায় আসে না, যা বিষও নয়, অমৃতও নয়, তা নিয়ে যদি থাকতে হয় তো থাকো সারাদিন—এই কথাই যেন ফুটে উঠল তোমার চোখের দৃষ্টিতে। বিরক্ত লাগল। তোমার মনেও বিরক্তি জাগাবার চেষ্টায় ইচ্ছা হ'ল আবার হাত দিই।

কিন্তু হাত যেন নড়তে চাইল না।

নিজেকে বড় একা মনে হল। রাগও হল।

ভাবলাম তুমি সামনে না থাকলে আবার হাত দেব। কিন্তু ব্যাপারটা যেন অতি ন্যক্কারজনক মনে হতে লাগল; হাত দিতে পারলাম না।

মেঝের দিকে তাকালাম। ঠোঁট কামড়ালাম।

'তোমার তিলটার কি হল?' কত অপেক্ষা করেছি তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা করবে এই কথাটা। কিন্তু তিল কথাটা আমাদের কথাবার্তা থেকে যেন বিদায় নিয়ে গেছে।

আর বুঝি সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু।

কেন যেদিন তুমি বকাবকি করেছিল। সেদিন আমি একটা কিছু করে বসিনি? আমি সত্যিই অপদার্থ।

বাড়িতে এসে, তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে, মার সঙ্গে আমি স্নান করছিলাম।

'সায়াকো, তুমি আগে সুন্দর ছিলে, এখন আর তা নেই।' মা বললেন। 'বয়সকে বোধ হয় ঠেকিয়ে রাখা যায় না।'

আমি চমকে উঠে তাকালাম। মার যেমন মোটা-সোটা আর নরম চামড়া ছিল, তেমনই আছে।

'তিলটাও তখন কত সুন্দর দেখাত।'

ওই তিলটার জন্যে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি, তা মাকে বলতে পারলাম না। শুধু বললাম, 'ডাক্তারের পক্ষে ওটা কেটে বাদ দেওয়া নাকি কিছুই নয়।'

'হ্যাঁ, তবে একটু দাগ থাকতে পারে।' আমার মা কি শান্ত।

'আমরা হাসতাম। সায়াকো হয়ত বিয়ের পরেও তিলটা নিয়ে খেলা করবে।'

'আমি করতাম।'

'আমরাও তাই ভেবেছিলাম।'

'অভ্যাসটা খুব খারাপ। কি করে শুরু হল?'

'যখন বাচ্ছাদের গায়ে তিল বার হয়।'

'আমার বাচ্ছাদের গায়ে তিল নেই।'

আমার আবার মনে পড়ল মা আর আমার বোনেরা তিলটা নিয়ে কত কি করছে।

বাড়িতে তিলটা নিয়ে আমার খুশি মতো কত খেলা করেছি। কোনো মানে হয় না।

তিলটায় হাত দিতে আমার চোখ জলে ভরে এলো।

কিন্তু হাত দেওয়া মাত্র তোমার কথাই মনে পড়ল।

স্ত্রী হিসাবে আমি অপদার্থ। হয়তো আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। বিছানায় শুয়ে শুধু তোমার কথা মনে পড়ল। ভিজে বালিশে মাথা দিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম সেই তিলটির। পিঠে হাত দিয়ে তিলটা আবার ধরতে গেছি, কিন্তু তিলটা যেন হাতে উঠে এলো—যেন সেইটাই স্বাভাবিক।

আমি যেন তিলটা হাতে নিয়ে তোমার নাকের পাশে যে তিলটা আছে, তার পাশে রেখে দিলাম। তোমাকে যেন দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছি।

যখন জেগে উঠলাম, এখনো আমার বালিশটা ভিজে। এখনো কাঁদছি।

মনে হয় আমি ক্লান্ত। তবু মনটা কতকটা শান্ত।

একবার মনে হল তিলটা কি সত্যি চলে গেছে? যায় নি—হাত দিয়ে সেটাকে অনুভব করতে পারলাম।

তোমার নাকের পাশে যে তিলটা, সেটার কথা আমি কোনোদিন বলিনি। কিন্তু ওটার কথা সর্বক্ষণ আমার মনে ছিল।

কেমন সুন্দর একটা রূপকথা হত যদি আমার তিলটা তোমার তিলের উপর বসিয়ে দিয়ে দুটোকে এক সঙ্গে আরো বড় করে দেওয়া যেত।

মাকে বললাম, 'তোমার আমাকে বকা উচিত ছিল।'

'কত বকেছি।'

'কেন বকেছ?'

'কেন? ওটাতো খারাপ অভ্যাস।'

'যখন দেখলে আমি ওটাকে নিয়ে খেলা করছি তখন কি মনে হল?'

'কেমন যেন অশোভন।'

'তোমরা কি বিরক্ত হতে?'

হঠাৎ মনে হল সবাই আমার এই তিলটাকে কেন্দ্র করে আমাকে ভুল বুঝেছে।

আমার চরিত্রের যা কিছু কালিমা, তা হয়তো এই তিলটাকে কেন্দ্র করে। আমি যে উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারি নি তাও এই জন্যে।

এখন লিখতে গিয়েও মনে হচ্ছে আমার ত্রুটির কথা। কিন্তু তোমার কাছে এ কথা না বলে উপায় নেই।

অনুবাদ: ডঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

হানের অপরাধ

নাওয়া শাইগা

বিস্মিত হতবাক করে সবাইকে যুবা চীনা যাদুকরটি খেলা দেখাতে গিয়ে তার স্ত্রীর মাথার রক্তবহা শিরাটি কেটে দু'খান করে ফেলল হাতের ভারী একখানি ছোরা নিক্ষেপ করে। যুবতীটি ঘটনাস্থলে মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে হানকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

ঘটনাস্থলে থিয়েটারের ডিরেক্টর, হানের চীনা সহকারী, ঘোষক ও প্রায় তিনশতাধিক দর্শক উপস্থিত ছিল। দর্শকদের পিছনে একজন পুলিশও মোতায়েন ছিল। কাজেই এতগুলি দর্শকের উপস্থিতিতে এমনধারা ঘটনা সত্যই রহস্যজনক। এটা কি আকস্মিক দুর্ঘটনা, না ইচ্ছাপ্রণোদিত ?

হানের কাজ হল : দরজা প্রমাণ একটা কাঠের বোর্ডের সামনে তার স্ত্রী গিয়ে দাঁড়াবে। আর সে আট হাতেক দূর থেকে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে এক একখানি বড় ছোরা পরপর নিক্ষেপ করবে। আর ছোরাগুলি ইঞ্চি দুই দূরে গিয়ে কাঠের সঙ্গে বিঁধে যাবে সশব্দে। স্ত্রীর দেহের চারদিকে যখন ছোরাগুলি কাঠের বোর্ডের ওপর গিয়ে বিঁধত মুখ থেকে তখন তার এক অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসত ছোরাগুলো লক্ষ্যস্থানে গিয়ে বিঁধেছে বলে।

থিয়েটারের ডিরেক্টরকে দায়রা জজ প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করলেন।

'আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন খেলাটা খুবই শক্ত ?'

'না হুজুর! অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের কাছে এ মোটেই শক্ত নয়। তবে ঠিকমত খেলা দেখাতে হলে খেলোয়াড়ের স্নায়ুর জোর থাকা চাই। মনের একান্ত নিবিষ্টতার প্রয়োজন।'

'তা ঠিক! আচ্ছা, ধরে নিলাম এটা একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু এমন দুর্ঘটনা কি হামেশা ঘটে থাকে ?'

'না হুজুর! হামেশা যদি দুর্ঘটনা ঘটত আমি তা হলে আমার থিয়েটারে ঐ খেলা দেখাতে দিতাম না।'

'বেশ, ভাল কথা! তাহলে আপনি কি মনে করেন কাজটা ইচ্ছাকৃত।'

'তাও বা বলি কি করে, হুজুর? কেননা ছোরাটা ছুঁড়ে মারা হয় বারো ফুট দূর থেকে। আর তা করতে হলে বেশ কিছুটা দক্ষতার প্রয়োজন। ভুলচুক হবার উপায় নেই এক্ষেত্রে। তবে তার যে কোনো সম্ভাবনা নেই, বলা যায় না।'

'বেশ, তা হলে আপনি কি মনে করেন, এটা উদ্দেশ্যমূলক?'

'তা আমি বলতে পারব না, ধর্মাবতার।'

বিচারক ধাঁধায় পড়লেন। এ যে স্পষ্ট নরহত্যা! তবে এই হত্যাকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত কিনা তা বলা অসম্ভব। যদি হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে তা খুব হাত সাফাই করে—বিচারক ভাবলেন। বিচারক এর পরে যাদুকরের চীনা সহকারীকে প্রশ্ন করার জন্য ডেকে পাঠালেন। হানের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সে রয়েছে। তিনি তাই প্রশ্ন করলেন:

'আচ্ছা, হানের সাধারণ চালচলন কেমন?'

'ওর কাজে কোন খুঁত নেই, হুজুর। ও কখনও জুয়া খেলে না। মদ খায় না। কিংবা মেয়েদের পিছু পিছু ছোটেও না। তাছাড়া গত বছর ও খৃষ্টান হয়েছে। ইংরাজী ভাষাও শিখছে। আর যখনই ফুরসত পায় তখন বাইবেল বা অনুরূপ কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে বসে।'

'আচ্ছা, ওর স্ত্রীর চালচলন কেমন?'

'ওঁর কাজেরও কোন ত্রুটি নেই, হুজুর! এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে এসব খেলা যারা দেখায় তাদের কোন নীতির বালাই থাকে না। তবে শ্রীমতী হান ভিন্ন ধরনের। ছোট্ট সুন্দরী এই মেয়েটির সঙ্গে অনেকেই ভাব করতে চাইতো। তবে উনি কিন্তু কারুর কাছে ধরা দেন নি নিজেকে।'

'আচ্ছা, ওঁদের দুজনের মেজাজটা কেমন?'

'খুব শান্তশিষ্ট, হুজুর। ওদের বন্ধুবান্ধব পরিচিতরা সবাই ওঁদের পছন্দ করতেন। কারুর সঙ্গে কোন ঝগড়াঝাঁটি ছিল না। কিন্তু—।'

চীনা সহকারী সহসা থেমে গেল। তারপর খানিকটা কি যেন ভেবে নিয়ে আগেকার কথার খেই ধরে বলল:

'কিন্তু আমি যদি হুজুর আপনাকে একথা বলতে যাই তাহলে হানের প্রতি অবিচার করা হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এঁরা দুজন বাইরের আর সকলের কাছে খুব ভদ্র ও নিঃস্বার্থ হলেও পরস্পর পরস্পরের কাছে আশ্চর্য-জনকভাবে ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির।'

'কেন বলত?'

'আমি জানি না, হুজুর।'

'এ ঘটনার পর থেকেই তোমার কি তাই ধারণা হয়েছে ?'

'না হুজুর। বছর দুই আগে শ্রীমতী হান অন্তঃসত্ত্বা হন। তাঁদের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় নির্ধারিত সময়ের পূর্বে। দিন তিনেক পর বাচ্চাটা মারা যায়। তারপর থেকেই ওঁদের দুজনের সম্পর্কের পরিবর্তন দেখা যায়। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দুজনের মধ্যে সাংঘাতিক কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি দেখা দিত। হানের মুখখানি সাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে যেত! কিছু একটা বলতে বলতে হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে যেত। হান কিন্তু কোনদিন স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে নি। কিংবা এমন কোন কাজ করেনি যা তার নীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু আপনি যদি ওর দিকে কোনদিন তাকাতেন, হুজুর, তাহলে দেখতে পেতেন ওর চোখে জ্বলছে যেন রাগের আগুন। সময় সময় তা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠতে হোত।

'একদিন আমি তো হানকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসেছিলাম, সে পরিবারকে তালাক দেয় নি কেন—বিশেষ করে যখন নিজেদের মধ্যে তাদের বনিবনা নেই। তা ও আমায় তখন বলল যে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো কারণ ঘটেনি। স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসার মৃত্যু হয়েছিল। অবশ্য শ্রীমতী হানও এটা লক্ষ্য করেছিলেন। স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসাও ক্রমশ উবে গিয়েছিল। হান নিজেই তা আমাকে বলেছেন। আমার মনে হয় এজন্যই সে বাইবেল পড়তে শুরু করেছিল। কেননা, বাইবেলের নীতিকথার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্তরের হিংসার প্রবৃত্তিকে দমন করতে চাইত সে। চেষ্টা করত স্ত্রীকে ঘৃণা না করার। তাছাড়া স্ত্রীকে ঘৃণা করার কোন কারণও ছিল না। শ্রীমতী হান সত্যই হতভাগিনী। হানের সঙ্গে তিনি বছর তিনেক রয়েছেন। আজ এখানে কাল ওখানে চলমান খেলোয়াড় হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছেন ওর সঙ্গে। আমার মনে হয় এজন্যই বুঝি তিনি হানের সঙ্গে ঘর করতেন। যদিও তাদের মধ্যে বনিবনা ছিল না তেমন।

'তাহলে এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তুমি কি মনে করো ?'

'আপনি কি হুজুর বলতে চাইছেন, এটা কোন দুর্ঘটনা কিংবা উদ্দেশ্যমূলক বলে আমি মনে করি ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'সত্যি হুজুর, ঘটনার ক্ষণ থেকেই সব দিক থেকে ব্যাপারটা আমি তলিয়ে দেখেছি। যতই আমি ভাবি ততই আমার হেঁয়ালী বলে মনে হয়। ঘোষকের সঙ্গেও এ নিয়ে আমি আলাপ করে দেখেছি। সে বলল, ব্যাপারটা যে কী তা

সেও বুঝে উঠতে পারে নি।'

'ভাল কথা। বল তো দেখি, ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন কি আকস্মিক একটা ঘটনা কিংবা উদ্দেশ্যমূলক বলে তোমার মনে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ হুজুর, আমার তাই মনে হয়েছিল। আমি ভাবলাম: হান গিয়ে ওকে খুন করে বসল বুঝি?'

'ইচ্ছামূলক বলেই কি তুমি মনে করেছিলে?'

'হ্যাঁ হুজুর। তবে ঘোষক বলল: হাতটা ওর পিছলে গিয়েছিল বলে মনে হয়।'

'তাই বুঝি? কিন্তু ওদের জীবনের কথা সে কি জানত তোমার মত?'

'হয়ত ঠিক জানত না, হুজুর।'

'ঐ মুহূর্তে হানের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?'

'আহ্ বলে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। তাই শুনে আমি মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম ওর স্ত্রীর গলা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। কয়েক মুহূর্ত হানের স্ত্রী ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। ছোরাখানি টেনে বার করতেই তিনি মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। অবশ্য আমাদের আর কিছু করবার ছিল না। বিস্মিত হতবাক হয়ে আমরা কেবল ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ...আর হান—আমি তার মনের অবস্থা বর্ণনা করতে পারব না। আমি তখন আর ওর দিকে তাকাইনি। 'ও এসে তাহলে খুন করলে?'—কথাটা মনে হতেই আমি ওর দিকে তাকালাম! মুখখানি ওর তখন শবের মত পাণ্ডুর হয়ে গেছে। চোখ দুটি বোঁজা। স্টেজম্যানেজার তখন পর্দা ফেলে দিয়েছিলেন। শ্রীমতী হানের দেহের কাছে যখন সবাই এগিয়ে এল, তখন তিনি মারা গেছেন। হান সেই মুহূর্তে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে নীরবে প্রার্থনা করতে লাগল।'

'ওকে কি খুব অভিভূত দেখলে?'

'হ্যাঁ হুজুর, খুবই অভিভূত দেখলাম।'

'বেশ ভাল। তুমি এখন যেতে পার। পরে যদি কোন দরকার হয় তবে তোমাকে আবার ডেকে পাঠাব।'

দায়রা জজ চীনা সহকারীকে যেতে দিলেন। আর ডেকে পাঠালেন স্বয়ং হানকে। কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল হান।

যাদুকরের বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি ফ্যাকাশে, লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ল। স্নায়বিক অবসন্ন বলে মনে হল ওকে।

'আমি এরই মধ্যে থিয়েটারের ডিরেক্টর আর তোমার সহকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।'—সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো হানকে লক্ষ্য করে বিচারপতি বলে চললেন।—'আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

হান নীরবে মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা আমায় বল তো, তুমি কি কখনও তোমার স্ত্রীকে ভালবাসতে?'

'বিয়ের পর থেকে ছেলেটার জন্মদিন পর্যন্ত আমি সমানে তাঁকে ভালবাসতাম।'

'ছেলেটার জন্মের পর থেকে তা পরিবর্তন হল কেন?'

'কারণ আমি জানতাম ও ছেলে আমার নয়।'

'তবে কার?'

'আমার স্পষ্ট ধারণা ও আমার স্ত্রীর সম্পর্কিত এক দাদার।'

'তুমি কি ওঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে?'

'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই তো আমার এ বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসে বিয়ের জন্য আমায় পীড়াপীড়ি করতে থাকে।'

'আমি কি ধরে নিতে পারি, তোমাদের বিয়ের আগে থেকেই ওঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল?'

'হ্যাঁ হুজুর। আমাদের বিয়ের আট মাসের মাথায় ছেলেটার জন্ম হয়।'

'তোমার সহকারীর মতে শিশুটা নির্দিষ্ট তারিখের আগে জন্মেছিল, তাই না?'

'আমি তাই সবাইকে বলেছিলাম।'

'জন্মাবার পরেই শিশুটি মারা যায়, তাই কি? ওর মৃত্যুর কারণ কি?'

'ওর মা শিশুটার মুখে মাই চাপা দিয়েছিল। দম আটকে মারা যায় ছেলেটা।'

'তোমার স্ত্রী কি ইচ্ছে করেই তাই করেছিলেন?'

'দুর্ঘটনা বলেই জানিয়েছিলেন তিনি।'

বিচারপতি নীরবে হানের মুখের দিকে চোখ তুলে অপলকে তাকিয়ে রইলেন। হান তাঁর নুয়ে পড়া মাথাটি এবার তুলল। চোখ দুটো নামিয়ে পরবর্তী প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বিচারপতি আবার প্রশ্ন করলেন:

'তোমার স্ত্রী কি তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা তোমার কাছে স্বীকার করেছিলেন?'

'না, তিনি স্বীকার করেননি। আমিও কখনও তা নিয়ে কোন কথা বলি নি। ছেলের মৃত্যুতে দু'জনে যেন অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমিও ঠিক করলাম যতখানি সম্ভব উদার মনোভাব গ্রহণ করব এ বিষয়ে। কিন্তু—।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমরা কি এই উদারতা বজায় রাখতে পেরেছিলে ?'

'ঠিক বলেছেন, হুজুর! আমি কিছুতেই মনে করতে পারিনি ছেলেটা মরে গেল বলে সব দোষ স্খালন হয়েছে। স্ত্রীর কাছ থেকে যখন আমি দূরে দূরে থাকতাম তখন অনেকটা আমি শান্তি পেতাম। কিন্তু যে মুহূর্তে ওঁকে আমি দেখতাম তখনই আমার রাগ বেড়ে যেত।'

'তখন কি তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা মনে হয়নি ?'

'অনেক সময়ই আমি ভাবতাম আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়াটা উচিত। কিন্তু আমি তা আমার স্ত্রীর কাছে মুখ ফুটে বলিনি। আমার স্ত্রীও বলতেন আমি যদি ওঁকে ছেড়ে যাই তবে উনি আর বাঁচবেন না।'

'উনি কি তোমায় ভালবাসতেন ?'

'ভাল বাসতেন না আমায়।'

'তাহলে উনি ওকথা বলতেন কেন ?'

'আমার মনে হয় বাস্তব পরিস্থিতির কথাটাই খালি ভাবতেন। তাঁর সেই দাদাটি ওঁদের বাড়ীর ভিটেতে ঘুঘু চরিয়েছে। আর উনি জানেন কোন বিষয়ী লোক তাঁর মত একজন যাদুকরের স্ত্রীর সঙ্গে আর ঘর করবে না। তাছাড়া তাঁর পা' দুটিও নেহাত ছোট। ঘরের কাজকর্ম তাঁকে দিয়ে করানো যাবে না।'

'তা তোমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তখন কী রকম সম্পর্ক ছিল ?'

'আর পাঁচটি বিবাহিত পরিবারের মতই।'

'তোমার স্ত্রীর কি তোমার প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল ?'

'উনি আমায় ঠিক পছন্দ করতেন কিনা আমি জানি না। বস্তুতঃ আমি মনে করি আমার স্ত্রী হয়ে আমার সঙ্গে থাকা তাঁর পক্ষে খুব কষ্টের ছিল। তবুও কিন্তু সহ্য কবতেন। সহ্য করতেন মুখ বুজে যা কোন পুরুষের পক্ষে চিন্তা করা যায় না। আমার বুকের মধ্যে কিছু একটা যে কুঁড়িয়ে কুঁড়িয়ে খাচ্ছে তা তিনি দেখতেন ঠাণ্ডা নিষ্ঠুর দৃষ্টি হেনে। আমি যে যন্ত্রণায় হাসফাঁস করছি, গোঁঙিয়ে মরছি, মুক্তির পথ খুঁজছি দেখেও তিনি দেখতেন না কোনো সহানুভূতির চোখে।'

'তা এই ব্যাপারে তুমি কোন একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে পারতে। ওঁর

সঙ্গে আপস করে নিতে পারতে কিংবা ওঁকে ছেড়ে দিতে পারতে প্রয়োজন বোধে।'

'আমি কোন সিদ্ধান্ত নিইনি। কারণ আমার মন অন্য ব্যাপারে ভারাক্রান্ত ছিল।'

'কোন ব্যাপারে?'

'আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করব যাতে আমার দিক দিয়ে কোন অন্যায় না হয়! ...শেষ পর্যন্ত কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি।'

'তুমি কি তোমার স্ত্রীকে খুন করবে কখনও ভেবেছিলে?'

হান এ প্রশ্নের জবাব দিল না। বিচারপতি পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে হান জবাব দিল:

'ওঁকে খুন করার কথা আমার মাথায় আসার আগে আমি অনেক সময় ভাবতাম উনি যদি মারা যান তবে ভাল হয়।'

'আচ্ছা ধরো, যদি আইনে না আটকাতো তাহলে তুমি কি তোমার স্ত্রীকে খুন করতে?'

'আইনের কথা আমি ভাবিনি, হুজুর। আইনের বাধানিষেধ আমায় ক্ষান্ত করে নি। আমি ছিলাম দুর্বল প্রকৃতির। ঐ সময় আমি সৎ ভাবে থাকবার কথাই ভাবছিলাম।'

'যাই বল, তুমি তোমার স্ত্রীকে খুন করার কথা ভাবছিলে, তাই না? অবশ্য আমি পরের কথাই বলছি।'

'খুন করব আমি কখনও মনস্থির করিনি। কিন্তু হ্যাঁ, একবার ভেবেছিলাম বলতে পারেন।'

'ঘটনার দিন থেকে কত দিন আগে?'

'ঘটনার আগের দিন রাত্রে। ...সেদিন সকালেও বলতে পারেন।'

'তোমাদের মধ্যে কি ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'কি নিয়ে?'

'তুচ্ছ এক বিষয় নিয়ে। মনে রাখবার মত নয়।'

'মনে করে দেখ না একবার।'

'খাওয়া-দাওয়া নিয়ে। খিদে পেলে আমার মেজাজটা ভয়ানক চটে যায়। হ্যাঁ, সেদিন আমার স্ত্রী কি একটা ভাল খাবার তৈরী করছিলেন। তাই

খাবার তৈরী হতে দেরী হয়েছিল কিছুটা। আর আমি তাতে রেগে যাই ভয়ানক।'

'তুমি কি এমনি ধারা হামেশাই রেগে যাও?'

'না। তবে অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে রেগে মেগে উঠতাম। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি অধিকতর সৎ জীবন যাপনের কথা ভাবছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম, তা হবার নয়। আমি শুতে গেলাম কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। যত সব আজগুবী চিন্তা আমার মাথায় খেলে বেড়াতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, যতই চেষ্টা করি না কেন কিছুতেই আমি নিষ্কৃতি পাব না। নিস্তার পাব না আমার এই বর্তমান জীবনের ঘৃণ্য পরিবেশ থেকে। আর আমার বিবাহিত জীবনই এই বিষময় পরিস্থিতির মূল। বেপরোয়ার মত আমি তাই আমার অন্ধকারময় জীবনের কালো পর্দা দূর করার জন্য আলোর রেখা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তাও ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগল। তবুও মাঝে মাঝে আশার আলোর ক্ষীণ শিখা খেলে বেড়াত আমার মনের আনাচে কানাচে। আমি জানি যাই আমি করি না কেন আমার বেরুবার পথ নেই। আমি একটি মড়া, একটা কঙ্কাল।'

আর তার পর থেকে কুৎসিত চিন্তাটা আমার মনের কোণে উঁকি মারতে লাগল: একমাত্র পথ ওঁর মৃত্যু! মৃত্যুই একমাত্র পথ! তাহলে ওঁকে আমি হত্যা করি না কেন?—পরিণামে এর জন্য যে সাজা পেতে হবে তা আমার কাছে খুব একটা বড় বলে মনে হ'ল না। অবশ্য এর জন্য আমাকে হয়ত জেলে যেতে হবে। কিন্তু জেলের জীবন আমার বর্তমান জীবনের চাইতে কী আর তেমন নিকৃষ্ট? কিন্তু স্ত্রীকে খুন করলেই কি আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল? আমি কি শান্তি পাব? নিষ্কৃতি পাব? যেমন পাব আত্মহত্যা করলে? বার বার আমি শুধাতে লাগলাম নিজেকে। এ গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার পথ কোথায়? এই বুঝি আমার সত্যিকারের জীবন। শুধু ভোগ কর অসহ্য যন্ত্রণা।

মনে মনে যখন এইসব কথা ভাবছিলাম, আমি তখন একদম ভুলে গিয়েছিলাম আমার যন্ত্রণার সব কারণ আমার পাশেই শুয়ে আছেন। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে আমিও তাঁর পাশে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। আমার মস্তিষ্কের যন্ত্রপাতিগুলি বিকল হয়ে পড়ল। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মনটি আমার অসাড় হয়ে গেল। পত্নীকে খুন করার চিন্তাটা বিলীন হয়ে গেল ক্রমশঃ। বিষাদময়, অবয়বহীন চিত্ত আমায় অভিভূত করে দিল। তারপর দেখা দিল মহানিশার

বিভীষিকা। সুন্দর মহত্তর জীবনের সঙ্কল্পের কথা আমার মনে আবার দেখা দিল। আর আমি উপলব্ধি করলাম সে জীবন আমার নয়। কেননা আমি ছিলাম ভীতু দুর্বল প্রকৃতির লোক। তারপর যখন রাত্রির অন্ধকার বিলীন হয়ে প্রভাতের আলো দেখা দিল দেখতে পেলাম পাশে রয়েছেন আমার স্ত্রী। তিনিও চোখ বুজে ঘুমোতে পারেননি।...'

'জেগে উঠে তোমরা দুজন কি স্বাভাবিকভাবে আচরণ করলে?'

'না, আমরা কেউ একটা কথাও কাউকে বলিনি।'

'তোমাদের মধ্যে এমনই যদি হয়ে থাকে তবে তুমি ওঁকে ত্যাগ করার কথা ভাবলে না কেন?'

'ধর্মাবতার আপনি কি মনে করেন তাতে আমার সমস্যার সমাধান হবে? না না, তাতে হবে শুধু চোখঠারা গোছের কিছু একটা—বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়াই শুধু! আমি তো আগেই বলেছি আমার দিক থেকে আমার স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ অন্যায় যেন না হয় সেদিকে আমি সচেতন ছিলাম।'

হান বিচারকের দিকে চোখ তুলে তাকাল ঔৎসুক্যের সঙ্গে। বিচারক মাথা নাড়লেন। সম্মতি দিলেন বুঝি তাকে আবার বলতে।

'পরদিন আমি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। শরীরটা ভাল ছিল না। তবে আমার মনের দিক থেকে কোন অবসাদ ঘটে নি। চুপচাপ থাকাটাই আমার অসহ্য লাগছিল। আমি তাই জামা কাপড় পরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। শহরের এখানে ওখানে নির্জন পরিত্যক্ত স্থানে ঘুরে বেড়াই উদ্দেশ্যহীন ভাবে। আমার মনে তখন বারবার উঁকি মারতে থাকে, আমার সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু একটা করা উচিত। তখন কিন্তু খুন করার কোন চিন্তাই আমার মনে হয় নি। সত্যিকথা বলতে কি যেদিন আমি অপরাধটা করেছিলাম তার সঙ্গে আগেকার রাত্রির চিন্তার সঙ্গে অনেকটা পার্থক্য ছিল বস্তুতঃ খেলা দেখাবার আগে যদি আমি তাই ভাবতাম তবে ছোরা খেলা না দেখিয়ে অন্য কোন খেলা দেখাতে পারতাম। অনেক খেলাই তো আমার জানা ছিল। সে যাই হোক, সন্ধ্যে হোল। খেলা দেখাবার জন্য মঞ্চে আমাদের ডাক পড়ল। তখনও পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে আমি জানতে পারিনি অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। অন্যান্য দিনের মত দর্শকদের কাছে আমি আমার ছোরার ধার পরীক্ষা করে দেখালাম কাগজ টুকরো টুকরো করে কেটে। দু'একখানা ছোরা কাঠের মেঝের উপর আমি ছুঁড়ে মারলাম। ছোরাগুলি মেঝেতে শব্দ করে গেঁথে গেল। একটু পরেই আমার স্ত্রী মঞ্চে এসে

দাঁড়ালেন রীতিমত সেজেগুজে। একটি চীনা পোশাক পরনে তাঁর। দর্শকদের প্রতি মিষ্টি হাসি হেসে তিনি গিয়ে বোরডে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ালেন। একখানি ছোরা তুলে আমিও নিজের জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।

'আমাদের চার চোখের বিনিময় হল এবার। গতরাত্রের পর এই বুঝি প্রথম। তখনই আমি বুঝতে পারলাম সেদিন রাত্রে এই খেলা দেখানোর কাজটা বেছে নিয়ে আমি ভুল করেছি। আমার স্নায়ুগুলি শিথিল হয়ে পড়ল। আমি ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়লাম। আমাকে বুঝি তা ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল। আমি বুঝতে পারলাম আমার কব্জির উপর নিজের আর কোন আস্থা নেই। নিজেকে প্রশমিত করার জন্য আমি চোখ বুজলাম এক মুহূর্তের জন্য। বুঝতে পারলাম সর্বাঙ্গ আমার কাঁপছে থরথর করে।

'নির্দিষ্ট মুহূর্ত এসে গেল! প্রথম ছুরিখানি আমি ওঁর মাথার উপরদিকটা তাক করে ছুঁড়ে মারলাম। আর অন্যবারের মত মাথার ইঞ্চি খানেক দূরে ছোরাখানি গিয়ে বিঁধল। আমার স্ত্রী তাঁর দু'হাত তুলে ধরলেন। আমি তাঁর দু'বাহুর দুদিকে দুটো ছুরি তাক করলাম। প্রথম ছোরাখানি ছুঁড়ে মারার পরেই মনে হল আমার আঙ্গুলগুলো কে যেন টেনে ধরেছে। ছোরাগুলি যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত করার সঠিক ক্ষমতা আমি যেন হারিয়ে ফেললাম। ছোরাগুলি যে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বিঁধে গেছে সেটা বুঝি আমার সৌভাগ্যই।

'আমার স্ত্রীর ঘাড়ের বাঁ পাশটা তাক করে আর একখানি ছোরা আমি ছুঁড়ে মারলাম। ডান দিক তাক করে আর একখানি ছুঁড়তে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ওঁর চোখে অদ্ভুত এক ভাব। ভয়েই বুঝি সর্বাঙ্গ তাঁর অবশ হয়ে গেছে! তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে ছোরাখানি আমি ওঁর ঘাড় তাক করে ছুঁড়তে যাচ্ছি তা মুহূর্তের মধ্যে এসে বিঁধবে তাঁর গলায়? চোখ-মুখ আমার ধাঁধিয়ে গেল। বুঝি আমার চেতনা লোপ পেতে বসেছে। তবুও ঘাড়ের উপর দিকের শূন্যস্থান লক্ষ্য করে যতদূর সম্ভব হুঁশিয়ার হয়ে ছোরাখানা আমি ছুঁড়ে মারলাম।…'

বিচারকের মুখে কথা নেই। হানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে তিনি তাকালেন।

'তৎক্ষণাৎ আমার খেয়াল হল আমি ওঁকে খুন করেছি।' হান বলে উঠল খাপছাড়ার মত।

'উদ্দেশ্যমূলক—তাই কি তুমি বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, হঠাৎ আমার মনে হল ইচ্ছে করেই বুঝি আমি তা করেছি।'

'তারপর বুঝি তুমি তোমার স্ত্রীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করলে নীরবে?'

'হ্যাঁ, হুজুর। ঘটনাস্থলে আমার মাথায় ঐ দুষ্টু ফন্দিটা সহসা খেলে গেল। আমি জানতাম, আমাকে সবাই জানেন খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী বলে। তাই প্রার্থনা করার ভান করে আমি তখন ভাবছিলাম, এরপর আমায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

'তাহলে তুমি নিশ্চয় বলছ তুমি যা করেছ তা সম্পূর্ণ ইচ্ছাপ্রণোদিত?'

'তাই। কিন্তু তখনই আমি বুঝে নিলাম ব্যাপারটি দুর্ঘটনা বলে ভান করে যেতে হবে।'

'এটা যে ইচ্ছামূলক তা কখন তোমার মনে হয়েছিল?'

'বিচার বিবেচনার সব ক্ষমতাই আমার তখন লোপ পেয়েছিল।'

'তুমি কি মনে কর ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা বলে বোঝাতে পেরেছিলে তুমি সবাইকে?'

'হ্যাঁ, অবশ্য পরে যখনই কথাটা আমি ভাবতাম তখন সর্বাঙ্গ আমার কাঁটা দিয়ে উঠত। আমি ভান করে থাকতাম এই দুর্ঘটনার জন্য আমি খুবই শোকার্ত। তবে আশে-পাশে যদি কোন বুদ্ধিমান লোক থাকত তবে তার চোখে ধরা পড়ত আমি আগাগোড়া অভিনয় করে চলেছি। হ্যাঁ, ভালো কথা, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি স্থির করেছিলাম অভিযোগ থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। আমার বিরুদ্ধে যে কোনরূপ বাস্তব প্রমাণ নেই আমি তা ঠাণ্ডা মাথায় জেনে নিলাম। ঠিক কথা, সবাই হয়ত বলাবলি করবে যে নিজ হাতে আমি স্ত্রীকে খুন করেছি, তবে এটা যে একটা দুর্ঘটনা নয় তাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ পর্যন্ত যা ঘটে গেছে তা মনে মনে ভেবে নিয়ে আমি স্থির করলাম যে স্ত্রীর মৃত্যু কাহিনীটি একটি দুর্ঘটনা বলা চলে।

'তবে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন আমার মাথায় উঁকি মারল। দুর্ঘটনাই যদি ঘটে থাকে আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারছি না কেন? ঘটনার আগের দিন রাত্রে আমি ভেবেছিলাম ওঁকে খুন করব। এই চিন্তাটাই কি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে কাজটা ইচ্ছাকৃত বলে? ক্রমশঃ আমার মনে হল ব্যাপারটা যে কী ঘটে গেল আমি নিজেই তা জানি না! আর এতেই আমার খুব আনন্দ হল—সে কী অসহ্য আনন্দ! গলা ফাটিয়ে আমি চীৎকার করতে চাইলাম।'

'তুমি কি মনে কর এটা দুর্ঘটনা?'

'তা আমি বলতে পারব না। ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত সে বিষয়ে আমার কোনরূপ ধারণাই তখন ছিল না। তাই আমি ঠিক করলাম যদি মুক্তি পেতে চাই তাহলে গোটা ব্যাপারটা খোলাখুলি বলে ফেলাই ভাল। আত্মপ্রবঞ্চনা করার চাইতে—দুর্ঘটনা বলে ব্যাপারটাকে সকলে মনে করার চাইতে, আমি অকপটে বলি না কেন যে কি ঘটেছিল আমি জানি না। ভুল হয়েছিল বলে ঘোষণা করতে আমি পারি না। অপরপক্ষে ইচ্ছাকৃত বলে মেনে নিতেও পারি না। বস্তুতঃ আমি 'দোষী' বা 'দোষী নয়' কোনটাই বলতে পারি না।'

হান এবার চুপ করল। বিচারকও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর একসময় মৃদু কণ্ঠে স্বগতভাবে বলে উঠলেন, আমার বিশ্বাস তুমি যা আমায় বললে তা সত্যি। তোমাকে আর একটি প্রশ্ন :

'তুমি কি তোমার পত্নীর মৃত্যুর জন্য একটুও দুঃখিত নও?'

'একটুও না! অতীতে আমি যখন আমার স্ত্রীকে ভীষণভাবে ঘৃণা করতাম, আমি তখন কখনই ভাবতে পারিনি যে তাঁর মৃত্যুর কথা বলে আমি আজকের মত এতখানি সুখ পাব।'

'বেশ ভাল', বিচারক বলে উঠলেন, 'তুমি এবার যেতে পার।'

হান মাথা নীচু করে আদালত থেকে বেরিয়ে গেল। বিচারক অভিভূতের মত তাঁর কলমটির দিকে হাত বাড়ালেন। তারপর টেবিলের মামলার নথি-পত্রের উপর তিনি লিখলেন :

'নিরপরাধী'!

অনুবাদ : নিখিল সেন

হে মরণ !

উকিয়ো মিসিমা

সাঁতার কাটার পক্ষে ইজু উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের 'এ' মার্কা সমুদ্রের তীরটি এখনও অক্ষত। এখানকার কিছুটা অসমান সমুদ্রতল, উত্তাল নীল তরঙ্গ, টলটলে জল ও সমুদ্রে নামার সহজ ঢালু—সব মিলে এক কথায় সাঁতার কাটার এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে একটু নাগালের বাইরে থাকায় জায়গাটা টোকিওর কাছাকাছি অন্যান্য প্রমোদ-কেন্দ্রগুলোর মতো তেমন নোংরা কিংবা কোলাহলমুখর নয়। ইতো থেকে বাসে দু'ঘণ্টার পথ।

কাছাকাছি সরাইখানা বলতে একটাই—নাম 'ইরাকুসো'। এর কতকগুলো ঘর আছে, ভাড়া খাটে। এছাড়া দু'একটা এবড়ো-খেবড়ো খাবারের দোকানও ছড়িয়ে আছে। বেশীর ভাগ গ্রীষ্মকালেই এদের আনাগোনা। বিস্তৃত বেলাভূমি সাদা ধবধবে। তীরের দিকে যেতে মাঝপথে পাইন গাছে ঘেরা ছোট্ট মতো পাহাড়টি সমুদ্রের উপর আনত—যেন হুমড়ি খেয়ে পড়বে। শিল্পীর আঁকা নিখুঁত ছবি যেন। ভরা জোয়ারের সময় এর অর্ধেকটাই ডুবে যায়। যখন পশ্চিমে বাতাস সমুদ্রের উপরে ভাসমান কুয়াশার আস্তরণকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তখন দূরের দ্বীপগুলো দৃষ্টিপথে আসে। মনোরম দৃশ্য।

ওসিমা দ্বীপটি কাছে, কিছুটা দূরে তোসিমা। এই দু'য়ের মাঝখানে উতোনেসিমা নামে ছোট্ট মতো ত্রিভুজাকৃতি আরও একটি দ্বীপ। এ-ছাড়া আছে নানাগো অন্তরীপের অদূরে সাকাই অন্তরীপ—একই পর্বতমালার অংশবিশেষ, শাখা-প্রশাখা সমুদ্রের গভীরে প্রসারিত। একে ছাড়িয়ে আরও দুটি অন্তরীপ—ড্রাগন প্যালেস ও সুমেকি যার একেবারে দক্ষিণ সীমানায় একটি লাইট হাউস বা বাতিঘর প্রতি রাত্রিতে আলো বিকিরণ করে চলেছে।

'ইরাকুসো'র একটা ঘরে ইকুতা তোমোকো তন্দ্রাচ্ছন্ন। দেখে কে বলবে তিন ছেলে-মেয়ের মা? ফিকে গোলাপী রঙের পোশাকটা লম্বায় খাটো থাকায় হাঁটুটা অনাবৃত। সুডোল নরম হাত, প্রশান্ত মুখশ্রী, ঈষৎ ঢেউ-খেলানো ঠোঁট ভঙ্গিমা তাকে এনে দিয়েছে বালিকাসুলভ সতেজতা। গরমে কপাল ও নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম দানা বেঁধে আছে, মাছিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে এক ঘেয়ে

ভন্‌ভন্‌ আওয়াজ করে। সরাইখানার উত্তপ্ত বাতাস কতকটা গোলাকার কোন ধাতব গম্বুজের ভেতরকার অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তোমোকোর পোশাক তাল মিলিয়ে খুব আস্তে আস্তে ওঠা-নামা করছে। মনে হচ্ছিল ওটা যেন ভারী, বাতাসবিহীন অপরাহ্নের সঙ্গে একীভূত

আগন্তুকের দল সমুদ্রতীরে চলে গেছে। তিনতলার একটা ঘরে তোমোকো থাকে। তাঁর জানালার ঠিক নীচেই অর্ধ-একর পরিমিত লনের উপর বাচ্চাদের জন্য একটা সাদা রঙের দোলনা রয়েছে। তাছাড়া আছে কতগুলো টেবিল, চেয়ার ও লোহার আংটা রাখার একটা বড় পেরেক। আংটাগুলো ঘাসের উপর ছড়ানো। ত্রিসীমানায় কেউ নেই। মাঝে-মাঝে দু'একটা মৌমাছির গুন্‌গুন্‌ আওয়াজ কানে আসলেও কুঞ্জবনের অদূরে সমুদ্রের গর্জনে তা মিলিয়ে যাচ্ছে। বাতাসের দাপটে পাইনগাছগুলো একবার কুঞ্জবনের দিকে আর একবার বালুচরের দিকে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। সরাইখানার পাশে প্রবাহমান ছোট্ট একটা নদী। সমুদ্রে পড়ার আগে যখন এটা একটা বড় জলাধার সৃষ্টি করে তখন প্রায় প্রতি বিকেলেই চোদ্দ পনেরটা রাজহংসীকে সাঁতার কাটতে দেখা যায়।

তোমোকোর তিন ছেলেমেয়ে। দুই ছেলে কিউ ও কাতসুয়োর বয়েস যথাক্রমে ছয় ও তিন, মেয়ে কিকো পাঁচ বছরের। ওরা তিনজনেই ননদ ইয়াসুর সঙ্গে স্নানে বেরিয়েছে। ওদের ওপর একটু কড়া নজর রাখার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে তোমোকো। একটু গড়িয়ে নেওয়া তাঁর চাই-ই।

ইয়াসু প্রৌঢ়া, বিয়ে করেনি। কিউ জন্মাবার সময় লোকের দরকার হওয়ায় স্বামীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তোমোকোই গরজ করে তাঁকে দেশের বাড়ী থেকে আনায়। ইয়াসুর বিয়ে না করার পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। দেখতে তেমন সুন্দরী না হলেও সে বিয়ের বয়স পার না হওয়া পর্যন্ত একাধিক সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমোকোর চিঠি পৌছতে তাঁর মনে হ'ল মন্দ কী, টোকিও-তে ভাই-এর কাছে তো থাকা যাবে? সানন্দেই তোমোকোর আহ্বানে সাড়া দিল। পরিবারের লোকেরা এই সময়টায় দেশের কোন একজন গণ্যিমান্যি লোকের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পরিকল্পনা করছিলেন।

তেমন চটপটে না হ'লেও ইয়াসুর মেজাজ কিন্তু শান্ত প্রকৃতির। বয়সে ছোট তোমোকোকে সে দিদি বলে ডাকে, তাঁর প্রতিটি কথা ভক্তিভরে শোনে। কথায় গ্রাম্য টানটাও ইতিমধ্যে শুধরে নিয়েছে। ঘরের কাজ শেষ করে সে সেলাই-এর স্কুলে যায়—নিজের, বাচ্চাদের ও তোমোকোর জন্য পোশাক তৈরী

করে আনে। বেড়োবার সময় একটা নোট বইতে বড় বড় দোকানের শো রুমে সাজানো হালফ্যাসানের ডিজাইন এঁকে আনে। কখনো-সখনো দোকানে কর্মরত দু'একটা মেয়ে তাঁর দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকায়।

আজ সে স্নান করতে এসেছে হালফ্যাসানের সবুজ রঙের একটা সুইমিং স্যুট পরে। এইটেই একমাত্র কেনা পোশাক তাঁর, বড় দোকান থেকে কেনা। ফর্সা বলে ইয়াসুর মনে বরাবরই একটু অহমিকা ছিল। কড়া রোদ্দুরেও তাঁর তুষার-শুভ্র গায়ের রঙে কোন কালিমা পড়ে না। প্রতিবারই জল থেকে উঠে সে ছাতার নীচে আশ্রয় নেয়, বাচ্চারা জলের কিনারায় বসে বালির ঘর তৈরী করে। ভেজা নরম বালি দিয়ে ইয়াসু তাঁর ধবধবে সাদা পা দুটোকে ভিজিয়ে দিয়ে আরাম উপভোগ করে। শুকিয়ে গেলে ঝিনুকের টুকরো-মিশ্রিত উজ্জ্বল বালিকণাগুলো একটা কালো মতো নক্সা সৃষ্টি করে। সে তাড়াতাড়ি ওগুলোকে পা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় পাছে কোথাও কিছু লেগে থাকে। একটা ছোট্ট আধা-স্বচ্ছ পোকা বালি থেকে লাফিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে পালায়।

হাত দু'টোয় ভর করে, পা ছড়িয়ে দিয়ে ইয়াসু সমুদ্রের দিকে তাকায়। জাঁকালো ঘন মেঘ উত্তেজিত। মনে হয় ওরা যেন নীচের সব কোলাহল, এমন কি সমুদ্রের গর্জনকেও গ্রাস করতে উদ্যত। চরম গ্রীষ্মের সময় এটা, রোদে ক্রোধের আস্ফালন।

বালির ঘর তৈরীতে মন না থাকায় কিউ ও কিকো দৌড়ে গিয়ে চড়ার জলে দাপাদাপি শুরু করে দেয়। নিজের ছোট্ট নিভৃত জগতে চিন্তায় নিমগ্ন ইয়াসু চমকে ওঠে। ওদের পেছনে দৌড়য় পাছে কোন বিপদ হয়।

না, বাচ্চা দু'টো তেমন সাংঘাতিক কিছু করছে না যাতে বিপদ হ'তে পারে। সমুদ্রের গর্জনে ওরা ভয় পেয়েছে। ঢেউগুলো যেখানে আছড়ে পড়ছে ওর কাছেই একটা ঘূর্ণিজলের আবর্ত ছিল। কিউ ও কিকো ওখানে হাত ধরাধরি করে কোমর জলে দাঁড়িয়ে থাকে। সমুদ্রের ঢেউ ও পায়ের তলায় নরম বালির স্পর্শে ওদের চোখগুলো আনন্দে উজ্জ্বল।

কিউ তাঁর বোন কিকোকে বললো—"কে যেন পা-টা টানছে, না রে?"

ইয়াসু ওদের কাছে এসে বলে—"বেশী দূরে যেও না যেন।" তারপর কাতসুয়োর দিকে আঙুল বাড়িয়ে ওদের বকে—"ওকে একা ফেলে আসাটা তোমাদের ভারী অন্যায়। যাও, ওর সঙ্গে গিয়ে খেলা করোগে।" পিসি-মণির কথায় কান না দিয়ে দুই ভাই বোনে হাত ধরাধরি করে জলে দাঁড়িয়ে থাকে। একে অপরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসে। পায়ের তলায় বিলীয়মান

বালুরাশি ওদের অপার আনন্দ দিচ্ছে। এই গুপ্তরহস্য একান্তভাবে ওদেরই।

রোদ্দুরের তাপ বাড়তে ইয়াসুর ভয় হয়। সে তার কাঁধ ও সুইমিং স্যুটের আড়ালে উন্নত বক্ষের দিকে তাকালো। মনে পড়লো দেশ কানাজাওয়ায় বরফের কথা। হঠাৎ সে তাঁর পীনোন্নত বক্ষে ছোট্ট একটা চিমটি কাটে, আরাম পেয়ে একটু মুচকি হাসে। লম্বা নখগুলোতে ক্যালো বালি জমে উঠেছে, ঘরে ফিরে গিয়ে ওগুলোকে কেটে ফেলতে হবে।

কিউ ও কিকোকে দেখতে না পেয়ে ইয়াসু ভাবে ওরা বোধহয় এতক্ষণে কাতসুয়োর কাছে ফিরে গেছে। কিন্তু একি, ও যে একা! কাতসুয়োর মুখটা অদ্ভুতভাবে বিকৃত। আঙ্গুল উঁচু করে কী একটা দেখালো। ভয়ে ইয়াসুর বুকে ঢিপঢিপানি শুরু হ'ল। পায়ের কাছে একটা ঢেউ এসে ফিরে যেতেই গজ দুয়েক দূরে দেখতে পেল ছোট একটা দেহ ফেনার মাঝে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। মুহূর্তে কিউ-এর ঘন নীল প্যাণ্টটা তাঁর নজরে আসলো।

প্রচণ্ড হৃৎকম্প সত্ত্বেও ইয়াসু ছোট্ট দেহটার দিকে এগোল। কিন্তু একটা ঢেউ এসে সোজা বুকে আঘাত করায় টাল খেয়ে জলে পড়ে গেল। হার্ট এ্যাটাক্ হয়েছে তাঁর।

কাতসুয়ো কান্না জুড়ে দিয়েছে। একটি যুবক দৌড়ে কাছে আসলো। অন্যান্যরাও চড়ার মধ্য দিয়ে ছুটে আসলো। গলা-উঁচু ঢেউ তাঁদের কালো নগ্ন দেহে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছিল।

দু'একজন ইয়াসুকে পড়তে দেখে তেমন গা করল না। তারা ভেবেছে ও আর এমন কি—পড়ে গেছে, এখুনি উঠে যাবে। কিন্তু এ-রকম অবস্থায় বিপদের কথাটাই সবার আগে মনে আসে। ছুটে-আসা লোকগুলোরও মনে হয়েছিল এই হঠাৎ জলে পড়ে যাওয়াটা যেন স্বাভাবিক নয়। ইয়াসুকে ধরাধরি করে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দেওয়া হ'ল। দাঁতকপাটি লেগে গেছে, চোখ দুটো খোলা। আতঙ্ক-ভরা চোখে তাঁর সামনে কি একটা জিনিসের দিকে যেন তাকিয়ে আছে। ওদেরই মধ্যে একজন ওর নাড়ী টিপলো কিন্তু কোন স্পন্দন পাওয়া গেল না।

একটি লোক ইয়াসুকে চিনতে পেরে বললো—"ভদ্রমহিলা ইরাকুসো-তে থাকেন।"

ম্যানেজারকে এখনই ডাকা উচিত। ফর্মান জারী হ'তে না হ'তেই গ্রামের একটি লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে উত্তপ্ত বালুরাশির মধ্য দিয়ে সরাইখানার দিকে ছুটলো

পাছে অন্য আর কেউ এই কর্তব্যকর্মে ভাগ বসায়।

ম্যানেজার এলেন। বছর চল্লিশেক বয়স। পরনে একটা হাফপ্যান্ট ও টি-সার্ট। একটা উলের ফিতে কোমড়ে জড়ানো। সে বলল—ফার্স্টএড সরাইখানাতেই হবে। কেউ কেউ আপত্তি জানালো। কিন্তু বাদানুবাদের অপেক্ষা না করে ত্ব'টি যুবক ইয়াস্থকে সরাইখানার দিকে বয়ে নিয়ে চলল। তাঁকে যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সেখানকার ভিজে বালির উপর দেখা গেল একটা মানুষের দেহের ছাপ। ক্রন্দনরত কাতস্থয়ো পিছু পিছু চলছিল। একটি লোক তাকেও তুলে নিল।

তোমোকোকে ঘুম থেকে জাগানো হ'ল। অভিজ্ঞ ম্যানেজার তাঁকে খুব আস্তে আস্তে ঠেলছিল। উঠেই তোমোকো জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার'? ম্যানেজার বলল—"ইয়াস্থ নামে এক ভদ্রমহিলা…।"

"কী হয়েছে তাঁর?"

ম্যানেজার—"আমরা তাঁকে ফার্স্ট এড্ দিয়েছি। ডাক্তার এসে পড়ল বলে।"

তোমোকো লাফিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি ম্যানেজারের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। লনে দোলনার পাশে ইয়াস্থকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি নগ্নপ্রায় লোক পা ফাঁক করে, হাটু গেড়ে বসে ইয়াস্থকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করছে। একপাশে খড়ের গাদা ও কমলালেবু রাখার কতকগুলো ভাঙ্গা কাঠের বাক্স স্তূপীকৃত। ওখানটায় দুটো লোক আগুন জালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আগের দিন রাতে জলে-ভেজা কাঠগুলো আগুনের ছোঁয়া পেয়ে ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করল। কিছুটা ইয়াস্থর মুখের দিকে যেতেই তৃতীয় আর একটি লোক পাখা চালিয়ে তা তাড়িয়ে দিল।

ইয়াস্থ শুয়ে আছে—চোখ খোলা, যেন এক লহমায় গোটা পৃথিবীটাকে দেখে নিচ্ছে। মনে হ'ল যেন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। গাছের মাঝ দিয়ে গলে আসা সূর্যের আলোয় অর্ধ উলঙ্গ লোকটির ঘর্মাক্ত কালো পিঠটা চকচক করছিল। ঘাসের উপর ছড়ানো ইয়াস্থর মোটা থলথলে পা দু'টো চকখড়ির মতো সাদা। ওরা জানে না দেহের উপরিভাগে কি যুদ্ধই না চলছে!

ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে বসে তোমাকো আস্তে আস্তে ডাকে—"ইয়াস্থ! ইয়াস্থ!" ওরা কি ইয়াস্থকে বাঁচাতে পারবে? কেন এমনটা হ'ল? স্বামীকেই বা সে কী বলবে?—তোমোকো কাঁদে আর একটার পর একটা প্রশ্ন আউড়ে যায়। হঠাৎ লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, "বাচ্চারা সব কোথায়?"

একটি মাঝবয়েসী জেলে ভীত সন্ত্রস্ত কাতসুয়োকে হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে এসে বলে, "ঐ দেখ তোমার মা-মণি এখানে।" তোমোকো ছেলের দিকে তাকায়, মাথা নেড়ে জেলেটিকে ধন্যবাদ জানায়।

ডাক্তার এসে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। পাশের জলন্ত আগুনের আভায় তোমোকোর গাল দুটি রক্তিম, সে উন্মনা। হঠাৎ ছোট্ট একটা পিঁপড়ে ইয়াসুর মুখ বেয়ে উঠতেই সে তাকে পিষে মেরে ছুড়ে ফেলে দেয়। চুল বেয়ে কানের দিকে ধাবমান আর একটা পিঁপড়েকেও সেই একই ভাবে মেরে ফেলে। পিঁপড়ে মারা ছাড়া তোমোকোর আর কোন কাজ নেই।

চার ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও তেমন কিছু সুবিধে হ'ল না। শরীরটা কঠিন হয়ে যেতেই ডাক্তার জবাব দিলেন। একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে ইয়াসুর দেহটাকে তিনতলায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। ঘরটা অন্ধকার থাকায় একটা লোক তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিল।

ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত তোমোকোর মনে একটা বিরাট শূন্যতা। একটুও দুঃখবোধ হ'ল না তাঁর। হঠাৎ ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে গেল। "তাই তো! ওরা কোথায়? গেঙ্গোর সঙ্গে খেলাঘরে নয় তো? তিনজনেই? লোকগুলো একে অন্যের দিকে তাকায়। ওদের ধাক্কা মেরে তোমোকো সোজা নীচের তলায় নেমে আসে। সুতির একটা সার্ট পরে গেঙ্গো জেলেটি তখন কাতসুয়োর সঙ্গে সোফায় বসে একটা ছবির বই উল্টোচ্ছিল। কাতসুয়োর মন কিন্তু ছবিতে নেই—ওদিকে মোটেই তাকাচ্ছে না। সমুদ্র তীরের বিয়োগান্ত নাটকের প্রত্যক্ষদর্শীরা তোমোকোকে ঢুকতে দেখে পাথা বন্ধ ক'রে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো। কাতসুয়োর উপর নিজেকে প্রায় ছুড়ে দিয়ে তোমোকো বললো—"কিউ ও কিকো কোথায়?" তাঁর গলা দিয়ে একটা কর্কশ আওয়াজ বেরোয়। ভীতবিহ্বল কাতসুয়ো মায়ের দিকে তাকিয়ে কেঁদে বলে—"তিউ, তিতো······দল।" তৎক্ষণাৎ খালি পায়েই তোমোকো সৈকতের দিকে ছোটে। পাইনকুঞ্জের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় তীক্ষ্ণ সরু ডালগুলো তাঁর দেহকে সূচিবিদ্ধ করে। জোয়ার আসায় সৈকতের দিকে যেতে পাহাড়টার উপর তাঁকে উঠতে হ'ল। বিস্তৃত সাদা বেলাভূমি নীচে। পড়ন্ত বেলায়ও তাঁর দৃষ্টি বহু দূর চলে গেল, দেখতে পেল সাদায়-হলুদে মেশানো তাঁর ছাতাটা পড়ে আছে।

পেছনে দৌড়ে-আসা লোকগুলি তাঁকে ধরে ফেলে। ফেনিল নীল জলের মধ্য দিয়ে ছুটতেই লোকগুলো তাঁকে থামাতে চেষ্টা করে। বিরক্তিভরে

তাঁদের ঠেলে ফেলে দিয়ে তোমোকো বলে—"আপনারা কেন বুঝছেন না দুটি শিশু ওখানে রয়েছে ?" ওদের মধ্যে গেঙ্গোর কাছ থেকে যারা দুর্ঘটনার পুরো কাহিনী শুনে আসেনি তারা ভাবলো ভদ্রমহিলা একটি আস্ত পাগল।

আশ্চর্য, গত চার-ঘণ্টায় ছেলে মেয়ে দুটি সম্বন্ধে কারুর মনে কোন প্রশ্ন জাগে নি। সরাইখানার লোকেরা তিনটে বাচ্চাকে একত্র দেখতেই অভ্যস্ত। তোমোকো যতই উতলা হোক না কেন ভাবতে অবাক লাগে তাঁর মাতৃহৃদয় সন্তানদের এই মর্মন্তুদ মৃত্যুর কোন পূর্ব সংকেত পায় নি।

অনেক সময় এধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন জন্ম নেয় যা সবার মনকে একই ভাবনায় ভাবিয়ে তোলে। এর থেকে দূরে থাকা যেমনি অসম্ভব তেমনি একে সরাসরি অস্বীকার করাও দুঃসাধ্য। ঘুম থেকে উঠে লোকের মুখে শোনা কাহিনীটুকুই তোমোকো বিশ্বাস করেছে, কোন প্রশ্ন করার কথা ভাবে নি।

সেদিন সারারাত ধরে আগুন জালিয়ে সৈকতের জায়গায় জায়গায় বাচ্চা দুটির খোঁজ চললো। কয়েকজন উৎসাহী যুবক প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ডুবে ডুবে ওদের খুঁজতে লাগলো। তোমোকোও ওদের সঙ্গে ছিল। তার একেবারে ঘুম হ'ল না। সম্ভবতঃ দুপুরকার একটানা দীর্ঘ ঘুম এর জন্য অংশত দায়ী। পুলিশের পরামর্শে পরের দিন জাল ফেলা হ'ল না।

ভোর হ'তেই তোমোকোর ভয় হ'ল। সৈকতের বা-দিকের অন্তরীপটির উপর দিয়ে সূর্য উঠেছে। ভোরের বাতাস তোমোকোর মুখে আঘাত হানলো। দিনের আলোয় এবার মর্মান্তিক সত্যিটা প্রকাশ পাবে। তার সন্তান দুটির মৃত্যু এই সর্বপ্রথম রূঢ় বাস্তব হয়ে দেখা দেবে।

একজন বৃদ্ধ কাছে এসে বল্লে—"মা, তুমি বরং একটু বিশ্রাম নাও। কোন কিছুর সন্ধান পেলেই আমরা তোমাকে জানাবো। আমাদের উপর সব ছেড়ে দাও।" ম্যানেজারও তাঁর কথায় সায় দিয়ে বল্লে—"হ্যাঁ, তাই করুন। আপনার উপর দিয়ে দস্তুরমতো একটা ঝড় বয়ে গেছে। অসুস্থ হ'য়ে পড়লে আপনার স্বামী চারদিক সামলাবেন কী করে ?"

স্বামীকে তোমোকোর ভারী ভয়। তার সাথে দেখা হওয়া মানে কড়া বিচারকের সম্মুখীন হওয়া। কিন্তু দেখা তাকে করতেই হবে—আর সে সময়ও দ্রুত এগিয়ে আসছে। সে নতুন আর একটা বিপদের মুখোমুখি। সে সাহসে ভর ক'রে উঠে দাঁড়ালো—একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। পালাবার একটা অজুহাত মিলে গেল। কিছু দূর যেতেই তাঁর মনে হ'ল ডুবুরীদের

সন্ধানী দৃষ্টি যেন তাঁকে পেছন থেকে তাড়া করছে। ঘাড় ফিরে পেছন পানে একবার তাকিয়েই সে আবার চলতে শুরু করল।

সমুদ্র এখন শান্ত। তীরের কাছে একটা রূপালী আলোর ঝল্‌কানি খেলে গেল যেন। মাছগুলো লাফিয়ে পড়ছে—কতই না আনন্দ ওদের! শুধু তোমোকোই নিরানন্দে থাকবে এটা বড় অন্যায়।

তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক স্বামী মাসারু বিদেশী ভাষায় টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। যুদ্ধের আগে কী একটা আমেরিকান কোম্পানীতে চাকরি নেয়। ইংরেজী ভাষায় দখল মোটামুটি ভালই। বাইরে শান্তভাব দেখে তাঁর অসাধারণ কর্মপটুতা বোঝার সাধ্যি নেই। এখন সে একটা আমেরিকান মোটর কোম্পানীর জাপানী শাখার ম্যানেজার। মাস মাইনে ১৫০,০০০ ইয়েনের সঙ্গে সর্বদা অফিসের কাজের জন্য একটা গাড়ী। এ-ছাড়া বাড়তি রোজগারেরও একটা পথ ছিল যা দিয়ে নিজের, বাচ্চাদের, তোমোকোর, ইয়াসুর মায় বাচ্চাদের জন্য নিযুক্ত ঝি-টার পর্যন্ত ভরণপোষণ বেশ ভাল-ভাবেই চলে যেত। পরিবারের সংখ্যা মাত্র তিনজনে সীমিত করার কোন আশু প্রয়োজন তাঁর ছিল না।

টেলিফোনে মাসারুর সঙ্গে কথা বলতে অনিচ্ছুক তোমোকো একটা টেলিগ্রাম করে। নিয়মমাফিক পোষ্ট অফিস তাঁর বক্তব্য টেলিফোন মারফত মাসারুকে জানিয়ে দিল। বার্তা যখন পৌছালো তখন সে অফিসে যাওয়ার তোড়জোড় করছে। ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন কিছু হবে ভেবে মাসারু টেলিফোন তুললে পোষ্ট অফিস থেকে একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সে বলল—"'এ' সৈকত থেকে আপনার একটা জরুরী টেলিগ্রাম আছে। আমি পড়ে যাচ্ছি, আপনি প্রস্তুত তো? তবে শুনুন—ইয়াসু মারা গেছে, কিউ ও কিকো-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তোমোকো।"

মাসারু আর একবার টেলিগ্রামটা পড়ার অনুরোধ করে কিন্তু ওই একই উত্তর ভেসে আসে—"ইয়াসু মারা গেছে, কিউ ও কিকো-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তোমোকো।" সে তৎক্ষণাৎ অফিসকে জানিয়ে দিল কাজে সে যাবে না। সরাসরি 'এ' সৈকত-এ যাওয়ার কথা ভাবলো। কিন্তু পথ যেমন দীর্ঘ তেমন বিপজ্জনক। এতই ঘাবড়ে গেল সে যে নিজে গাড়ী চালিয়ে যেতে পারবে এমন সাহস তার হ'ল না। বস্তুতপক্ষে কিছুদিন আগে একটা অ্যাকৃসিডেন্টের হাত থেকে সে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো ইতো পর্যন্ত ট্রেনে যাবে, তারপর ট্যাক্সিতে।

যে নিয়মের মাধ্যমে অজ্ঞাত ঘটনা মানুষের চেতনার স্তরে আঘাত হানে তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি সূক্ষ্মও বটে। দুর্ঘটনাটাকে সম্পূর্ণ আঁচ করতে না পারলেও বেড়োবার আগে সে বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিল। বিপদের দিনে টাকার প্রয়োজনই তো সবচেয়ে বেশী।

টোকিও ষ্টেশনে যাবার জন্য সে একটা ট্যাক্সি নিল। আবেগ বলতে যা বোঝায় সে রকম কোন অনুভূতি তার হ'ল না। তার মনের অবস্থা অনেকটা ডিটেকটিভের মতো—যেখানে অপরাধ সংঘটিত হ'য়েছে সেখানে সর্বপ্রথম যাওয়া। যতটা না কল্পনা তার চেয়ে বেশী দুর্ঘটনার কার্যকারণ জানার জন্য সে উদ্গ্রীব। এ এমন একটা ব্যাপার যার সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মনে মনে বলল—তোমোকো অনায়াসে একটা টেলিফোন করতে পারতো। না করার মানেই সে আমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। স্বামীর স্বতঃলব্ধ জ্ঞান দিয়ে সে আসল সত্যিটা অনুধাবন করল। "কিন্তু আমার প্রথম কর্তব্য সরেজমিনে তদন্ত।"

ট্যাক্সি শহরে ঢুকতেই সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। সাদা পোশাক পরা জনসমুদ্র চোখ ধাঁধানো সূর্যের আলো-কে আরও প্রখর ও তীব্রতর করে তুলেছে। পথের পাশে গাছগুলো নীচে লম্বা ছায়া ফেলেছে। হোটেলের প্রবেশ-পথে লাল-সাদায় মেশানো আটোসাটো চকচকে চন্দ্রাতপের ওপর বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মিকে কোন ভারী ধাতুর মত দেখতে লাগছে। রাস্তাটাকে যেখানে মেরামত করা হচ্ছে সেখানে সদ্য-কাটা মাটি শুকিয়ে ধূলোয় পরিণত হয়েছে।

মাসারুর চারদিকের পৃথিবী আগে যেমনটা ছিল এখনও ঠিক তাই-ই আছে। কিছুই ঘটেনি। এমন কি সে যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করত তবে এ-বিশ্বাসও হয়তো বা জন্মাত যে তার নিজের জীবনেও তেমন কিছু ঘটে নি। একটা শিশু সুলভ বিরক্তি তার মনকে ছেয়ে ফেলল। অজানা জায়গায় একটা ঘটনা ঘটে গেছে যার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই—যা তাকে বৃহত্তর পৃথিবী থেকে আলাদা করে রেখেছে।

যাত্রীদের মধ্যে তার মতো অভাগা আর কেউ নেই এই ভাবনাটা তাকে মাসারু নামে অতি সাধারণ লোকটার উপরের স্তরে কি নীচের স্তরে ঠেলে দিয়েছে সে ঠিক বুঝতে পারে না। সে যেন আলাদা একটা সত্তা, সবার মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা। সন্দেহ নেই, পিঠে বড় জন্মচিহ্ন নিয়ে যারা এ পৃথিবীতে এসেছে তাঁদের অনেকেরই কোন না কোন সময় চীৎকার করে

বলতে ইচ্ছে করে—"সবাই শোনো, জানো কি আমার পিঠে বড় মতো বেগুনী রঙের একটা জরুল আছে?" মাসারুও তাঁদের মত চীৎকার করে যাত্রীদের বলতে চায়—"শোনো, তোমরা জানো কি আমি আমার বোন ও দুটি শিশু সন্তানকে সদ্য হারিয়েছি?"

তাঁর সমস্ত সাহস উবে গেল। অন্ততপক্ষে বাচ্চাগুলোও যদি নিরাপদে থাকতো…। টেলিগ্রামটার নতুন ব্যাখ্যায় সে মন দিল। আচ্ছা, এমনও তো হ'তে পারে ইয়াসুর মৃত্যুতে শোকাহত হ'য়ে তোমোকো ভেবেছে তাঁর বাচ্চা দুটোও মরেছে অথচ প্রকৃতপক্ষে ওরা পথ হারিয়েছে মাত্র? এ-ও তো হ'তে পারে দ্বিতীয় একটা টেলিগ্রাম হয়তো এতক্ষণে পৌঁছেছে? মাসারু তাঁর ভাবনা নিয়ে এতই ব্যস্ত যেন তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়াটা প্রকৃত ঘটনার চেয়েও অনেক বড়। মনে অনুতাপ হ'লো সোজা 'ইরাকুসো'-তে যায়নি বলে।

ইতো স্টেশনের খোলা চত্বরটা রৌদ্রে ঝলমল করছে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে ছোট একটা অফিস। মাসারু জিজ্ঞেস করল, 'এ' সৈকত-এ যেতে কত লাগবে?

"দু' হাজার ইয়েন।"

গলায় তোয়ালে বাঁধা ও মাথায় টুপি পরা লোকটা বলল, "তেমন তাড়া না থাকলে আপনি অবিশ্যি বাসেও যেতে পারেন, কম টাকায় হবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাস ছাড়ছে।"

"না, না, আমার খুবই তাড়া। পরিবারের একজন ওখানে মারা গেছেন।"

"ওখানে যারা জলে ডুবে মরেছে আপনি তাঁদের আত্মীয়? শুনেছি দু'টো বাচ্চা ও এক ভদ্রমহিলা একই সঙ্গে মারা যান। খুবই দুঃখের ব্যাপার।"

জ্বলন্ত সূর্যের আলোয় মাসারুর মাথাটা ঘুরে যায়। 'এ' সৈকত-এ না পৌঁছানো পর্যন্ত ড্রাইভারের সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

সারা পথে বিশেষ কোন মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ল না। ট্যাক্সিটা প্রথমে একটা ধুলোয়-ভরা পাহাড়ে উঠে আবার নীচে নেমে গেল। একটা সরু রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য একটা গাড়ী তাঁদের পাশ কাটিয়ে যেতেই ধুলোয় ভরা গাছের ডাল মাসারুর ট্যাক্সির আধ-খোলা জানালায় ধাক্কা মারলো। তাঁর কড়া ইস্তিরির সার্ট ধুলোয় নষ্ট হ'ল।

মাসারু ভেবে পায় না কী করে স্ত্রীর মুখোমুখি হবে। স্বতঃস্ফূর্ত আলাপ চালানোর বিশেষ কোন পদ্ধতি আছে কি না তা তার জানা নেই। সঞ্চিত ভাবাবেগের কোনটাকেই সে যেন এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে

পারছিল না। সম্ভবত অস্বাভাবিকতাই হ'ল আসল স্বাভাবিকতা।

ট্যাক্সি অন্ধকারে ঘেরা 'ইরাকুসো'-র গেটে ঢুকে পড়লো। গাড়ি বারান্দায় আসতেই ম্যানেজার বেরিয়ে এলেন। মাসারুর হাত তখন পকেটে টাকার ব্যাগের দিকে চলে গেছে।

মাথা নুয়ে অভিবাদন জানিয়ে ম্যানেজার পরিচয় দিল—"আমি ইকুতা, সাংঘাতিক ব্যাপার।" ড্রাইভারকে বিদায় করে মাসারু ম্যানেজারের হাতে একহাজার ইয়েনের একটা নোট গুঁজে দিল।

ইয়াসুর মৃতদেহ যেখানে রাখা হয়েছে তারই একটা লাগোয়া ঘরে তোমোকো ও কাতসুয়ো এখন থাকছে। ইতু থেকে আনা শুকনো এক ধরনের বরফে মৃতদেহটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। মাসারু আসায় এবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ম্যানেজারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাসারু তোমোকোর ঘরের দরজায় টোকা মারলো। সে ঘুমোবার মতলব করছিল। দরজার শব্দ কানে যেতেই চকিতে উঠে দাঁড়ালো। চুলগুলো জটপাকানো পরনে কোচকানো সুতির একটা পোশাক বা কিমোনো। সে কাপড়টাকে দু'পাশ থেকে সামনে টেনে এনে দাগী আসামীর মতো স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হ'য়ে বসল। তাঁর চলার ধরন আশ্চর্যজনক ভাবে ক্ষিপ্র, যেন আগে থেকে মহড়া দেওয়া। আড়চোখে স্বামীর দিকে চেয়েই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। ম্যানেজারের সামনে স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেওয়াটা মাসারুর কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হ'ল না। কেননা শয়নঘরের গোপনতার উপর গোয়েন্দাগিরি করার চেয়েও এটা বেশী দোষনীয়। কোট খুলে সেটাকে ঝুলিয়ে রাখবার জায়গা সে খুঁজছে দেখে তোমোকো তাড়াতাড়ি একটা নীল হ্যাঙ্গার এনে ঘামে-ভেজা কোটটা ঝুলিয়ে রাখল। মায়ের কান্নায় সন্ত্রাগ্রত ছেলেকে মাসারু কাছে টেনে নেয়। নিশ্চল পুতুলের মতো সে তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে। মাসারুর ভেবে অবাক লাগে শিশুরা এত ছোট্ট হয় কী করে? কাতসুয়োকে একটা পুতুল বলে ভ্রম হয়।

ঘরের এককোণে নতজানু হ'য়ে তোমোকো কেঁদে বলে—"সব দোষ আমার।" মাসারু ঠিক ঐ কথাটাই তাঁর মুখ থেকে আশা করেছিল।

পেছনে দণ্ডায়মান ম্যানেজারের চোখেও জল। সে মাসারুকে বললো—"আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই জেনেও বলছি স্যার, মিসেস ইকুতার কোন দোষ নেই। দুর্ঘটনার ব্যাপারে উনি আদৌ জানতেন না, উনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন।" মাসারুর মনে হ'ল এ-রকম কথা সে

যেন কোথাও শুনেছে অথবা পড়েছে। উত্তর বলে—"জানি"। কাতসুয়োকে কোলে নিয়ে অনেকটা নিয়ম রক্ষার খাতিরে সে তোমোকোর কাঁধে হাত রাখে। তোমোকোর কান্নার বেগ বেড়ে যায়।

সারাটা সৈকত পাতা পাতা ক'রে খুঁজে পুলিশ পরের দিন কিউ ও কিকোর মৃতদেহ দু'টোর হদিশ পায়। সমুদ্রকীট ওদের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দু'একটাকে ওদের নাকের মধ্যেও পাওয়া গেল।

এ-ধরনের ঘটনা অবশ্য সামাজিক বাধানিষেধের অনুশাসন না মানলেও দেখা যায় যে ঠিক এই সময়েই লোকে যেন ওগুলোকে বেশী ক'রে আঁকড়ে থাকতে চায়। লোকেদের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য ও তার প্রতিদানে সামাজিক প্রথানুসারে সৌজন্যমূলক উপহার প্রদানের কথা স্বামী-স্ত্রী কেউ-ই ভোলে না।

এ-জাতীয় ঘটনা সরকারের পক্ষে সব সময়েই একটা সমস্যা। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই এ-ব্যাপারে ব্যস্ত—বিশেষ ক'রে পরিবারের প্রধান হিসেবে মাসারুর তো [illegible] ফেলার সময় নেই। দুঃখ করার মতো সময় কোথায় তাঁর? কাতসুয়োর কাছে এ-ব্যাপারটা একটা উৎসবের পর আর একটা উৎসব আসার মতো।

যা হোক, এই জটিল সমস্যাটাও ক্রমশ আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জলের মতো টাকা খরচ হ'ল। পরিবারের প্রধান যেখানে জীবিত ও সক্ষম সেখানে তাঁর নিজের বেলায় আত্মীয়েরা যতটা না খরচ করতো তার চেয়ে বেশী খরচই সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে হ'য়ে থাকে। কি করতে হবে না হবে সব কাজেই স্বামী-স্ত্রীর একটা নিস্পৃহ মনো[illegible]বের পরিচয় পাওয়া গেল—বিশেষ ক'রে তোমোকো তো আদৌ বুঝতেই পারল না যে একদিকে গভীর দুঃখ ও অন্যদিকে দুর্ঘটনার প্রতিটি খুঁটিনাটি তাঁর মনে কী করে একত্রে সহাবস্থান করছে। এও ভেবে পেল না যে খাদ্যবস্তুর প্রকৃত স্বাদ না বুঝেও আহারে তাঁর রুচি বেড়ে গেল কি করে?

সবচেয়ে যে ভয়টা তোমোকোকে পেয়ে বসেছে সেটা হ'ল শ্বশুর শাশুড়ীর মুখোমুখি হওয়া। তাঁরা খবর পেয়েই দেশের বাড়ি থেকে ছুটে এসেছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্য। সে বলল—"সব দোষ আমার।" অনেকটা দোষক্ষালনের জন্য সে তার বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—"আমি কি বুঝি না কার জন্য ওদের দুঃখটা সবচেয়ে বেশী? কেন, আমিও কি দুটি সন্তানকে হারাই নি? ওরা সবাই আমাকে দুষছে, সমস্ত দোষ আমার কাঁধে

চাপাতে চাইছে। আর আমাকেও বারবার ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে। ওরা বলতে চায়, আমি যেন অমনোযোগী একজন আয়া—ভুল ক'রে বাচ্চা দুটোকে নদীতে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। কিন্তু ইয়াসু প্রকৃত দোষী নয় কি? ওর ভাগ্যি ভালো, মরে বেচেছে। কেন ওরা বুঝতে পারে না দুঃখটা আমার বুকেই বেশী বাজছে? কেন বুঝতে চাইছে না সন্তান দুটিকে আমি চিরদিনের মতো খুইয়ে বসে আছি?"

"এটা তোমার ভারী অন্যায়। তোমাকে তো কেউ দুষছে না। কেন, তোমার শাশুড়ী তো কেঁদে কেঁদেই বললেন সবার চেয়ে তোমার জন্যই তাঁর দুঃখটা বেশী."

"ওটা কথার কথা।"

তোমোকো খুসী হ'তে পারল না। মনে হ'ল তার পদাবনতি হয়েছে—আসল মূল্য যাচাই না ক'রে তাকে একপাশে অবজ্ঞাভরে ফেলে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর দুঃখ কিছু লোককে খবরদারী করার সুযোগ এনে দিয়েছে। অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও সে শাশুড়ীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। সারা গায়ে অসহ্য চুলকানির মতো যন্ত্রণাটা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন নিজের অজ্ঞাতেই সে তার মা'র কাছে ছুটে গেল। কাজটা খেয়ালবশে করলেও মানুষের মনে ভাবের দৈন্যতাই তাকে হতাশ করল বেশী। একটা মৃতের জন্য একটা লোকের কান্নার মতোই দশটা মৃতের জন্য কান্না ছাড়া আব কিছুই করাব নেই এটা অযৌক্তিক নয় কি?

তোমোকো ভেবে আশ্চর্য হয় সে মূর্চ্ছা যায় নি কেন? মনে পড়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কড়া রোদ্দুরে ঠায় একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও সে মূর্চ্ছা যায় নি। সময় সময় সে-রকম অনুভূতি হ'লেও মৃত্যু বিভীষিকা প্রতিবারেই তাকে সজাগ ক'রে দিয়েছে। জল-ভরা চোখে তার মাকে তোমোকো বললো—"নিজেকে যতটা শক্ত ভেবে এসেছি তার চেয়েও আমি বেশী শক্ত"। বাবা-মায়ের সাথে কথা বলার সময় মাসারু বোনের জন্য কাঁদে। তোমোকোর মোটেই ভাল লাগে না। সে যেন প্রশ্ন করতে চায় ইয়াসু ও সন্তানদের মধ্যে কে তাঁর কাছে বেশী প্রিয়। সব সময় একটা সচকিত, চাপা উত্তেজনার ভাব তাঁর। রাতে ঘুমোতে পারে না যদিও বোঝে ঘুমটা একান্ত দরকার। মাথা ধরার কোন লক্ষণ তার নেই। মনটা পরিষ্কার কিন্তু কুলিশ কঠিন। প্রতিবেশীরা সমবেদনা জানাতে আসলে সে বিরক্ত বোধ করে। কতকটা অভদ্র ভাষায়ই বলে ফেলে—"আমার সম্বন্ধে কারুর কোন চিন্তার দরকার নেই। আমি জীবিত কি মৃত

তাতে কিছু আসে যায় না।”

আত্মহত্যার চিন্তা ও পাগলামী সে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। কাতসুয়োর জন্যই তাকে বাঁচতে হবে। সময় সময় ভাবে হয়তো তার সাহসের অভাব অথবা তার আসক্তিটা প্রবলভাবে মার খেয়েছে। যাই হোক না কেন, কাতসুয়োর দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল না মরে সে ভালই করেছে। স্বামীর হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে সে বেড ল্যাম্পের বিচ্ছুরিত আলোর দিকে খরগোশের মত বড় বড় চোখে বার বার তাকায়। যেন মিনতির সুরে বলে—“আমারই ভুল, দোষটা আমারই। প্রথম থেকেই বোঝা উচিত ছিল ইয়াসুর কাছে বাচ্চা তিনটিকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই উচিত হয় নি।” তার কণ্ঠস্বর পর্বতগুহায় প্রতিধ্বনি যাচাই করার কণ্ঠস্বরের মতই ফাঁকা। দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে তোমোকোর এই অদ্ভুত সচেতনতার মানে কী 'তা' মাসারু ভাল করেই অনুধাবন করল। তোমোকো এক ধরনের শাস্তির জন্য উন্মুখ—বরং বলা চলে লোভাতুর হ'য়ে আছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চৌদ্দ দিন বাদে জীবন আবার স্বাভাবিক খাতে ফিরে এল। অনেকে পরামর্শ দিলেন বেড়িয়ে আসতে। কিন্তু কোন পার্বত্য জায়গা অথবা সমুদ্রতীরের কথা মনে হতেই তোমোকো শিউরে উঠলো। তার বদ্ধ ধারণা হয়েছে দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না।

একদিন বিকেলে সে কাতসুয়োকে নিয়ে শহরে বেড়িয়ে পড়লো। স্বামীর অফিসের কাজের শেষে একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে ডিনার খাবে। বাবা, মা কাতসুয়োর কোন অভাব অপূরণ রাখেনি। তার প্রতি উভয়ের যত্নের আতিশয্য প্রায় অস্বস্তিকর বললেই চলে। তারা তাকে এত আদরে রাখলো যেন সে একটা কাঁচের পুতুল। তাকে রাস্তা পার করানোটাও তাদের কাছে রীতিমত একটা বড় কাজ। ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য অপেক্ষারত গাড়ী ও ট্রাকের দিকে তোমোকো তাকিয়ে থাকে, তারপর ছেলের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে দৌড়ে রাস্তা পার হয়।

দোকানের জানালায় সাজানো সর্বশেষ ‘সামার স্যুটটা’ তাকে রীতিমতো আক্রমণ করল বলা চলে। ওটা দেখতে অবিকল ইয়াসুর সবুজ স্যুটটার মতো। তোমোকো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তারপরেই মনে হ'ল পোষাক-পরা পুতুলটার মাথাটা ছিল কী? কখনও মনে হ'ল ছিল, কখনও মনে হ'ল ছিল না। ওর মুখটা ইয়াসুর মরা মুখের মত দেখতে। তোমোকোর কাছে সব পুতুলগুলিই জলে-ডোবা এক একটা শব যেন। আহা, গ্রীষ্মটা যদি চলে যেত! এই ‘গ্রীষ্ম’

শব্দটার মধ্যে লুকিয়ে আছে মৃত্যু-ভাবনা। অপরাহ্নের সূর্যের আলোতেও সে একটা ভ্যাপসা গরম অনুভব করল।

একটু আগে বেরিয়ে পড়ায় তোমোকো একটা দোকানে ঢুকে পড়ে। বন্ধ হ'তে আধ ঘণ্টার মত বাকী ছিল। পুতুল দেখার বায়না ধরলে সে কাতসুয়োকে নিয়ে চারতলায় উঠে গেল। কতগুলো খেলার জিনিস পেরিয়ে এগিয়ে যেতে দেখতে পেল কয়েকজন ভদ্রমহিলা বাচ্চাদের স্নানের পোষাকের তাড়া উল্টেপাল্টে দেখছে। একটি ভদ্রমহিলা একজোড়া ঘন নীল প্যান্ট জানালার দিকে উঁচু ক'রে পরীক্ষা করছে। বোতামগুলি থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছিল তোমোকোর মনে হ'ল ভদ্রমহিলা যেন আগ্রহসহকারে একটা শবাচ্ছাদন দেখছে।

কাঠের পুতুল কেনা হয়ে গেলে কাতসুয়ো ছাদে যেতে চাইলো। ওখানে খেলবার জায়গাটা ঠাণ্ডা। বন্দর থেকে জোরে বয়ে-আসা বাতাস চন্দ্রাতপটার উপর আঘাত হানছিল। তোমোকো জালির মধ্য দিয়ে শহরের অদূরে কাচি-ডোকি পুল, সুকিসিমা ডক ও উপসাগরে নোঙ্গর করা জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

মা'র হাত ছাড়িয়ে কাতসুয়ো বানরের খাঁচার দিকে গেল। সম্ভবত বাতাসের জন্যই বানরের গায়ের বোটকা গন্ধটা একটু তীব্র অনুভূত হ'ল। জানোয়ারটা কপাল কুচকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। যখন হাঁটুতে একটা হাত রেখে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফাচ্ছিল তখন বানরটার বুড়ো মুখটার একপাশে নোংরা কানের ভেতর দিয়ে লাল রগগুলো তোমোকো স্পষ্ট দেখতে পেল। আগে কখনও সে এত মনোযোগ দিয়ে কোন জন্তু-জানোয়ার দেখে নি।

খাঁচাটার পাশে ছোট্টমতো একটা পুকুর। ওর মাঝখানের ফোয়ারাটাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ইটের বেড়ের চারদিকে একজাতীয় ফুলের বাগিচা। কাতসুয়োর বয়েসী একটি ছেলে ইটের বেড়ের উপর দিয়ে বিপজ্জনকভাবে চলাফেরা করছে। ওর বাবা-মাকে ধারে কাছে দেখা গেল না।

"ছেলেটা জলে পড়ে না কেন? পড়ুক, ডুবে যা'ক।"

তোমোকো ওর টলায়মান পা-দুটোকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ছেলেটা জলে পড়লো না। ইটের বেড়টা একবার চক্কর দিয়ে আসতেই বাচ্চাটা দেখলো তোমোকো এক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। একটু হাসলো। কিন্তু তোমোকোর মুখে কোনো হাসি নেই। মনে হ'ল বাচ্চাটা যেন তাকে বিদ্রূপ করছে। সে কাতসুয়োর হাত ধরে ছাদ থেকে নীচে নেমে এল।

খাবারের টেবিলে অনেকক্ষণ বাদে তোমোকো তার স্বামীকে বললো—"তোমাকে বেশ শান্ত দেখাচ্ছে, মনে কোন দুঃখ আছে কিনা বোঝবার উপায় নেই।"

চমকে গিয়ে মাসারু চারিদিক তাকিয়ে দেখে কেউ কথাটা শুনলো কি না। বলল: "আমার কর্তব্য তোমাকে আনন্দ দেওয়া।"

"তার কোন দরকার নেই।"

"তুমি তো বললে দরকার নেই কিন্তু কাতসুয়োর উপর প্রতিক্রিয়া কী হবে ভেবে দেখেছো?"

"যাই বল না কেন, আমি মা হবার অযোগ্য।"

ডিনার মাঠে মারা গেল।

স্ত্রীর দুঃখ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবার একটা প্রবণতা মাসারুর মধ্যে দেখা গেল। পুরুষ মানুষের কাজ করতে হয় এবং এই কাজের মধ্যেই সান্ত্বনা মেলে। কিন্তু তোমোকো? সে দুঃখের বোঝা বয়েই চলেছে। অফিস থেকে এসে প্রতিদিন এই একঘেয়ে অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয় বলে মাসারু রাত্রি করে বাড়ি ফিরতে শুরু করল।

তোমোকো তার আগেকার চাকরানীকে ডেকে বাচ্চাদের সব জামা ও খেলনাগুলো দিয়ে দিল। ওরও সমবয়েসী বাচ্চা ছিল।

একদিন সকালে তোমোকো একটু দেরীতে ঘুম থেকে উঠল। বিছানার এক পাশে মাসারু গুটি মেরে শুয়েছিল। আগের দিন রাতে সে মদ খেয়েছে, মুখে এখনও গন্ধ। ঘুমের মধ্যে সে পাশ ফিরলে খাটের স্প্রিংটায় আওয়াজ হ'ল। কাতসুয়ো একা পড়ে যাওয়ায় তোমোকো তাকে তাদের তিন তলার কামরাতেই শুতে দিত যদিও জানতো এটা মোটেই উচিত হচ্ছে না। বিছানার উপর টাঙানো সাদা মশারি ও কাতসুয়োর মশারির মধ্য দিয়ে সে তাঁর ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকালো। ঘুমোবার সময় কাতসুয়োর মুখটা একটু বেঁকে থাকে।

পর্দার দড়ি টানতে সে মশারির বাইরে এল। শনের তৈরী শক্ত লোমশ দড়িটা তার ঘর্মাক্ত হাতটাকে একটু আরামের স্পর্শ দিল। পর্দাটা একটু ফাঁক হ'তে দেখা গেল নীচ থেকে আসা আলো চন্দনকাঠের গাছটার উপরে পড়ায় ছায়ার মেলা বসেছে। গাছের পাতাগুলো সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তার চেয়েও নরম। চড়ুই পাখীগুলো কিচিরমিচির শব্দ করছে। প্রতিদিন সকালে ওরা এ-রকমটা করবে, তারপর সারি বেঁধে ছাঁইচ ঘরে রাখা খাবারের পাত্রটার

দিকে যাওয়া-আসা করবে। ওদের ছোট্ট ছোট্ট পা-গুলো পাত্রটার কানাটা এধার থেকে ওধার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওদের রকম-সকম দেখে তোমোকোর হাসি পেল।

সুন্দর সকাল। বিশেষ কোন কারণ না থাকলেও তোমোকোর তাই-ই মনে হ'ল। বালিশে মাথা দিয়ে সে চুপচাপ পড়ে রইল। একটা অনির্বচনীয় সুখ তার সারা দেহে পরিব্যাপ্ত।

হঠাৎ সে দীর্ঘনিঃশ্বাস নেয়। তার সুখী হওয়ার কারণ সে জানে। কাল রাতেই প্রথমবারের মত সে বাচ্চাদের স্বপ্ন দেখেনি। এর আগের রাতগুলোতে ওরা স্বপ্নে দেখা দিত। কালকের স্বপ্নটাও ছিল মজার।

সে এত তাড়াতাড়ি সন্তানদের ভুলে গেল? তার হৃদয়হীনতা তার কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হ'ল। মাসারু জেগে দেখে তোমোকো বাচ্চাদের জন্য কাঁদছে কিন্তু সে কান্নার মধ্যে কোন যন্ত্রণার লেশ নেই। মুখে প্রশান্তির ভাব।

"ওদের কথা ভাবছিলে?"

"হ্যাঁ।" সত্যি কথাটা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

মিথ্যেটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ায় সে অস্বস্তিবোধ করল এই ভেবে যে মাসারু তার সঙ্গে কাঁদেনি। যদি তার চোখে এক ফোঁটা জলও দেখতো তবে তোমোকোর অন্ততঃ এই বিশ্বাসটুকু জন্মাতো যে সে মিথ্যা বলেছে।

৪৯-তম দিনের ক্রিয়ানুষ্ঠান শেষ হল। তামা কবরখানায় মাসারু কিছুটা জায়গা কিনেছে। তার পরিবারে এই প্রথম মৃত্যু ঘটনা ও মৃতদের সমাধির ব্যবস্থা। ইয়াসুর উপর দেশের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার ছিল। কাজেই মূল পরিবারের লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করে তার চিতাভস্ম এখানে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল।

দুঃখটা গভীর থেকে গভীরতর হওয়ায় তোমোকোর কাছে তার মানসিক ভীতিটা ভিত্তিহীন বলে মনে হ'ল। সে মাসারু ও কাতসুয়োর সঙ্গে সমাধি-ক্ষেত্রের জমিটা দেখতে গেল।

তখন শরৎকাল, দিনটা ছিল খুবই সুন্দর। নির্মল আকাশ থেকে সূর্যের তাপটাও বিদায় নিচ্ছিল।

'স্মৃতি' নামে বস্তুটা এমনই যে কখনও কখনও তা সময়কে আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। সেইদিন অন্ততঃপক্ষে দু'বার এই 'স্মৃতি' নামে বস্তুটা তার সঙ্গে রূঢ় রসিকতা করেছে। সম্ভবতঃ নির্মল আকাশ ও সূর্যের নরম আলো তার অবচেতন মনের প্রান্তগুলোকে অর্ধস্বচ্ছ করেছে।

ছেলেমেয়ের জলে ডুবে মারা যাওয়ার দু'মাস আগে একটা মোটর অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল। মাসারু অবশ্য তাতে কোন আঘাত পায়নি। কিন্তু সমুদ্র সৈকতের দুর্ঘটনার পর থেকে তোমোকো কখনও কাতসুয়োকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে এক গাড়ীতে বেড়াতে যায় নি। আজকে মাসারুকে পর্যন্ত ট্রেনে যেতে হ'ল।

ব্রাঞ্চ লাইন দিয়ে কবরখানা যেতে ওরা 'এম' নামে একটা স্টেশনে গাড়ী বদলালো। ভীড়ের জন্য আটকে পড়ায় তোমোকো ট্রেনের দরজা বন্ধ হওয়ার মাত্র দু'এক সেকেণ্ড আগে কোনক্রমে গাড়ী থেকে নেমে আসে। দরজাটা তার পেছনে বন্ধ হতেই সরু কাঁপানো হুইস্‌ল্‌ শোনা গেল। সে ফিরে এসে দরজাটা খোলবার চেষ্টা করল। তার মনে হয়েছিল কিউ ও কিকোকে সে যেন কামরার ভেতরে রেখে এসেছে।

মাসারু হাত ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল। স্বামীর দিকে সে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকালো—মাসারু যেন একজন ডিটেকটিভ, তাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। একটু ধাতস্থ হ'লে সে তার কার্যকলাপের কারণ দর্শাতে চাইল। তাকে যে-কোন উপায়ে হোক সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাতে হবেই। কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা মাসারুকে আরও বেকায়দায় ফেলল। মাসারু ভাবল তোমোকো অভিনয় ক'রে চলেছে।

পুরনো আমলের যে ট্রেনটায় ওরা কবরখানায় গিয়েছিল সেটা দেখে কাতসুয়োর খুব আনন্দ হ'ল। ট্রেনটার চিমনি যেমন বড় তেমনি উঁচু। যে কাঠের হাতলের উপর ইঞ্জিনীয়ার তার কনুই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওটাকে মনে হচ্ছিল যেন কয়লা দিয়ে তৈরী। ইঞ্জিনটা ফোঁস ফোঁস করে গজরাচ্ছিল। অবশেষে নিস্তব্ধ শহরতলীর মধ্য দিয়ে ট্রেনটা যাত্রা শুরু করল।

তামা কবরখানা তোমোকোর কাছে নতুন। এতবড় জায়গা মৃতদের জন্য সংরক্ষিত? সবুজ ঘাসে ভরা লন, দু'পাশে সাজানো গাছের সারি, মাথার উপর উন্মুক্ত নীলাকাশ—দূর থেকে সব স্পষ্ট দেখা যায়। জীবিতদের শহরের তুলনায় এই মৃত্যুপুরী অনেক পরিস্কার, অনেক সুশৃঙ্খল। কবরখানা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার কোন কারণ স্বামী-স্ত্রীর ছিল না এবং এখন তারা বিশিষ্ট দর্শনার্থী বলে ব্যাপারটা তেমন দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হ'ল না। এ-সম্বন্ধে ওরা কেউ-ই তেমন গভীরভাবে চিন্তা না করলেও মনে হল যেন সারা শোকের সময়টা ওদের একধরনের নিরাপত্তা এনে দিয়েছে যা শুধু স্থায়ী-ই নয় আনন্দদায়কও বটে। মৃত্যুর বিভীষিকা সম্বন্ধে ওরা অনেকটা ধাতস্থ হয়ে

গেছে। নৈতিক চরিত্রের কলুষতায় লোকে যেমন ধাতস্থ হয় তাদের মত ওরাও অনুভব করল যে জীবন এমন কিছু ধরে রাখেনি যা'তে ওরা ভয় পেতে পারে।

কেনা জমিটা কবরখানার একপাশে। ঘর্মাক্ত দেহে ওরা গেট থেকে ভেতরে গেল। কোন একজন অ্যাডমিরাল 'টি'-এর কবরের দিকে ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি পড়ল। আয়না দিয়ে সাজানো একটা বৈচিত্র্যহীন কবর। দেখে ওদের হাসি পেল।

ঝুর্ঝুরে পোকার মৃদু আওয়াজ ও ঘাসের গন্ধ দুই-ই তোমোকোর ভাল লাগছিল। "কী চমৎকার জায়গা! ওরা এখানে নির্বিঘ্নে মনের সুখে খেলতে পারবে।" ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক নয় কি? তোমোকো ভাবে। তার বয়স এখন তিরিশের কোঠায়।

চৌমাথার কাছে একটা উঁচু বদামী রাঙের দালান। মাঝখানের ফোয়ারা থেকে চুঁইয়ে আসা জলে সিড়িগুলোতে কালো দাগ পড়েছে। কতগুলো বাচ্চা গয়াল পোকা তাড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে হৈ-চৈ করে জল খাচ্ছে ও একে অন্যের দিকে ছিটোচ্ছে। ফোয়ারার জলে সূর্যের আলো পড়ায় কখনো সখনো রামধনু রঙ ফুটে উঠছে।

কাতসুয়ো করিৎকর্মা ছেলে। মা তার হাত ছেড়ে দিয়েছে এই সুযোগে সে সিঁড়ির দিকে দৌড়াল। তোমোকো চীৎকার করে বলল, কোথায় যাচ্ছ? ঘাড় ফিরিয়ে সে জবাব দিল, "জল খেতে"। তোমোকো দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে তার হাত শক্ত করে ধরল। ভয় পেয়ে কাতসুয়ো বলল—"ছাড, ব্যথা লাগছে।" কোন একটা ভয়ঙ্কর জন্তু যেন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তোমোকো সুরকির উপরেই হাঁটু গেড়ে বসে ছেলেকে নিজের দিকে ঘোরাল। কাতসুয়ো দেখতে পেল কিছুটা দূরে একটা ঝোপের পাশে তার বাবা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

"তোমাকে ও জল খেতে হবে না। কিছুটা আমাদের কাছেও আছে", এই বলে তোমোকো তার হাঁটুতে রেখে জলের ফ্লাস্কের ছিপিটা খুলতে লাগল।

অবশেষে ওরা কেনা জমিটার কাছে গেল। ওটা ছিল কবরখানার নতুন খোলা একটা চত্বরে, স্মৃতি ফলকগুলোর পেছনে। কতগুলো জীর্ণ ছোট্ট ছোট্ট গাছের চারা টবে সাজানো। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে প্ল্যান করা। চিতাভস্ম এখনও পরিবারের নিজস্ব মন্দির থেকে সরানো হয়নি, সমাধির জায়গাও অচিহ্নিত। শুধু মাত্র এক ফালি জমি দড়ি দিয়ে ঘেরা রয়েছে।

মাসারু বলল—"ওরা তিনজনে এখানে বেশ শান্তিতে একত্রে থাকবে।"

তার এই মন্তব্যে তোমোকোর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল না। তোমোকো ভেবে আশ্চর্য বোধ করে, কী করে আসল, সত্যিটা এমন অসম্ভব, অবিশ্বাস্য হ'তে পারে। একটি বাচ্চা সমুদ্রে ডুবে মরেছে-এটা বিশ্বাসযোগ্য এবং লোকেও মেনে নেবে কিন্তু তাই বলে একসঙ্গে তিনটে প্রাণীর জলে ডুবে মরা? অসম্ভব। অথচ মজা এই যে দশ হাজারের বেলায় পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ আলাদা। এই সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারটা কেমন যেন উদ্ভট। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের বেলায় তেমনটা নয়। একটা মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর মতই সমান মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক। যেখানে সংখ্যাটা বেশী তার বেলায় অবিশ্যি কিছুটা আলাদা। তোমোকো বিড়বিড় ক'রে আউড়ে যায়—"তিনটি মৃত্যু? ওরা তিনজনেই? অবিশ্বাস্য। অর্থহীন।"

সমাজের দৃষ্টিতে কম হলেও একটা পরিবারের পক্ষে সংখ্যাটা খুবই বেশী। যুদ্ধে নিহত হওয়ার মাঝে কোন সামাজিক সংযোগ নেই। স্বার্থপরের মতো তোমোকো এই সংখ্যাতত্ত্বের ধাঁধাটা বারবার বিচার করে দেখছিল। মাসারু অবশ্য ব্যাপারটাকে অনেক সহজভাবে দেখেছে। সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের মতকেই গ্রহণ করাটা সুবিধাজনক বলে যুক্তিযুক্ত মনে করেছে। তাদের ভাগ্যি ভালো এ ব্যাপারে সমাজ জড়িত নয়।

স্টেশনে ফিরে এসে তোমোকোর মনে হ'ল সময় যেন কাটছে না। গাড়ীর জন্য ওরা বিশ মিনিট বসে রইল। স্টেশনের সামনে ভোঁদর জাতীয় এক ধরনের পুতুল বিক্রী হচ্ছিল দেখে কাতসুয়ো একটা কিনতে চাইল। কাপড়ে তৈরী পুতুলগুলো একটা লাঠি থেকে ঝুলছিল—চোখ, কান লেজ সবই আছে। তোমোকো ছেলেকে বলল—

"এগুলো কিনতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?"

মাসারু—"বাচ্চারা তো পুতুল চাইবেই। এগুলো ওদের খুব পছন্দ।"

তোমাকো—"হ্যাঁ, ছোট বেলায় আমারও একটা ছিল।"

স্টল থেকে তোমোকো একটা পুতুল কিনে কাতসুয়োর হাতে দিল। পরমুহূর্তে তার দৃষ্টি অন্য দোকানগুলোর উপর পড়ল। কিউ ও কিকোর জন্যও তাকে কিছু কিনতে হবে। ওদের বাড়ীতে ফেলে রেখে এসেছে যে!

মাসারু জিজ্ঞেস করে—"ব্যাপার কী?"

"জানি না আমার কী হয়েছে। মনে হ'ল ওদের জন্যও কিছু কেনা দরকার। সে তার সাদা গোল গোল হাত দু'টোকে মুঠো করে উঠিয়ে চোখ

ও কপালে ঘষতে লাগল। তার নাসিকা দু'টি কাঁপছিল—যেন এখনই কাঁদবে।

"যাও ওদের জন্ত তাহ'লে কিছু কিনে আনো, আমরা সমাধিতে বিছিয়ে দেব।" মাসারুর-কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা ও অনুনয়ের সুর।

"না, ওদের তাহ'লে ফিরে আসতে হয়।"

তোমোকো তার নাকে রুমাল চাপা দিল। ওরা মরে গেছে অথচ সে দিব্যি বেঁচে আছে। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হ'তে পারে? বেঁচে থাকাটা কতই না বিড়ম্বনা!

সে চারদিকে তাকালো। দেখলো স্টেশনের কাছে রেস্তোরাঁ ও মদের দোকানের সামনে একটা লাল পতাকা ঝুলছে! একটা দোকানে কবরখানায় ব্যবহৃত স্মৃতিফলকের সাদা পাথরের স্তূপ। দেখতে পেল বাড়ীগুলোর তিন তলায় হলদে হয়ে আসা কাগজে মোড়ে দরজা, টালির ছাদ ও অপরাহ্নের কালচে হয়ে আসা চীনামাটির মতো চকচকে নীল আকাশ। সবই যেন সুনির্দিষ্ট, পরিষ্কার। বিড়ম্বিত জীবনের মাঝেও একটা গভীর প্রশান্তি —অনেকটা মূর্ছা যাওয়ার আগেকার অবস্থার মত।

শরতের বিদায়ের সাথে সাথে পরিবারের জীবনধারাও দিনে দিনে শান্তিপূর্ণ হয়ে আসতে লাগলো যদিও দুঃখটা পুরোপুরি দূরীভূত হ'ল না। স্ত্রীকে কতকটা পরিমাণে সুস্থির দেখে মাসারুর মনে আবার বাড়ী আসার আনন্দ ও কাতসুয়োর প্রতি স্নেহ জেগে উঠল। অফিস থেকে অনেক আগেই সে বাড়ী ফিরতে সুরু করল। কাতসুয়োকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার পর ঝি চলে গেলে তাদের আলোচনা পুরানো কথার দিকে মোড় নিত। কিন্তু তবুও এরই মধ্যে ওরা দুজনে এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পেল।

যে নিয়মের মাধ্যমে এমন একটা ভয়াবহ ঘটনা প্রতিদিনকার জীবনে মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেল তা তাদের মনে নতুন একটা লজ্জা মিশ্রিত ভয়ের উদ্রেক করল। মনে হ'ল তারা এমন একটা জঘন্য অপরাধ করেছে যা শেষ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে। পরিবার থেকে তিনটি প্রাণী সরে গেছে এই উপলব্ধিটা ওদের সময় সময় এক ধরনের অদ্ভুত তৃপ্তির স্বাদ এনে দিল। কেউ-ই পাগল হ'ল না কিংবা আত্মহত্যা করল না—এমন কি কারুর অসুখ পর্যন্ত হ'ল না। ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে, কোন ছায়া রেখে যায়নি। এক ধরনের একঘেয়েমিতে তোমোকো বিরক্ত বোধ করে। সে যেন কিসের প্রতীক্ষায় বসে আছে।

অনেকদিন যাবৎ ওরা থিয়েটার বা গানের জলসা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে কিন্তু এখন তোমোকোর একটা অজুহাত মিলে গেল। এ-সব আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যই হ'ল শোকার্তদের সান্ত্বনা দেওয়া। আমেরিকা থেকে একজন নাম-করা বেহালাবাদক এসেছে। জায়গায় জায়গায় অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছিল। ওরা টিকিট কাটলো। কাতসুয়োকে একরকম জোর করেই বাড়ীতে রেখে ওরা জলসায় গেল। স্বামীর সঙ্গে তোমোকো একা যাবে এ-ও একটা কারণ বটে।

প্রসাধন করতে তোমোকোর অনেকটা সময় লাগল—বিশেষ করে চুলটা ঠিক করতে। মাসের পর মাস ওতে হাত পড়েনি। আয়নায় নিজের মুখ দেখে তোমোকোর বিস্মৃতপ্রায় পুরনো দিনের আমোদ-আহ্লাদের কথা মনে পড়ে যায়। আয়নার মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলাকে কি ভাবেই বা বর্ণনা করা যেতে পারে? সে ভুলে গেছে আয়না নামক পদার্থটার আকর্ষণের কথা। সন্দেহ নেই অবাধ্য, আত্মপীড়নকারী দুঃখ লোককে এ-সব ভাবোচ্ছ্বাস থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়। তোমোকো একটার পর একটা কিমোনো (পোশাক) বদলায় এবং শেষ পর্যন্ত বেগুনী রঙের দামী একটা কিমোনো পরে। মাসারু গাড়ীতে বসেছিল। তোমোকো আসতে তার সুন্দর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকায়।

কনসার্ট হলের লাউঞ্জে লোকদের দৃষ্টিও তোমোকোর উপর পড়ে। মাসারু খুব খুসী। কিন্তু তোমোকো ভাবে অন্য কথা। লোকে তাকে যতটা সুন্দরীই ভাবুক না কেন সে জানে কিছু একটা অপূরণ তার আছেই। একটা সময় ছিল যখন সে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে খুসীমনেই বাড়ী ফিরত। ভাবলো এই যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তিটা নিশ্চয়ই তার চপল মন-সঞ্জাত যা বারবার তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তার দুঃখ দূর হ'তে এখনও ঢের ঢের বাকী। বস্তুতপক্ষে তার অসন্তুষ্টির মূল কারণ এই যে লোকে তার আসল দুঃখটা বোঝেনি, সেইমত ব্যবহারও করেনি।

গান-বাজনা তার মনে গভীর দাগ কাটলো। বিষাদমাখা মুখে সে বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসল, একজন বান্ধবীর সঙ্গেও খানিকটা কথা বলল। তার বিষাদক্লিষ্ট মুখখানার অভিব্যক্তি বান্ধবীটির আশ্বাসবাণীর সঙ্গে চমৎকার ভাবে খাপ খেল। বান্ধবীটি তার সঙ্গী যুবকটির সঙ্গে তোমোকোর পরিচয় করিয়ে দিল। যুবকটি তোমোকোর দুঃখের কথা জানত না। কাজেই কোন সান্ত্বনার বাণীও শোনাল না। গান-বাজনা সম্বন্ধে দু'চারটে হাল্কা বিশ্লেষণী মন্তব্য ছাড়া

তার কথাবার্তায় তেমন কোন জৌলুসের পরিচয় পাওয়া গেল না।

ভীড়ের মাঝ দিয়ে চলে যেতেই যুবকটির চকচকে মাথাটা তোমোকোর নজরে এলো। ভাবল—"লোকটা ভারী অভদ্র তো? আমাকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করল না। দেখে বোঝা উচিত ছিল আমি কত দুঃখী।"

একটু লম্বা হওয়ায় ভীড়ের মাঝেও যুবকটিকে আলাদা করা যাচ্ছিল। সে একটা পাশে বাঁক নিতেই তোমোকো দেখতে পেল তাঁর ভুরু, হাসিহাসি চোখ ও কপালের উপর বেয়ে পড়া অলকগুচ্ছ। বান্ধবীর মাথাটা কেবল দেখা গেল। একটা ঈর্ষার দংশন অনুভব করল তোমোকো। তাহ'লে কি সে যুবকটির কাছ থেকে সান্ত্বনার বাণীর অতিরিক্ত বিশেষ কিছু সম্বোধন আশা করছিল? কথাটা মনে হ'তেই তার সমস্ত নীতিবোধটা একটা প্রচণ্ড নাড়া খেল। নিজেকে বোঝাল এই সদ্যোজাত সন্দেহ তার সহজাত বিশ্বাসের পরিপন্থী। সে ত কখনও স্বামিসুখে বঞ্চিত নয়?

এতক্ষণ মাসারু তার এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিল। তোমোকোকে বলল—"তোমার পিপাসা পেয়েছে? যাও না, ওখানে কমলালেবুর রস বিক্রী হচ্ছে।"

নাম ছাপানো বোতল থেকে লোকেরা কমলালেবুর রস খাচ্ছিল। ক্ষীণ-দৃষ্টি লোকদের মত তোমোকোও চোখ কুচকে একবার তাকাল। মনে পড়ল সেই দিনকার কথা যে দিন সে কাতসুয়োকে ফোয়ারার জল খেতে দেয়নি, বরং উল্টো সেদ্ধ করা জল দিয়েছিল। একমাত্র কাতসুয়োই তো বিপদের সম্মুখীন। ঐ কমলালেবুর রসে হয়তো বা লক্ষ লক্ষ বীজাণু গিজগিজ্ করছে।

আনন্দের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে তোমোকোর একটু পাগলাটে ভাব দেখা দিল। শুধু তাই নয়, যে কোন উপায়ে একটু আনন্দ পেতে হবে এই ধারণার মাঝে একটা প্রতিশোধের ভাবও লক্ষ্য করা গেল। অবশ্য স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার মত কোন প্রলোভন তার সামনে ছিল না। যেখানে সে যেত স্বামীও সঙ্গে সঙ্গে থাকত অথবা বলা চলে থাকতে চাইত।

তার বিবেক এখন বাসা বেঁধেছে মৃত সন্তানদের ঘিরে। জলসা থেকে ফিরে এসে সে ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের কথা মনে পড়ায় মন গ্লানিতে ভরে উঠল। আনন্দের পিছু ধাওয়া করাটা বিবেক-দংশনের পথকে সুগম করে দিয়েছে। তোমোকো হঠাৎ বলে বসল সে সেলাই শিখবে। একটি স্ত্রীলোকের মন বোঝা যে কি শক্ত তা মাসারু বেশ বুঝলো—অবশ্যি এ-রকম অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম নয়।

তোমোকো সেলাই শিখতে শুরু করল। আনন্দ পাওয়াটা তেমন শ্রমসাধ্য বলে মনে হ'ল না। সে চাইল পুরোপুরি গৃহিণী হ'তে। অনুভব করলো জীবনটার সঙ্গে এখন যেন সে সরাসরি মোকাবিলা করতে পারছে।

নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত হ'লে সে দেখতে পেল তাঁর চারদিকে বহু জিনিস তত্ত্বাবধানের অভাবে নষ্ট হ'তে চলেছে। মনে হ'ল সে যেন সবেমাত্র সুদীর্ঘ ভ্রমণ সেরে বাড়ী ফিরেছে। সে কাজে লেগে গেল। কোন কোন সময়ে সারাটা দিন কাপড় কাচায় ব্যয়িত হ'ল আবার কোন কোন সময় সারাটা দিন ঘর সাজানোর কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখল। মাঝবয়েসী ঝি-টা সমস্ত কাজ তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

একদিন কিউ-এর একজোড়া জুতো ও কিকোর একজোড়া ফিকে নীল রঙের পশমী চপ্পল তার হাতে পড়ল। এই সব স্মৃতিচিহ্ন তাকে আরও গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত করল, কখনও বা আনন্দাশ্রু ঝরালো। কিন্তু ওগুলোকে দেখে মনে হ'ল মন্দভাগ্যের প্রতীক। লোকের সেবায় নিয়োজিত এক বান্ধবীকে ডেকে সে সমস্ত জিনিস, এমন কি কাতসুয়োর গায়ে লাগে এমন সব জামা কাপড় পর্যন্ত একটা অনাথ আশ্রমকে দান করল।

মায়ের সেলাই শেখার সুবাদে কাতসুয়োর ছোটখাটো একটা জামাকাপড় রাখার আলমারী হ'ল। তোমোকোর ইচ্ছে ছিল নিজের জন্য ফ্যাসান মোতাবেক একটা টুপী তৈরী করে কিন্তু তার সময় নেই। সেলাই মেসিন নিয়ে বসলে সে সমস্ত দুঃখ ভুলে যেত। মেসিনের শব্দ ও যান্ত্রিক গতি তার মনের ভেতর আর একটা অস্থির গতি সুরকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে রাখত। এই সুরটা হ'ল তার ভাবাবেগের উত্থান ও পতন।

ভাবাবেগকে এ-ভাবে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা সে আগে করেনি কেন? কিন্তু এই উপলব্ধি এমন একটা সময়ে এল যখন তার হৃদয়বৃত্তি আগেকার মত স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। একদিন তার আঙুলে সূঁচের খোঁচা লাগলে খানিকটা রক্ত বেরুল। খুব ভয় পেল সে। ব্যথা মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু এই ভয় পাওয়ার ঠিক পরেই আলাদা একটা ভাবনা দেখা দিল। এ-রকম অতি সাধারণ একটা ঘটনা যদি সত্যি সত্যিই মৃত্যু ঘটায় তবে বুঝতে হবে প্রার্থনার জোর আছে। সে আরও বেশী করে সেলাইতে মন দিল। মেশিনটা এত নিরাপদ যে তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না।

এসত্ত্বেও তার অসন্তুষ্টি কমে না, সে যেন কিসের প্রতীক্ষায় বসে থাকে।

এসব উদ্ভট চিন্তা থেকে মাসাকো নিজেকে সরিয়ে রাখে। কোন কোন দিন এমনও যায় স্বামী-স্ত্রীতে একটা কথাও হয় না। শীত আসে, চিতাভস্ম সমাহিত করা হয়।

শীতের নির্জনতার মাঝে গ্রীষ্মের জন্য মন লালায়িত হয়। গ্রীষ্মের স্মৃতি ওদের জীবনে আরও গভীর ছায়া ফেলে। তথাপি এই স্মৃতিকে মনে হয় যেন গল্পের বই থেকে আমদানী করা। ভুললে চলবে না যে শীতের দিনে আগুনের উষ্ণ আলোকে সমস্ত জিনিসকেই নাটক নভেলের মত লাগে।

শীতের মাঝামাঝি আবিষ্কৃত হ'ল তোমোকো অন্তঃসত্ত্বা। এই প্রথমবারের মত তার স্বাভাবিক বিস্মৃতি ফিরে এল। এর আগে কখনও স্বামী-স্ত্রী এত সতর্ক হয়নি—ওদের ভেবে অদ্ভুত লাগল যে বাচ্চাটা হয়ত বা নিরাপদেই ভূমিষ্ঠ হবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই হারিয়ে যাবে।

সবই নিয়মমাফিক চলছিল। ওরা ওদের পুরনো স্মৃতি ও নিজেদের মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে দিল। গর্ভজাত সন্তানের কথা মনে রেখে এই প্রথমবার তোমোকোর স্বীকার করতে দ্বিধা রইল না যে তার মনোবেদনা স্তিমিত হ'য়ে আসছে। এখন তাকে ঘটনাটা স্বীকার করতে হবে মাত্র।

নিজের চোখে দেখা ঘটনাকে সব সময় বুঝতে পারা কষ্ট হলেও তোমোকো প্রাণপণ চেষ্টা করল। বোধশক্তিটা পরে আসে। কিন্তু ভাবাবেগটা বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

অতীতের দিকে তাকিয়ে তার ভাবাবেগের দৈন্যতা সম্বন্ধে তোমোকো বিরক্ত বোধ না করে পারে না। সন্দেহ নেই, আসল দুঃখের চেয়েও এই অসন্তুষ্টিবোধ অনেকদিন তার হৃদয়ে একটা বোঝা হয়ে থাকবে। কিন্তু আবার নতুন করে চেষ্টা করার তো কোন পথ নেই? পাতলা বরফের আস্তরণ যেমন কোন হ্রদকে ঢেকে রাখে তেমনি পুরোপুরি বিস্মৃতি না আসলেও কি একটা যেন তোমোকোর মর্মবেদনাকে ঢেকে রেখেছে।

কিন্তু বিস্মৃতিটা তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল তখনই যখন প্রকৃতপক্ষে তারা এর সন্ধান করে নি। একটা ছোট ছিদ্র দিয়ে কখন অলক্ষ্যে ঢুকে পড়েছে, তারপর অদৃশ্য বীজাণুর মত সারা দেহকে আক্রমণ করেছে। কাজটা নিয়মিত হচ্ছিল, কিন্তু অতি ধীরে। লোকে যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নকে প্রতিরোধ করে তোমোকোও তেমনি তার অবচেতন মনের ভাবাবেগগুলোর সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছিল। বিস্মৃতিকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তার মানসিক অস্থিরতা বেড়ে গেল। সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে

তার গর্ভজাত সন্তানই এই বিস্মৃতির খোরাক জুগিয়েছে। দুর্ঘটনার বাহ্যিক সীমারেখাটা ক্রমশঃ ক্ষীণ, অস্পষ্টতর হ'য়ে শেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

গ্রীষ্মের আকাশে একদিন একটা ভয়ঙ্কর মর্মর মূর্তির আবির্ভাব হ'ল, তারপর আস্তে আস্তে মেঘের মাঝে বিলীন হয়ে গেল। প্রথমে হাত দুটো খসে পড়ল, তারপর মাথা ও সবশেষে হাতের লম্বা তরবারিটা। সেই মূর্তিটার অভিব্যক্তি এমনই ভয়ঙ্কর যে চুল খাড়া হ'য়ে ওঠার মত। কিন্তু ওটা ক্রমশঃ অস্পষ্টতর হ'তে হ'তে এক সময়ে মিলিয়ে গেল।

একদিন তোমোকো রেডিও খুলে নাটক শুনছিল। বিষয়বস্তু ছিল মা তাঁর সন্তানকে হারিয়েছে। এত তাড়াতাড়ি সে স্মৃতির বোঝাকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়েছে দেখে তার অবাক লাগে। সে অনুভব করল—যে মা তার চতুর্থ সন্তানের অপেক্ষায় দিন গুনছে তার নৈতিক দায়িত্ব হ'ল সমস্ত অশুভ চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা। এই কয় মাসে তার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে।

ভাবী সন্তানের জন্য তোমোকোকে ভাবাবেগের কালো ঢেউগুলোকে রুখতেই হবে, মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ছলনাময়ী বিস্মৃতি তাকে যতটা আনন্দ দিতে পারতো তার চেয়ে বেশী মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার অনুশাসন তাকে আনন্দের খোরাক জোগাল বেশী। সর্বোপরি সে একটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করল, যদিও মাঝে মাঝে বিস্মৃতি তার জোর খাটাচ্ছিল। তোমোকো আশ্চর্যান্বিত হ'ল এই ভেবে যে তার হৃদয়টাকে কত সহজেই না বাগ মানানো যায়।

সে ক্রমশঃ স্মৃতি-রোমন্থনের অভ্যেসটা হারিয়ে ফেলছিল। স্মরণিক অনুষ্ঠান অথবা কবরখানা পরিদর্শনের সময় চোখের জল না আসাটা তার কাছে এখন আর তেমন অদ্ভুত বলে ঠেকল না। তার বিশ্বাস সে এখন অনেক উদার, যে-কোন জিনিষকে ক্ষমা করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে—একদিন বসন্ত সমাগমে যখন সে কাতসুয়োকে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি পার্কটায় বেড়াতে গিয়েছিল তখন শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার সেই সম্ভাব্য আক্রোশের কথা চিন্তা করতে পারছিল না, যেটা দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে সমুদ্রতীরে ক্রীড়ারত সন্তানদের দেখলে হ'ত। কেন না, সে তার সন্তানদের ক্ষমা করেছে। ওরা এখন পরম শান্তিতে আছে—অন্ততঃ তোমোকোর তাই মনে হ'ল।

তোমোকোর তুলনায় মাসারুর বিস্মৃতি আগে এসেছে সত্যি কথা কিন্তু তার

বেলায় ওটা মোটেই ঔদাসীন্যের চিহ্ন ছিল না। বরং দুঃখটা তারই হয়েছে বেশী। পুরুষের মন কিছুটা পরিবর্তনধর্মী হ'লেও সাধারণতঃ তারা মেয়েদের তুলনায় ভাবপ্রবণ বেশী। ভাবাবেগকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করতে না পেরে এবং দুঃখটা বিশেষ করে যে তাকেই অনুসরণ করছে না এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকায় তার মনে হ'ল সে একা। নিজেকে ক্লান্ত মনে হ'ল। ঠিক এই সময়েই তোমোকো সন্তান-সম্ভবা। মাসারুর অবস্থা অনেকটা মায়ের কাছে আশ্রয়ের জন্য ছুটে-আসা শিশুর মত।

দুর্ঘটনাটা ওদের নিমজ্জমান জাহাজের পরিত্যক্ত যাত্রীদের মতই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে .গল। সংবাদপত্রের এক কোণায় বর্ণিত কোন ঘটনাকে লোকে যে দৃষ্টিতে দেখে ওরাও এই মর্মন্তুদ ঘটনাটাকে সেই ভাবে দেখল। মাঝে মাঝে তোমোকো ও মাসারু ভাবে এতে ওদের কোন প্রত্যক্ষ অংশ আছে কি না। কাছে থেকেও কি তারা দর্শক ভিন্ন অন্য কিছু? দুর্ঘটনার অংশীদার যারা তারা সবাই মৃত এবং তাদের অবদান চিরকালের জন্য সংরক্ষিত। সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনার অংশীদার হতে হ'লে গোটা অস্তিত্বটাকেই কোন না কোন ভাবে বাজি রাখতে হয়। মাসারু কিংবা তোমোকোর এমন কি আছে যে বাজি রাখবে? মোদ্দা কথা, কোন কিছু বাজি রাখার মত সময়ও কি ওদের ছিল?

'এ' সৈকত-এর দক্ষিণে সুমেকি অন্তরীপের লাইটহাউসের ঘূরন্ত আলোর মতোই দুর্ঘটনাটা ওদের মনে একবার আলোকপাত এবং আর একবার ছায়া ফেলতে লাগল। আঘাত দূরে থাক, এটা বরং ওদের কাছে একটা নীতিশিক্ষার পাঠ বলে মনে হ'ল। বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল রূপকে। এটা এখন আর ইকুতা পরিবারের সম্পত্তি রইল না, মালিকানাস্বত্ব জনসাধারণের ওপর বর্তালো। লাইটহাউসের আলো যেমন সমুদ্রতীরের আবর্জনা, নির্জন পাহাড়ের উপর আছড়ে-পড়া উত্তাল ঢেউ ও পাহাড়ের চারদিককার কুঞ্জবনকে আলোকিত করছিল তেমনি দুর্ঘটনাটাও স্বামী-স্ত্রীর দৈনন্দিন জীবনের জটিলতার উপর আলোকপাত করছিল। এ থেকে সাধারণ লোকের একটা শিক্ষাই নেওয়া উচিত এবং তা হ'ল অতি প্রাচীন ও সহজ শিক্ষা যা প্রত্যেক বাপ-মায়ের অন্তরে গভীর ভাবে আঁকা থাকবে বলে আশা করা যায়—"সমুদ্র-তটে নিয়ে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের প্রতি কড়া নজর রেখো। যেখানে বিপদের আশঙ্কা নেই বলে মনে হয় সেখানেই দেখা গেছে বিপদ লুকিয়ে আছে।"

লোককে নীতিশিক্ষা দিতে গিয়ে মাসারু ও তার স্ত্রী তিনটি প্রাণীকে

বিসর্জন দিয়েছে একথা অবিশ্যি ঠিক নয় কেননা এদের লোকসান কোন উদ্দেশ্যই সাধন করছে না। অনেক বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুর নিষ্কর্ষও তো এই একই।

গ্রীষ্মের শেষ ভাগে তোমোকোর চতুর্থ সন্তান একটি মেয়ের জন্ম হল। ওদের খুসী কোন বাধা মানছিল না। কানাজাওয়া থেকে মাসারুর বাবা-মা নতুন নাতনীকে দেখতে এলেন। মেয়েটির নাম রাখা হ'ল মোমোকো। মা ও মেয়ে উভয়েই বেশ সুস্থ। তোমোকো জানে বাচ্চাদের কিভাবে যত্নে রাখতে হয়। কাতসুয়োর আনন্দটা সবচেয়ে বেশী। সে একটি নতুন বোন পেয়েছে।

দুর্ঘটনার বছর দুয়েক পরে অর্থাৎ মোমোকোর জন্মাবার একবছর বাদে তোমোকো মাসারুকে চমক লাগিয়ে দিল। সে একটি বারের জন্য 'এ' সৈকতে যেতে চায়। মাসারু বলে:

"তুমি ত বলেছ ওখানে আর কখনো যাবে না।"

"কিন্তু এখন যেতে চাই।"

"আশ্চর্য! আমার কিন্তু মোটেই যেতে ইচ্ছে নেই।"

"তবে থাক্।"

দু'তিন দিন যেতে না যেতেই তোমোকো আবার বায়না ধরে—

"আমি যাব-ই।"

"তাহ'লে একাই যাও!"

"তা' কী করে হয়?"

"কেন?"

"আমার ভয় করে না বুঝি?"

"যে জায়গাকে ভয় পাও সেখানে তবে যেতে চাও কেন?"

"আমি চাই সবাই চলুক। তুমি সব সময় কাছে থাকলে আমাদের হয়তো কিছুই হ'ত না। তুমিও চল না কেন?"

"ওখানে বেশী দিন থাকলে কী হবে বলা তো যায় না? তাছাড়া আমার সময় কোথায়?"

"একটা রাত্রিই যথেষ্ট।"

"কিন্তু বড্ড বেয়াড়া জায়গা যে?"

মাসারু জিজ্ঞেস করে তোমোকো আবার কেন 'এ' সৈকতে যেতে চায়। কিন্তু তার সেই এক উত্তর "জানি না"। ডিটেকটিভ গল্পের একটা নিয়মের কথা মাসারুর মনে পড়ে যায়—"অপরাধী শত বিপদ সত্ত্বেও হত্যার ঘটনাস্থলে

যাবেই।" যেখানে তাঁর ছেলেমেয়ে মারা গেছে সেখানে পুনর্বার যাওয়ার নেশা তোমোকোকে পেয়ে বসেছে। তৃতীয় দাবী তোলায় মাসারু দু'দিনের ছুটি নেয়।

আগেই বলা হয়েছে 'এ' সৈকতে 'ইরাকুসো' একটাই সরাইখানা। সেখানকার সেই অলক্ষুণে ঘর থেকে যতদূর সম্ভব দূরে অন্য একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হ'ল। ওরা চারজন—স্বামী, স্ত্রী, কাতসুয়ো ও মোমোকো—ইতো থেকে একটা ট্যাক্সিতে রওয়ানা হ'ল।

গ্রীষ্ম তখন উত্তুঙ্গে। পথের পাশে বাড়ীগুলোর পেছনে সূর্যমুখী ফুলগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন লম্বা কোঁকড়ানো সিংহের কেশর। ধূলো উড়িয়ে ট্যাক্সি চলল—ফুলগুলির তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

বা-পাশে সমুদ্র দৃষ্টিপথে আসতেই কাতসুয়ো আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। দু'বছর আগে সে এখানে এসেছিল! এখন তার পাঁচ বছর বয়স।

ট্যাক্সিটা এতই দুলছিল যে কোন কথাবার্তা সম্ভব ছিল না—আর তা হয়ও নি। মোমোকো দু'একটা শব্দ যা আউড়েছিল তা তাদের জানা। কাতসুয়ো মোমোকোকে একটা নতুন বুলি শেখায়, "বল তো সোনা, সমুদ্র?" ন্যাড়া পাহাড়টার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মোমোকোও বলে "ছমুদ্র"। মাসারু ভাবে কি অলক্ষুণে কথাটাই না বাচ্চাটাকে শেখানো হচ্ছে।

'ইরাকুসো'-তে পৌঁছুতেই সেই পুরনো ম্যানেজার বেরিয়ে আসে। মাসারু তাকে বখ্‌শিস দেয়। হাতটা সামান্য কেঁপে ওঠে। মুঠোয় এক হাজার ইয়েনের আর একটা নোট ছিল।

আকালের বছর বলে সরাইখানাটা এবার নীরবপুরী। পুরানো কথা মনে পড়তেই মাসারু বিরক্ত বোধ করে। বাচ্চাদের সামনেই স্ত্রীকে বকে— "এখানে আসার কী দরকারটা ছিল, শুনি? যা ভুলে থাকতে চাই তা-ই আবার নতুন করে মনে পড়ছে। কেন, যাবার মতো ভাল জায়গা কি আর ছিল না? এমন বোকার মত আসার কোন মানে হয়? আমার কাজকম্মো নেই না কি?"

তোমোকো—"তুমিই তো রাজী হলে আসতে।"

"না হয়ে উপায় কী? যা পিছু নিয়েছিলে!"

শেষ বেলাকার রোদ্দুর ঘাসের উপর এসে পড়েছে। দু'বছর আগে যেখানে যেমনটা ছিল এখনও সব ঠিক তা-ই আছে। সাদা দোলনাটার ওপর একটা নীল-সবুজ-লাল রঙের সাঁতার কাটার স্যুট শুকোচ্ছে। ঘাসের ভেতর

দু'তিনটে লোহার আংটা পেরেকটার পাশে পড়ে আছে। জলের যেখানটায় ছায়া পড়েছে ওখানেই ইয়াসুকে শোয়ানো হয়েছিল। গাছের মাঝ দিয়ে গলে আসা সূর্যের আলো খালি ঘাসের উপর আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ মনে হ'ল ইয়াসুর সেই সবুজ স্যুটটার উপর নানা রঙের বিচিত্র ঢেউ খেলে গেল যেন। বাতাস ও আলোর সমাবেশে অনেক সময় এমনটা হ'তে দেখা যায় বটে। মাসারু জানত না ইয়াসুকে ঠিক ওখানটাতেই রাখা হয়েছিল। বিভ্রান্তিটা অবশ্য তোমোকোরই। তোমোকো ভাবে—সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হওয়া পর্যন্ত মাসারুর কাছে মর্মন্তুদ ঘটনাটার যেমন কোন অস্তিত্বই ছিল না তেমনি ছায়ায় ঘেরা এই ছোট্ট একফালি জমিটুকুও মাসারু কিংবা নতুন আগন্তুকদের কাছে চিরদিনের মত অস্তিত্ববিহীন হয়েই এক কোণে পড়ে থাকবে।

মাসারু স্ত্রীকে অনেক বকেছে কিন্তু তোমোকো নির্বিকার, নিশ্চুপ। কাতসুয়ো বাগানে খেলতে যায়। একটা লোহার আংটাকে ঘাসের উপর গড়িয়ে দিয়ে একমনে বসে ওর গতিবিধি লক্ষ্য করে। কিছুদূর গিয়েই আংটাটা একটু লাফিয়ে উঠে পড়ে যায়। কিন্তু কাতসুয়ো ভাবে আংটাটা আবার সোজা হয়ে চলতে থাকবে।

ঘুর্ঘুরে পোকার ডাকে মাসারুর সম্বিত ফিরে আসে। সন্তানের প্রতি কর্তব্যের কথা মনে পড়ে যায়। বলে, "চল কাতসুয়ো, সৈকতে বেড়িয়ে আসি।" তোমোকো মেয়েকে কোলে তুলে নেয়। চারজনেই ঝোপের মাঝের গেট দিয়ে পাইনকুঞ্জের দিকে চলতে শুরু করে।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ তীরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। ভাটা থাকায় ওদের ছোট্ট পাহাড়টা ঘুরে সৈকতের দিকে যেতে তেমন অসুবিধা হ'ল না। সরাইখানা থেকে ধার করে আনা লোহার নালযুক্ত কাঠের জুতোর তলি পড়ে মাসারু কাতসুয়োর হাত ধরে উত্তপ্ত বালুচরের উপর দিয়ে হেঁটে চলল।

সৈকতে খাটানো একটা ছাতাও চোখে পড়ল না। পাহাড় থেকে সুরু করে সৈকত পর্যন্ত সারাটা পথে কুড়ি জনের বেশী লোক ছিল কি না সন্দেহ। ওরা সবাই জলের কিনারায় গিয়ে নীরবে দাঁড়ালো।

আজকের আকাশেও স্তরে স্তরে সাজানো ঘন মেঘের স্তূপ। ভাবলে অবাক হ'তে হয় কী করে এমন ভারী মেঘ বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে। দিগন্তে ঘন মেঘের স্তূপের উপর দিয়ে হাল্কা মেঘের টুকরোগুলো ভেসে চলেছে—যেন কেউ ঝাঁট দিয়ে তাদের অসীম নীলে ফেলে দিয়েছে। নীচের ঘন মেঘের স্তূপকে

দেখে মনে হয় ওরা কতই না সহনশীল—কোন একটা শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদেরকে একত্রে বেঁধে রেখেছে। আলো-ছায়ার খেলা রূপ নিয়েছে কালো অপরিণত অথচ প্রচণ্ড একটা আবেগের যার উপাদান মেলে দীপ্তি ও স্থাপত্যকলায়—সঙ্গীতের বেলায় যেমনটা হয়।

মেঘের নীচে সুদূর প্রসারিত সমুদ্র—সীমাহীন, অপরিবর্তনীয়। একটার পর একটা ঢেউ আছড়ে পড়ছে, আবার চলে যাচ্ছে। ওর গর্জনকে গ্রীষ্মকালের সূর্যের নিবিড় নীরবতার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ঢেউ-এর একটা কাব্যিক রূপান্তর—বরং বলা ভালো মৃদু লহরী (ঢেউগুলোর নিজেদের প্রতি নিজেদের হাল্কা ব্যঙ্গের হাসিকে তাই বলতে হবে)—তাদের পা ছুঁয়ে আবার সরে গেল।

মাসারু একবার আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। চোখে জল, মুখটা অসম্ভব রকমের গম্ভীর।

এই মুখ মাসারুর চেনা। সেই দুর্ঘটনার দিন থেকেই মাসারু এটা লক্ষ্য করে আসছে। তোমোকো যেন নিজেতে নেই, কি একটার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

মাসারু আস্তে জিজ্ঞেস করে—"কি ভাবছ এত?" কিন্তু কোন উত্তর আসে না। সে জানতো কোনো উত্তর আসবে না। কাতসুয়োর হাতটা সে আরও শক্ত করে ধরে ফেলে।

অনুবাদ: মৃণালকান্তি কাঞ্জিলাল

ইন্দোনেশিয়া ঃ

একদা 'মকর-চূড়-মুকুট পরে' হাতে 'ধনুক-বাণ' ধারণ করে 'রাজবেশী ভারত' উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সাগর পারের ঐ দূর দেশে গিয়ে। একাসনে বসে 'নটরাজেরে' ডালি সাজিয়ে পূজা করেছিল ভারত আর ইন্দোনেশিয়া। 'শিব-শিবানী'র আলোক ছায়া দুলে উঠেছিল একদা তার সাগর জলে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ ভারতের ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ জৈন ধর্মের অমৃতবাণী এসে আছড়ে পড়েছিল তার উপকূলে। দিগ্বিজয়ী ভারতের বণিক আর পুরোহিত, বৌদ্ধ শ্রমণ আর ভিক্ষু, জ্ঞানী-গুণী সম্প্রদায়ের দৌলতে দু'দেশের মধ্যে যোগসূত্রের ভিত পাকা হয়ে ওঠে। যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব থেকে ভিনদেশী ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া গাঁটছড়ার বন্ধন নিবিড় হতে শুরু করে।

উপনিবেশিকতার প্রভাব এড়িয়ে ইন্দোনেশিয়ার একালের সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। প্রস্তুতি কিন্তু তার চলেছিল আরও আগে (১৯৩৩-৪১ সাল) থেকে। আর এর মূলে ছিল 'পুযঙ্গ-বারু' বা নতুন লেখক নামে সাংস্কৃতিক এক মাসিক পত্রিকা। নতুন এ মাসিক পত্রিকাখানিই আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের ভিত প্রতিষ্ঠিত করে। ডাঃ তাকির আলিযবন ছিলেন এ 'নতুন লেখক' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। 'পুযঙ্গ বারু' পত্রিকার মারফত তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ তুলে ধরেন দেশবাসীর সামনে। ডাঃ তাকির আলিযবন, সানুসি পানে ও তাঁর ভাই আমিন পানে, কবি আমির হামজা, আবদুল মুইম প্রভৃতি শক্তিধর কবি ও লেখকেরা গল্প কবিতা উপন্যাসে 'পুযঙ্গ বারু' যুগের ইন্দোনেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। পাশ্চাত্য লেখকদের—বিশেষ করে ভারতীয়দের—প্রভাব তাঁদের উপর লক্ষ্য করার মত।

উষা লগ্নে

প্রমোগ্ধ অনন্ত তোয়ের

আমার জন্মের আগে বাবা ব্লোরাতে ছোট্ট একটা স্কুল স্থাপন করেছিলেন। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম আমাদের বাড়ীটা লোকে গমগম করছে। বাবার পুরনো ছাত্রদের অনেকেই আমাদের সঙ্গে থাকতেন। হারীপের কথা আমি কখনও ভুলব না। আমার বয়স যখন সাত কি আট, তিনি তখন এসেছিলেন। যুদ্ধের আগেকার কথা আমি বলছি।

বাড়ীর সবাই হারীপকে বিশেষ প্রশংসার চোখে দেখত। কেননা, তিনি জুনিয়র হাইস্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এরই মধ্যে। আমাদের অনেকের চাইতে অনেক বেশী তিনি জানতেন নিশ্চয়। তাই আমরা সবাই উনি যা বলতেন হাঁ করে তাই শুনতাম। এখনও পর্যন্ত তাঁর অনেক কথাই আমার মনে গেঁথে আছে। অবশ্য অনেক কিছুই আমি তখন বুঝে উঠতে পারতাম না।

সেদিন রাত্রের কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে। হারীপ দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলেন: 'আমরা ঘুমিয়ে আছি দীর্ঘকাল। কেউ আমাদের জাগিয়ে না দিলে নয়। আমরা যে কেবল সরকারী কেরানী হতে চাই এ কথাটা আমাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। আমাদের সব কিছু ওরা কেড়ে নিচ্ছে। ট্যাক্স-এর বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন। ট্যাক্স দিতে হবে। না হলে জেল। জেলে গিয়ে মেয়াদ খাটো।'

পরের দিন, আমি মাকে শুধালাম: হারীপ কি বলেছিলেন মা? মা বললেন, আমি যখন বড় হব তখন বুঝতে পারব। খেলার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম। ওরাও কিন্তু বুঝিয়ে বলতে পারল না কেউ। আমাদের বুড়ো চাকর যনগস-এরও শরণাপন্ন হলাম। সেও কিন্তু বুঝিয়ে কিছু বলতে পারল না।

পরে মা অবশ্য বলেছিলেন, হারীপ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আমি শুনে তো অবাক। কেননা, রাজনৈতিক দল মানেই হল পুলিশ। যদিও আমি তখন ছোট তবুও জানতাম যে বাড়ীর সবাই পুলিশকে কি ঘৃণাটাই না করতেন। আমি তাই মাকে শুধালাম: 'হারীপ যে পুলিশের সঙ্গে যুক্ত তাতে

বাবা কি বিরক্ত হন না মা ?' মা তখন আমায় বুঝিয়ে বললেন, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা সবাই পুলিশের শত্রু।

কথাটা শুনে আমি তখন ছুটে গিয়ে বন্ধুদের তা বলতে গেলাম। ওরা কিন্তু আমার কথা শুনে হেসে উঠল, যখন আমি পুলিশ আর রাজনীতির কথা বলতে গেলাম। যনগসও আমার কথা বিশ্বাস করল না একটুও। আমি বোকা বনে গেলাম। কিন্তু মনে মনে বললাম, মা-ই ঠিক।

আর এক সন্ধ্যেবেলাও হারীপ সরকারী কেরানীদের কথা আবার বলছিলেন। তিনি ওদের নাম দিলেন 'ছোট আমলা'। 'নিষ্কর্মার ধারী !' নিজেকে ভাবেন ওঁরা, আর সকলের চাইতে সেরা।

হারীপ একটু থেমে আবার বললেন: সরকারী আমলারা সকালবেলা প্রতিদিন একই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে যান। অফিসে একই ডেস্কে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর ফেরেন বাড়ী। বছরের পর বছর এমনিধারা চলে আসছেন। সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে ফষ্টিনষ্টি করেন আপন স্ত্রীর সঙ্গে। আর তার পরেই আর এক শিশুর বাপ হয়ে পড়েন। এদিকে ট্যাঁকে থাকে না পয়সাকড়ি। এ যেন অনেকটা ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত। জাবর কাটা জীবন—এক মুঠি খড়, এক গামলা জল আর মাথা গুঁজবার একফালি ঠাঁই।—আর কিছু নয় তার চাহিদা। অফিসের বড়বাবু যদি ওর দিকে চেয়ে একটুখানি হাসেন তাহলে সে খুশিতে ওঠে টগবগিয়ে। আর বড়বাবু যদি থাকেন মুখ ব্যাজার করে তাহলে তার দশা হয় তাড়িয়ে দেওয়া কুকুরের মত। যা বেতন পায় তাতে মাসের পনের দিনও চলে না। সারাজীবন এমনি ধারা জাবর কাটা। আর বছরের পর বছর নতুন নতুন সন্তানের জন্ম দেওয়া। এদিকে ট্যাঁকে নেই পয়সা। আর সকলের মত ওরাও চায় আগেকার জীবনে ফিরে যেতে।

সবাই মাথা নাড়ল। আমিও ভাবলাম কথাটা বুঝি সত্যি। আমিও তাই মাথা নাড়লাম। স্ত্রীর সঙ্গে কেরানীবাবুর ফষ্টিনষ্টি করার কথাটা আমার মাথায় কিলবিল করতে লাগল। খেয়ে উঠে আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম: আচ্ছা মা, কেরাণীবাবুরা স্ত্রীর সঙ্গে একটু ফস্টিনস্টি করলে অমনি ছেলের বাপ হয়ে পড়েন কথাটা কি সত্যি ? কথাটা শুনে মা রেগে গেলেন। মাকে রেগে যেতে এই আমি প্রথম দেখলাম। মা মুখের উপর বলে উঠলেন: 'যাও, পড়াশুনা কর গিয়ে।'

আমি যখন তাঁকে আবার কথাটা বলতে গেলাম মা তখন আমায় ধাক্কা

দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিলেন।

ছেলেপিলেদের কাছে আমাদের শহরটা বেশ নিরিবিলি। অসাধারণ তেমন কিছু ঘটত না। এ বছর সব ব্যাপারটাই পরিবর্তন হ্তে চলল। আমি আনাচে কানাচে একটা চাপা উত্তেজনার স্থর অনুভব করলাম। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে যেন কথা বলতে শুরু করল—কেরানীবাবুরা, দোকানীরা, বাজারে যে সব চাষীরা আসে—তারা সবাই, আর আমাদের বাড়ীতে যে সব ছাত্র ছিল—তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে লাগল। জাপান আর ভারতের কথা প্রায়ই তারা বলত। ওসব কথা আমি আগে শুনি নি। 'স্বদেশী', 'বয়কট' 'ঐতিহ্য', 'ঐক্য' প্রভৃতি কথাও আমার কাছে ছিল অপরিচিত।

শীঘ্র আরও অনেক পরিবর্তন দেখতে পেলাম। প্রথমতঃ গাঁয়ে গাঁয়ে ফুটবল ক্লাব গড়ে উঠল। এছাড়া আরও অনেক খেলাধূলার দলও দেখা দিল। এমনকি ছোটদেরও। তারপর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠল। আর তাতে জাতীয় 'গামেলান' অর্কেস্ট্রা, 'ওয়াঙ্' দল, পুতুল নাচের প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আর এসব প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ সদস্যই হল সরকারী কেরানীরা।

বাবা প্রায় সবই গড়ে উঠতে সহায়তা করলেন। আর মাও মহিলা সমিতি গড়ে তুললেন। আমরা ছেলেপিলেরা—যোগ দিলাম 'স্কাউটে' আর এক ক্যাম্পে রাত্রিবেলা বড়রা এসেও যোগ দিল অনারারী স্কাউট হিসেবে।

শাসক ডাচদের সম্পর্কে এমন আরও কথা জানতে পারলাম যা আগে আমি কোনদিন শুনিনি। ওরা নাকি 'বোম্বেটে দস্যু', 'চোর' আর 'মিথ্যেবাদী'। একদিন বাবা মাকে বলতে শুনলাম: 'ওরা—ওই ইউরোপীয়ানরা চিরকাল আর কায়েমী হয়ে থাকতে পারবে না।' মা মাথা নাড়লেন। 'তাঁর চোখদুটিতে নেমে এল স্বপ্নের আমেজ। মা যখন বাবার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন আমি তখন চোখ তুলে মা'র দিকে তাকালাম। মনে হল, মা বুঝি আবার 'মা' হতে চলেছেন।

একদিন মা আমায় কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: 'বড় হয়ে আমি কি হতে চাই?' আমি জবাব দিলাম: 'আমি চাষী হব।'

বাবা আমার কথা শুনতে পেয়ে তো অবাক! আমার অনুকরণ করে বলে উঠলেন: 'চাষী হও আর যাই হও, কুড়েমি করা কিন্তু আর চলবে না।'

বাড়ীর পেছনে ছোট্ট একফালি জমি আমায় দেওয়া হল। সেখানে আমি মাটি কুঁড়তাম। আর নিজেকে একজন চাষী মনে করতাম। মা আমায়

উৎসাহ দিতেন। বলতেন, 'কাজ করা খুব ভাল। তাতে হাত পায়ে শক্তি বাড়ে। মগজ খুলে যায়।' আমি যখন আরও বড় হলাম তিনি তখন বলতেন 'ডাচ' সরকার আমাদের দেশ আর শাসন করবে না। কাজেই আমাকে কাজ করতে হবে। • শিখতে হবে'। কেননা অনেক কিছুই তখন আমায় করতে হবে হাতে কলমে।

মা জানালেন বাবা জমিতে অনেক ফলের চারা পুঁতেছেন। গাছগুলি বড় হলে আমরা সারা বছর ধরে অনেক ফল খেতে পারব। সারা বছর ধরে খাওয়া যায় এমন কোন ফলের কথা আমি তখন জানতাম না। তাই জিজ্ঞেস করলাম: 'সেই ফলটা তরমুজ না?' কিন্তু ঐ ফল যে কখনও তরমুজ হতে পারে না তা আমার জানা ছিল না। কিংবা এমন কোন ফল যা আমি দেখিনি। বড় হলে তা জানতে পারব।

আর এক পরিবর্তনও আমি লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ দেখি, গাঁয়ে তৈরী মোটা তাঁতের কাপড় লুরিক—খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মাও দেখি মোটা এক লুরিক 'সারঙ' পরেছেন। আমার তা ভাল লাগল না। কেননা ও কাপড় খুবই মোটা। আর রঙটাও উবে যাবে তাড়াতাড়ি। হারীপ যখন বুঝিয়ে বললেন ভারতের লোকেরাও 'খাদি' কাপড় বা লুরিক পরছেন। আর বিদেশী কাপড় পোড়াচ্ছেন। তখন আমি বলে উঠলাম: 'আহা! তা, আমি হলে কয়েকটা বিলাতী কাপড় তুলে নিতাম!' তখন আমার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। ওদের হাসি দেখে তখন আমি বুঝলাম, বোকার মত আমি কিছু বলে ফেলেছি। মাথাটা আমার ঝুলে পড়ল লজ্জা আর ক্ষোভে। হারীপ আমায় তার কোলের উপর তুলে বসালেন। বললেন, আমাদের লুরিক পরা উচিত। বিলিতি কাপড় নয়। তাহলে আমাদের দেশের লোক যারা লুরিক বোনে তারা খেয়ে পরে বাঁচবে। একেই বলে 'স্বদেশীপনা'।

প্রত্যেক বার যখন গাঁয়ের বুড়ী তাঁতীটি কাপড় নিয়ে আসত মা লুরিকই কিনে রাখতেন। বুড়ী তাঁতীটি তাঁকে বলত, 'গাঁয়ের লোকেরা দিনরাত এখন কেবল কাপড় বুনে চলেছে। ছোট বেলা যেমন সে দেখেছিল, এখন অনেকটা আবার সেই রকম।'

'এখন যে স্বদেশী যুগের হাওয়া বইছে', মা হেসে উঠলেন।

বুড়ীটিও হাসল। বলল, 'গাঁয়ের সকলের মুখেও সেই একই কথা। এ কিন্তু ভালই হল। গাঁয়ের তাঁতীরা এখন নিজ নিজ জমিতে তুলো ফলাতে শুরু করেছে।

বুড়ীটি আরও বলল: 'ওঁর এক প্রতিবেশী মোটরের পুরনো টায়ার দিয়ে জুতো বানাত। সে এখন পনের জন লোক খাটাচ্ছে। আর প্রতি সপ্তাহে ডজন ডজন জুতো 'সমবায় সমিতি'কে করছে বিক্রি।' বুড়ীর কথা শুনে মাও খুশিতে ফেটে পড়লেন।

সপ্তাহে সপ্তাহে মা'র শরীর ভারী হতে লাগল। তিনি আর তেমন চলাফেরা করতে পারতেন না। যে তাঁতটি মা কিনেছিলেন তা এমনি পড়ে রইল। কাপড় বোনার পরিবর্তে মা 'পেণ্ডোপে'র বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বসে বসে পড়তেন। বাবা বাড়ীতে প্রায়ই থাকতেন না। মা'কে যখন বাবার কথা জিজ্ঞেস করতাম, মা খালি হাসতেন। বলতেন, 'আছে কোথাও। ভবিষ্যতের জন্য বীজ বুনছে হয়ত!'

আমাদের বাড়ী ক্রমশঃ একটি অফিস বনে গেল। সারাদিন কেবল, এমন কি রাত্রেও অনেক সময়, টাইপ মেসিনের খটাখট্ শব্দ শোনা যেত। ডুপ্লিকেট করা মেসিনের শব্দও ভেসে আসত। এখানে ওখানে সর্বত্র গাদা গাদা কাগজপত্র। এরই মধ্যে বাবার স্কুলের সব বয়সের ছাত্রসংখ্যা প্রায় চারশ'র মত দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এদের মধ্যে সন্ধ্যেবেলা যারা লেখাপড়া করতে আসত তারাও রয়েছে। আর মাত্র দশ বার জন প্রায় ভাষা শিখতে আসত। তার মধ্যে আমার মনে হয়, সরকারী স্কুলের শিক্ষকও রয়েছেন।

আমার বুকটা গর্বে ফুলে উঠত। বিশেষ করে যখন দেখতাম বাবা আমাদের শহরে বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। লোকজন অনেক সময় আমাকে দেখিয়ে দিত আঙুল দিয়ে, আমি তাঁর ছেলে বলে। কেউ কেউ আবার আমায় থামিয়ে দু'একটি কথা বলত।

আমি অনেক সময় অবাক হয়ে দেখতাম, প্রায় প্রতিদিন দু'তিন জন পুলিশের লোক আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে যাতায়াত করছে। ওরা জানালা আর দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতরে কি হচ্ছে তা দেখে যেত। যখন আমি মা'কে ব্যাপারটা বললাম, মা তখন বললেন: 'তোমার বাবা যা করছেন ওরা যে তা পছন্দ করে না।'

'বাঃ, বাবা না শিক্ষক!' আমি বললাম।

মা তখন বললেন, 'ঐজন্যই তো ওরা বাড়ীর ওপরে নজর রেখেছে। ওরা চায় না আমাদের দেশের লোকজন লেখাপড়া শিখুক।' পরের কয়েক সপ্তাহ তেমন কিছু ঘটল না। তাই পুলিশের কথা আমি বেমালুম ভুলে গেলাম।

হঠাৎ একদিন বাবা বাড়ী ফিরলেন অন্যান্য দিনের চাইতে তাড়াতাড়ি।

তাঁর মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। অসুস্থও।

মা কাছে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, শরীর খারাপ বোধ করছেন কি না।

বাবা মুখ না তুলেই জবাব দিলেন, 'না'। মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বাবাকে বিশ্রাম নিতে বললেন। বাবা মাথা নাড়লেন। বললেন :

'এ তোমার কাজের জন্য নয়। একটা চিঠি এসেছে।'

'কোথাকার চিঠি,' মা জিজ্ঞেস করলেন।

'সরকার থেকে।...রিমাইণ্ডার পাঠিয়েছেন।...অনেকটা ভীতিপ্রদর্শন। আমাকে সব কিছুই বন্ধ করতে হবে।...একেবারে শেষ হয়ে গেলাম। স্কুল... সব কিছুই।'

আমি হারীপের ঘরে ছুটে গেলাম। বলে উঠলাম, 'বাবা আর কাজ করতে পারবেন না।' হারীপ শুধু চোখ তুলে তাকালেন। বাবার মত তিনিও ক্লান্ত। কান পেতে আমার কথা সব শুনলেন। কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। অথচ আমি তাই আশা করেছিলাম।

আমি তখন রান্নাঘরে ছুটে গেলাম 'বাবু'র কাছে। আর তার কাছে গিয়ে বলে ফেললাম : 'বাবা আর কোন কাজ করতে পারবেন না। তাঁকে ইস্কুলের কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।'

বাবু কিন্তু কথাটা একটুও বিশ্বাস করল না। বলে উঠল : 'ও সব বলার কারুর কোন সাহস নেই। জান, জেলার আমলারা পর্যন্ত তোমার বাবাকে কত ভয় করেন!'

জবাবটা শুনে আমি কিছুটা স্বস্তি পেলাম। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্য।

বারান্দায় এক প্রাক্তন ছাত্রকে দেখতে পেলাম। আমি তার কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লাম। কিন্তু দেখলাম আমার চাইতে সে আরও অনেক কিছুই জানে। তার মুখে শুনলাম পুলিশ স্কুলে ঢুকে পেটরা ভর্তি করে সব বই নিয়ে গেছে। স্কুলের বৈদ্যুতিক তারটাও কেটে দিয়ে গেছে, যাতে সন্ধ্যের পর আর কোন ক্লাশ হতে না পারে। এক পুলিশ অফিসার বাবার অফিস ঘরে ঢুকে সব শিক্ষকদের নাকি তলব করেও পাঠিয়েছিলেন।

খাবার ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম বাবা টেবিলে চুপচাপ বসে আছেন। মাথাটি তাঁর দুহাতের তালুর মধ্যে। মা'র প্রবোধ বাক্য বুঝি তাঁর কানেও যাচ্ছে না। তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম।

সেদিন থেকে আমাদের বাড়ীতে আর কেউ দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন না। এমন কি যে সব ছেলে আমার সঙ্গে হামেশা খেলাধুলা করতে আসত তারাও আসা বন্ধ করে দিল। স্কুলটা অবশ্য বন্ধ করে দেওয়া হল না। তবে দু'এক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা তার চল্লিশ জনে এসে ঠেকল। আমাদের বাড়ীতে যে সব ছাত্র থাকত তারা সবাই একে একে চলে গেল।

হারীপ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ঠায় বসে থাকতেন। কথাবার্তা বিশেষ বলতেন না। বই নিয়ে বসতেন কিন্তু এক পঙক্তিও পড়তেন না। অবশেষে তিনিও ছেড়ে গেলেন। তাঁর আর খবর পাই নি।

বাবা আমাদের সঙ্গে কথা বলা একরূপ ছেড়ে দিলেন। হাসতেনও না কখনো। দিনের পর দিন তিনি কেবল শুয়ে থাকতেন সোফায়। রান্নাঘর কি বাগানে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। শীঘ্র লক্ষ্য করলাম বাবা সন্ধ্যের দিকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছেন কয়েক মাস আগে যেমন তিনি নিয়মিত যেতেন। এক সন্ধ্যেবেলা বাবা বেরিয়ে যেতে মা আমায় কাছে ডেকে নিলেন। আমার দু'খানি হাত তাঁর হাতে নিয়ে বলে উঠলেন :

'দেশের সব কিছুই তো বিদেশীরা নিয়ে নিয়েছে আমাদের। বিনিময়ে আমরা পেয়েছি খালি দুঃখ দুর্দশা আর নির্যাতন।'

মা'র গলাটা ধরে এল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর স্থির অবিচল কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে উঠলেন :

'আমার মনে হয় এ ভালই হোল তোর পক্ষে। হারীপ খুব চালাক বটে। তবে ওর মনের তেমন জোর নেই। তোর বাবাও হারীপের মত। তোকে তাই বড় হয়ে পড়াশুনা করে ওঁদের চাইতে আরও বলবান, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে।'

মা আমায় আঁকড়ে ধরলেন। দেখলাম তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

স্কুলে পুলিশ আসার পর থেকে প্রায়ই দেখতাম বাবা কারুর না কারুর বাড়ী গিয়ে তাশ বা পাশা খেলছেন। তাই দেখে আমার খুবই লজ্জা বোধ হোত। কিন্তু বাড়ী এসে কিছু বলতে পারতাম না। তবে বুঝতে পারতাম, বাবা কোথায় যান মা জানেন সব। মা কিন্তু কিছু বলতেন না মুখে।

একবার পরপর পাঁচদিন আমরা কেউ বাবার মুখ দেখতে পেলাম না। তাই তার পরদিন সকাল বেলা মা একখানি ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন : 'যা, বাবাকে দিয়ে আয়!'

মা আর কোন কথা বললেন না। মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। ফুঁপিয়ে বুঝি কেঁদে উঠলেন দু'হাতে মুখ ঢেকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি বাবাকে খুঁজে বেড়ালাম। কিন্তু কোথাও তাঁকে পেলাম না। যে সব বাড়ীতে তিনি সাধারণত জুয়া খেলতে যেতেন, সেখানেও না। ক্লান্ত মনমরা হয়ে আমি পথের ধারে এক জায়গায় বসে একটু জিরিয়ে নিতে লাগলাম। গত কয়েকমাস ধরে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে আমার চোখের উপর তা পরপর ভেসে উঠতে লাগল।

যে ক্লাবঘরটি গড়ে উঠেছিল তা আর নেই। বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলের ছাত্ররা সব চলে গেছে একে একে। হারীপ ও ডাচ শাসক গোষ্ঠী আর পুলিশের কথা আমার তখন মনে পড়ল। চোখের উপর ভেসে উঠল বাবার ঝুলে পড়া মুখখানি। মুখে তাঁর একটুও হাসি নেই। মা যে চিঠিখানি আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন, সহসা তার কথা মনে পড়ল। তাইতো, কি লেখা আছে তাও তো জানি না। পড়াও হয়নি। চিঠিখানি আমি পকেট থেকে বার করে নিলাম। আর মেলে ধরলাম চোখের সামনে। বানান করে পড়তে লাগলাম :

'নবাগত তোমার শিশুটির কথা তুমি কি একবারও ভাব না? বাড়ী এস। যদি আর বাড়ী আসতে না চাও, এ চিঠিখানি পড়ে ভেবে নিও, আমি ঠিক মরব তোমার অনাগত অতিথিকে পেটে নিয়ে।'

আমি যে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত তা ভুলেই গেলাম। বাবাকে খুঁজে বার করতেই হবে। কতক্ষণ এবাড়ী ওবাড়ী ঘোরাঘুরি করলাম জানি না। অবশেষে এক বাড়ীতে তাঁকে দেখতে পেলাম। আমায় দেখে তিনি কটমট করে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু চিঠিখানি পড়ে বলে উঠলেন : 'দাঁড়া, আমি যাচ্ছি।'

আমার আগেই বাবা বাড়ী এসে পৌঁছলেন। এসেই তিনি দিদি আর দাদাদের সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করে দিলেন যেন তিনি যে বাড়ী ফিরেছেন তা বুঝি মাকে জানিয়ে দিতে চান।

সপ্তাহ কয়েক তিনি বাড়ীতেই রইলেন সন্ধ্যেবেলা। আমাদের সঙ্গে খেলাধূলো করতেন। আমাদের ডেকে নিয়ে গল্প করতেন। কিন্তু একদিন তাঁর তিন বন্ধু হঠাৎ এসে হাজির হল বাড়ীতে। মা কিন্তু বাড়ীতে জুয়ার আসর বসতে দিলেন না। বাবাও মুখ ফুটে কোন প্রতিবাদ করলেন না। তবে একটু গড়িমসি করে. তিন ইয়ারের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। বাবার বন্ধুরা তারপর আর কোনদিন আমাদের বাড়ীতে আসেন নি। কিন্তু বাবা আবার বেরিয়ে

যেতে শুরু করলেন। কোন কোন সময় বাড়ীও ফিরতেন না দু'একদিন। টাইপ মেসিন আর আমাদের ডুপ্লিকেট মেসিনগুলো এবং কিছু কিছু আসবাব-পত্র যেদিন গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে গেল পুলিশ এসে, সেদিন বাবাও চলে গেলেন।

মা গাঁয়ের ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে আর তেমন হেসে হেসে কথা বলতেন না। ঠাট্টা তামাশাও করতেন না। তিনি খালি নীরবে মাথা নাড়তেন। কচিৎ দু' একটি কথা বলতেন মুখে। বুড়ী সেই তাঁতীটি আরও একবার এসেছিল। তার মুখেও আর সেই হাসি নেই। দু'একখানি তাঁতের 'লুরিক' কিনবার জন্য অনুনয় বিনয় করল সে মা'র কাছে। গাঁয়ের দুর্দিনের কথা বলল সে।… বলল এখন আর কেউ 'লুরিক' কেনে না। …মুচিরা স্যাণ্ডেল তৈরী করা ছেড়ে দিয়েছে আর শহরে চলে গেছে কুলীগিরি করতে। বলতে বলতে তার বুক থেকে বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ল। তারপর একসময় সে রাস্তায় নেমে গেল।

যে রাত্রে আমার ছোট ভাইটার জন্ম হয় বাবাকে ডেকে আনতে দিদিকে তখন পাঠান হয়। আর আমাকে যেতে হল ধাই-এর খোঁজে।

বাবাকে কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। 'বাবু' আমাদের নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। বলল আমরা যেন গোলমাল না করি।

সকালবেলা উঠেই আমি ভাইকে দেখতে ছুটে গেলাম মায়ের ঘরে। মা চুপচাপ শুয়েছিলেন। আর ছোট্ট 'নরপিণ্ড'টি তাঁর পাশেই শুয়ে আছে। অনেকদিন পর আজ প্রথম মায়ের মুখ দেখলাম খুশিতে জ্বল জ্বল করছে। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন। ক্লান্ত হলেও তৃপ্ত দেখাল তাঁকে। ঠিক এমন সময় দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন বাবা।

'খোকা হয়েছে?' বাবা চীৎকার করে উঠলেন।

'ও কিন্তু ঠিক তার বাবা আর মা থেকে অনেক—অনেক বড় হবে।'

বাবা মা'র শয্যাপাশে এগিয়ে যেতেই মা চাপা বিষণ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন: 'তোমার কিন্তু কিছু ও পাবে না। নিজেকে নিজেই সে গড়ে তুলতে পারবে। এখন জন্মাক বা যে সময়েই জন্মাক না কেন তাতে কিছু এসে যাবে না।'

বাবা কোন জবাব দিলেন না।

আমি বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

কাজেই ছোট ভাইটির যখন জন্ম হল তখন দেশে উত্তেজনার ভাঁটা দেখা

দিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ হ্রাস পেয়েছে। ক্লাব আর স্কুলের দরজা হয়েছে বন্ধ। সরকারী আমলাদের ছেলেপিলেরা আবার সরকারী স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। জুয়াখেলার ভীড় গেছে বেড়ে। আরও বেশী করে পুলিশ হয়েছে মোতায়েন। আমাদের ছোট্ট শহরে সাবেকী জীবনধারা এসেছে ফিরে। এ যেন অনেকটা দিনের আলো মিলিয়ে যাবার আগে রাত্রির আঁধার এল নেমে।

উষা-লগ্নের এখনও বুঝি দেরী অনেক!

অনুবাদঃ নিখিল সেন

আহা!

ইদ্রীস

সুকোবুমি জায়গাটার যা কিছু নাম ডাক তা'হল ওখানকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য। কিন্তু স্টেশনে টিকিট ঘরের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখলে তা' বোঝা যাবে না। ঘামে ওদের পিঠ, ঘাড়, কনুই—এমন কি সার্ট পর্যন্ত ভিজে গেছে। এর-ই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক ঝাঁক মাছি অদূরে ডাষ্টবিনের নোংরা খুঁটে খাচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন কালো কফি সিরাপের উপচে-পড়া কিছুটা অংশ জমাট বেঁধে আছে।

লাইনের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে-থাকা যুবকটি অনবরত কাশছিল। তাকে থুতু ফেলতে দেখে পেছনের লোকটি বললে—'তা বাপু, থুতু ফেলে জায়গাটা নোংরা না করলেই কি নয়?'

যুবকটির নির্লিপ্ত উত্তর—'অত বাছ-বিচার করে থুতু ফেলতে হবে নাকি?'

লোকটি রুমালে নাক ও মুখ চাপা দেয়। বলে, 'অমন করে থুতু ফেলাটা তোমার ভারী অন্যায়। শত হলেও বুকের ব্যারাম। ছোঁয়াচে তো?'

যুবকটির কাশি থামে না। রক্ত-মেশানো এক দলা ঘন সাদা কফ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

লাইনের প্রথম দিকটার ছেঁড়া কাপড় পরা ইন্দোনেশীয় লোকটি লিকলিকে হাত দু'টো বুকিং ক্লার্কের দিকে বাড়িয়ে বলে চলেছে—'শুনছেন মশাই, জাকার্তা, একটা ফোর্থ ক্লাস।'

কেরানীটি রেগে গিয়ে বলে—'সবুর না সইলে কেটে পড়ো বাপু।'

লোকটি জবাব দেয়—'ইয়ার্কি নাকি?' আধঘণ্টার ওপর লাইনে দাঁড়িয়ে অথচ টিকিটের বেলায় অষ্টরম্ভা।' টিকিট ঘরের ভেতরে দাঁড়ানো একটি লোককে দেখিয়ে বলে—'ওই যে লোকটি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার পেছনে দাঁড়ানো ঐ লোকটা তো বেশ দিব্যি কাজ গুছিয়ে নিল দেখছি।'

কেরানীবাবুর রাগটা চড়ে যায়। ধমকে বলে—'সেটা তোমার দেখার কথা নয়। তাড়াতাড়ি কাজ পেতে হলে কিছু ছাড়তে হয়, বুঝলে ভায়া?'

ইন্দোনেশীয়টি চুপসে যায়। কি-ই বা বলবে সে? দোষ দেবে কাকে? আজকাল তো সবাই এ-ভাবেই টু-পাইস করে খাচ্ছে। সে-ও তো

এই দলেই। তার দৃষ্টি পায়ের কাছে রাখা চালের থলিটার ওপর গিয়ে পড়ে।

একজন চীনা ভদ্রলোক এর-ই মধ্যে লাইন থেকে বেরিয়ে আসে। রুমালে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কাছে আসতেই ইন্দোনেশীয় লোকটি বলে—'অমন করে লাইন ভাঙবেন না মশাই। সবাই ও-রকম করলে ধাক্কাধাক্কিটাই সার হবে। টিকিট মিলবে না।'

'বক্‌বক্‌ করবেন না'—চীনা লোকটি বলে। –'জানেন, আমি কে? আমার কাছে জাপানী পাশ আছে।'

কেরানীবাবুকে উদ্দেশ করে বলে—'একটা সেকেণ্ড ক্লাস, জাকার্তা।'

কেরানীবাবু বললে—'সেকেণ্ড ক্লাস শুধু জাপানীদের জন্য।'

মুচকি হেসে চীনা ভদ্রলোক জাপানী পাশ বার করে। পাঁচ রুপিয়ার একটা নোট এগিয়ে দিয়ে বলে--'জাকার্তার টিকিট আড়াই রুপিয়ার বেশী নিশ্চয়ই হবে না! বাকীটা ....'

কেরানীবাবু টাকাটা লুফে নেয়। আপ্‌সে টিকিট বেরিয়ে আসে।

সুকোবুমি স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কামরাগুলিতে এক গাদা ভীড়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিভৃত পরিবেশে চীনা লোকটি কামরার এক কোণে বসা তন্বীটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। দু'একটা রসিকতা করার চেষ্টা করে।

টিকিট চেকার চতুর্থ শ্রেণীর কামরায় আসে। 'টিকিট' বলে হাঁক দিতেই যাত্রীরা পয়সা বার করতে থাকে। না বুঝবার ভান করে চেকারবাবু বলে—'টিকিট না কিনে গাড়ী চড়া কেন? প্ল্যাটফর্মে ঢুকলে কী করে?'

একটি যাত্রী বলে—'গেটের লোকটাকে আমরা সবাই কিছু না কিছু দিয়েছি।'

চেকারবাবু উত্তর না দিয়ে পয়সাগুলো পকেটে পুরে। যাবার সময় উপদেশ দিয়ে যায়—'এরপর টিকিট না কেটে গাড়ী চড়লে অসুবিধায় পড়তে হবে।'

একটি ছোট স্টেশনে গাড়ী থামলে একদল হোমগার্ড সারাটা কামরা তন্ন তন্ন করে কি যেন খোঁজে। লুকোনো চালের বস্তাগুলি প্ল্যাটফর্মে নামায়। চাল-পাচারকারীদের মারধোর করে। একটা সিটের ওপর চালের থলি দেখে 'ওটা কার' জিজ্ঞেস করতেই একজন পুলিশ কবুল করে ওটা তার। হোমগার্ডটি ক্ষমা চেয়ে নেয়।

ট্রেনটা ছাড়বে এমন সময় একজন আরবী গাড়ীতে ওঠে। ভীড় দেখে স্বগতোক্তি করে—ইনসাল্লা—তোমার মর্জি! আরবীটির পেছনে শতছিন্ন সার্ট পরা এক যুবকও গাড়ীতে ওঠে। তার বাঁ পাটা কাটা। ভেতরে জায়গা না থাকায় হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে থাকে সে।

আরব দেশীয় লোকটি বলে, 'যাবে কোথায়? অমনটি ক'রে ঝুলে যেতে পারবে?'

যুবকটি বলে—'জাকার্তায় যাব। পরের স্টেশনগুলিতে নিশ্চয়ই লোক নামবে। তখন ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করব।'

ট্রেন চলতে থাকে।

চতুর্থ শ্রেণীতে মোতায়েন পুলিশটি একটি যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় পিঠটায় তার একটা কুঁজ। পুলিশটি কাছে এসে জিজ্ঞেস করে—'তোমার বয়েস কত?'

যুবতী বলে—'বত্রিশ।'

পুলিশটি কাছে আসে। যুবতীটির পিঠের ওপর হাত রাখতে বুঝতে পারে আসল রহস্যটা কোথায়! মুখে বলে—'আহা, এ বয়সে মেয়েদের কুঁজো হয়ে যাওয়াটা বড্ড বেমানান। তা যাক, তোমার চালের থলিটা দাও। নইলে হোমগার্ডরা ছিনিয়ে নেবে। জাকার্তা পৌছে তোমারটা তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। ভয় নেই।'

কাপড়ের তলায় লুকোনো চালের থলিটা যুবতীটি বের করে দেয়।

বোগরের কাছাকাছি আসতে এক-পেয়ে যুবকটি হাত ফস্কে নীচে পড়ে যায়। চেন টানতে গাড়ী থামে। কিছু লোক দৌড়ে লাইনের দিকে যায়। যুবকটি মরে গেছে। আরব লোকটির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে 'অস্তাগাফির আল্লা, অস্তাগাফির আল্লা—আল্লা, আমায় ক্ষমা করো, ক্ষমা করো!'

জাকার্তায় গাড়ী পৌছাতে যাত্রীরা স্টেশনের বাইরে যাবার জন্ম ছুটতে থাকে।

একটা গেটের কাছে তখন একটি স্ত্রীলোক কেঁদে চলেছে। চালের ব্যাগ হাতে কোন পুলিশকে কিন্তু তার কাছে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না।

অনুবাদ: মৃণালকান্তি কাঞ্জিলাল

হাজী জ্যাকারিয়ার লটারী

মোচতার লুবিস

বাসে করে কেরিনচি যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে তখন আমার হাজী জ্যাকারিয়ার কথা মনে পড়ে। চৌদ্দ বছরেরও বেশী ওঁকে আমি দেখিনি। সম্প্রতি বাবা মারা গিয়েছিলেন। সুমাত্রায় আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে মাকে সান্ত্বনা দিতে আমি তাই যাচ্ছিলাম কেরিনচি। বাবার মৃত্যুর পর জমি-জমা বিষয় আশয়ের তদারকও একবার করে আসতে হবে। ওখানে বাবার একটি ছোট রবারের বাগান ছিল। কেরিনচিতে গিয়ে আমায় হাজী জ্যাকারিয়ার বাড়ীতেই উঠতে হবে।

প্রথম ধাক্কায় তো শুধু বাস ছাড়া আর কিছু কিংবা কারোর কথা মনেই আসে নি। কেরিনচি যাত্রা আমি পছন্দ করি নি। কেননা আমি জানতাম, পেদাঙ থেকে কেরিনচি-র শেষপ্রান্ত সুঙ্গারপেনি পর্যন্ত মোটর গাড়ীর রাস্তাটা যতদূর সম্ভব খারাপ হতে পারে তাই। পথে রয়েছে অনেকগুলি বড় বড় নদী। ভেলায় করে পার হতে হয় সেগুলো। রাস্তাও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়েছে এঁকে বেঁকে চড়াই উতরাই-এর পথ ধরে। তবু কিন্তু আমি মা'য়ের ডাক ফেলতে পারি নি। পথে যে কষ্ট পেতে হবে আমি প্রথম থেকেই তা ধরে নিয়েছিলাম।

কোন সাংঘাতিক বিপদ যে ঘটেনি তা নয়। দু'বারই আমাদের বাসের এ্যাক্সল ভেঙ্গে যায়। এবং এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। আশু মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেয়েও নিষ্কৃতি নেই। এক যুবক ফিরছিল পারিয়ামন মক্তব থেকে। যাত্রার শুরু থেকেই সে গলা ছেড়ে কোরান পাঠ করতে লেগে গেল। ওর পাশে যে যাত্রীটি বসেছিলেন বাসের ঝাঁকুনি, পথের ধকল আর গুমোটে তাঁর প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। তার উপর যুবকের হেঁড়ে গলায় কোরান পাঠের চোটে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিরিক্ষি গলায় বলে উঠলেন: 'থাম তো বাপু!'

যুবকটি কিন্তু থামবার নাম করল না। বরং গলা ছেড়ে আরও জোরে করে চললো কোরান পাঠ।

অসুস্থ ভদ্রলোকটি তখন অধৈর্য হয়ে উঠলেন। রেগে গিয়ে ওকে গান বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

'নিপাত যা ব্যাটা কাফের।' যুবকটি সমান গলায় বলে উঠল।

জামার নীচে কোমরের লম্বা ছুরিটায় হাত রেখে বলে উঠল: 'পবিত্র কোরান পাঠ করছি, আর তুই শালা, আমায় চুপ করতে বলিস কোন মুখে?'

যুবকটি তারপর আরবী ভাষায় কি যেন বলে গেল অনেকক্ষণ ধরে। নিজেদের অবোধ্য কথ্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগল অসুস্থ লোকটিকে। মুখ খিস্তি করে শ্রাদ্ধ করতে বসল ওর চৌদ্দ পুরুষের। যুবকটি তারপর সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। যাচাই করে নিল কেউ তাকে প্রতিবাদ করতে চায় কিনা। প্রতিপক্ষ তার কেউ নেই বুঝতে পেরে সে এক সময় শান্ত হল। অসুস্থ সহযাত্রীটিকে খুন করার মতলবটা বুঝি ভুলে গেল। আর তারপর নিজ মনে আরও জোরে জোরে কোরান থেকে আবৃত্তি করতে শুরু করল।

সে যাই হোক ভাঙ্গা এ্যাক্সল-এর ঝাঁকুনি, চড়াই উতরাই পথের ধকল আর ধর্মান্ধ যুবকের একঘেয়ে চীৎকার ক্রমশ গা সওয়া হয়ে উঠল।

আমি আবার হাজী জ্যাকারিয়ার কথা ভাবতে লাগলাম। অনেকদিন আগেকার কথা। বাবা তখন কেরিনচির ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার ছিলেন। আমি তখন ছোট। তাহলেও হাজী জ্যাকারিয়ার কথা আমার বেশ মনে আছে। অমন দয়ালু লোক আমি কখনও দেখিনি।

প্রতিবারই যখন মাঠের ফসল ঘরে উঠত তিনি তখন মার কাছে নতুন ধান, নতুন শাক-সব্জি পাঠাতে ভুলতেন না। মা সেই নবান্ন দিয়ে কত রকমের পিঠে করতেন। প্রতিবারই শিকার থেকে ফিরে তিনি মা'র কাছে হরিণ মাংসের শুকনো নরম ফালি পাঠাতেন। আর রমজান মাসের শেষে 'লেবারন' উৎসবের দিন ছোটদের জন্য তিনি পাঠিয়ে দিতেন বহু উপহার। তাদের মধ্যে আতসবাজীগুলো ছিল সবচেয়ে সেরা। একবার বাবা বাজীর প্যাকেট খুলে এক ডিনামাইট বাজী পেয়ে গিয়েছিলেন। হাজী জ্যাকারিয়াকে আমরা পরিবারের একজন ভাবতাম। এমন স্নেহশীল সদাশয় চাচা আর কখনও দেখিনি। তিনি খুবই বড় লোক। তাঁর ছিল বিস্তর ধানের জমি। তখনকার দিনে যখন কফির দাম খুব চড়া ছিল, তিনি তখন অনেকখানি জমি নিয়ে কফির চাষ করতেন এবং 'রোবাস্তা' ও

'আরাবিকা' জাতের দামী কফি ফলাতেন।

বাবারও ছোট একখণ্ড কফি ক্ষেত ছিল। তবে সেটা ছিল খুব ছোট। রবারের দাম যখন বাজারে চড়া হতে থাকে তখন বাবা কফির গাছগুলো কেটে তার জায়গায় রবারের গাছ পুঁতবেন বলে ঠিক করলেন। হাজী জ্যাকারিয়া বাবাকে তখন রবারের গাছ পুঁততে নিষেধ করলেন। কিন্তু বাবা আশঙ্কা করলেন দুদিন পরে কফির দাম পড়তে থাকবে কিন্তু রবারের দাম পড়বে না। হাজী জ্যাকারিয়া কিন্তু বাবার কথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন: 'লোকে চিরদিন কফি খাবে, রবারের রস খাবে না।'

প্রতিবছর নববর্ষের সময় তিনি বাবা আর মা 'মক্কা' তীর্থযাত্রার সংকল্প করতেন। কিন্তু হাজী জ্যাকারিয়াই কেবল একা যেতেন। বাবা ও মা কোনবারই মক্কায় যান নি। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে তাঁদের 'হজযাত্রা'-র টাকা ছিল না। প্রতিবারই তাই হাজী জ্যাকারিয়া বাবাকে পাথেয়র টাকা দিতে চেয়েছেন। বাবাকে বলেছেন: 'আচ্ছা, জেলার কমিশনার ভাই, তুমি তোমার বন্ধুর প্রতি অমন নিষ্ঠুর কেন বলতো? আমার টাকা কি তোমার নয়? আমার বাড়ী কি তোমারও বাড়ী নয়? আমার টাকা যদি তুমি দান হিসাবে নিতে না চাও তাহলে দেনা হিসাবেও তো নিতে পার? পরে যখন খুশি তখন ফিরিয়ে দিতে পার।'

বাবা কিন্তু হেসে উঠতেন। প্রতিবারই ওঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতেন। আর হাজী জ্যাকারিয়া রেগে-মেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতেন। তারপর যখন যাত্রার সময় হত তখন একাই তিনি প্রতিবার 'হজযাত্রী' হতেন। তারপর যখন 'মক্কা তীর্থ' থেকে বাড়ী ফিরতেন প্রতিবারই মার জন্যে 'রেড-সী' লাল পাথর আনতে ভুলতেন না। মক্কার কোন পবিত্র গাছের ডালও সঙ্গে আনতেন আর তা দাঁতন হিসেবে ব্যবহৃত হত। বোতলে করে ওখানকার 'যাম-যাম' পবিত্র জলও আনতেন।

আমি তারপর জানতে পারি হাজী জ্যাকারিয়া কত ভালবাসেন লটারী খেলতে। প্রতিমাসে তিনি চার পাঁচ শ' 'রুপেয়া'র লটারীর টিকিট আনিয়ে নিতেন পাদান থেকে। তখনকার দিনে ঐ 'রুপেয়া'র দাম ছিল এখনকার প্রায় তিন শ' ডলারের মত। আমি যতদূর জানি কোনবারই তিনি লটারীতে জেতেন নি। তবুও কখনও তিনি পুরনো টিকিট ফেলে দিতেন না। সংগ্রহ করে রেখে দিতেন। আমার মনে আছে একবার 'লেবারন' উৎসবের দিন রাত্রে বাবা আর মা আমায় ওঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে

করে। তখন তিনি লটারীর গল্প বলেছিলেন আমাদের।

'একবার ভাই হয়েছে কি,' তিনি একটু থেমে বললেন: 'গতমাসে একটুর জন্যে বড় একটা পুরস্কার খোয়ালাম। লটারীতে যে নম্বর উঠল তা হল ৫৬৭৮৮৯ আর আমার টিকিটের নম্বর হল ৫৬৭৮৮৮। সামান্য একটুর জন্য আর বাজী জিততে পারলাম না, ভাই। আসছে মাসে আমি আরও অনেক টিকিট কিনব।'

বাবা লটারী খেলাকে জুয়াখেলার মত ভাবতেন। তাই হাজী জ্যাকারিয়ার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। দু' জনের মধ্যে এ নিয়ে কথা কাটাকাটিও কম হত না। একবার তো বাবা ফস করে শুধিয়ে বসলেন: 'আচ্ছা হাজী, একবারও তো লটারীতে জিততে পারলে না। তবুও এ পর্যন্ত কত টাকা লটারীতে তুমি জলে দিলে তার হিসেব রেখেছ?'

হাজী জ্যাকারিয়া পাশের ঘরে ছুটে গেলেন। একটু পরেই প্রকাণ্ড একটি টিনের ট্রাঙ্ক নিয়ে ফিরে এলেন। ওরই মধ্যে সারি সারি লটারীর টিকিট সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

'এখানে টিকিট হবে প্রায় 'হাজার দশেক রুপেয়া'র মত। তোরঙ্গের উপর হাতের তালু দিয়ে থাপ্পড় মেরে হাজী জ্যাকারিয়া বলে উঠলেন—'এ হল ভাগ্যের খেলা ভাই। যদি তুমি জেত, তাহলে তোমার কপালে জুটে গেল বিস্তর টাকা। আর যদি তুমি হার, তা' মাসে পাঁচশো কি আটশো রুপেয়া, তাতে অমন কি এসে যায়?'

বাবা মাথা নাড়লেন। বললেন: 'এসব কাগজের টিকিট নিয়ে তুমি আর কি করবে? আমি বলি কি ওসব অলক্ষুণে জঞ্জাল ফেলে দাও। ও তুলে রাখলে তুমি মনে খালি কষ্ট পাবে?'

হাজী জ্যাকারিয়া উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন: 'না।' তিনি বুঝিয়ে বললেন: 'লটারীর মজা তো এখানেই। তুমি যখন বড়রকম কোন পুরস্কার জিতবে তখন মনে হবে তার কথা। এক কিংবা দুই সংখ্যারই খালি তফাত।'

আমার কল্পনার সূত্র ছিন্ন হল। আমাদের বাস হাজী জ্যাকারিয়ার বাড়ীর সামনে এসে থামল। আর আমি নেমে পড়লাম লাফিয়ে।

হাজী জ্যাকারিয়া বাইরের দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি যেন এখনও ছোট শিশু! যখন বাড়ীর ভিতরে গেলাম তখন তাঁর স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা

সবাই আমায় ঘিরে ধরল। স্বাগত জানাল। খাবার তৈরী ছিল। খাওয়া-দাওয়া সারার পর আমার মনে হ'ল প্রকাণ্ড বাড়ীটার কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। কি রকম যেন খালি খালি ঠেকছে। মেঝের পুরু গালিচাটাকে আর দেখতে পেলাম না। ছেলেপিলেদের হৈ-চৈও তেমন আর শুনতে পেলাম না।

অবশ্য, ওরা এখন সব বড় হয়ে গেছে। ওঁর ছয় ছেলে মেয়ে। এখন খালি একটি মেয়ে মেরিয়াম-ই বাড়ীতে আছে। ওর বিয়ে হয় নি। ছেলেবেলায় ও আমাদের সঙ্গে খেলত। কিন্তু এখন সে বড় হয়েছে। হয়েছে সুন্দরী যুবতী। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হাজী জ্যাকারিয়া আমার সঙ্গে গল্প করে চললেন। ফেলে আসা পুরনো দিনগুলির কথা বলতে লাগলেন। আমায় দেখে তিনি কত খুশি হয়েছেন। বাবা আর নেই শুনে তিনি বারবার দুঃখ করতে লাগলেন। তাঁর বিবাহিত ছেলেমেয়েরা সব চলে গেল। মেরিয়ামও তার মা'র কাছে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। হাজী জ্যাকারিয়া সহসা বলে উঠলেন:

'জান বাবা, আমাদের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। বহু বছর আগে কফির বাজার যখন পড়তে শুরু করে আমি তখন তোমার বাবার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলাম। আমার কফি গাছগুলো সব কেটে রবারের চাষ করলাম। কিন্তু যখন রবারের গাছগুলো বড় হয়ে উঠল তখন তার বাজার আবার পড়তে শুরু করল। বোকার মত আমি তখন করলাম কি, রবার গাছ কেটে কফির গাছ পুঁততে শুরু করলাম। কিন্তু কফির দাম আর তেজি হল না। তোমার বাবার কপাল খুব ভাল। রবারের বাজার যখন মন্দা তখনও তিনি রবারের ব্যবসায় লেগে থাকেন। তারপর কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হল। তখন রবারের বাজার আগুন হয়ে উঠলো। বেশ দু'পয়সা তা থেকে পাওয়া গেল। তোমার বাবা বাগান দেখাশুনার ভারও আমার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে আমাদেরও কিছুটা সুরাহা হ'ল। এখন আবার রবারের দাম পড়তে শুরু করেছে।'

তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন। একটু থেমে আবার বললেন: 'এরপর কি হবে জানি না।'

আমার এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যটি আমি এবার তাঁকে জানালাম। বললাম: 'মা আপনার কাছে বলে পাঠিয়েছেন রবার বাগানের দেখাশুনার কাজ আপনি যেন করেন। বাবা তো আর নেই। মা যা বলবেন তাই হবে।'

সন্ধ্যেবেলা তিনি মসজিদে গেলেন নমাজ করতে। মেরিয়াম আমার সঙ্গে কথা বলতে এল। তখন শুনলাম কফির বাজার যখন পড়ে যায় তখনও তার বাবা তাতে গুরুত্ব দেন নি। প্রতিবারের মত মক্কায় গিয়েছেন। গাদা গাদা লটারীর টিকিট কিনেছেন আগেকার মত। পরে অবশ্য প্রতি বছরই তিনি তাঁর কিছু ধানী জমি বেচে আসছেন 'হজযাত্রা'-র পাথেয় যোগাতে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় আঘাত আসে জাপানী সামরিক অধিকারের সময়। হাজী জ্যাকারিয়া ছিলেন দেশব্রতী। তাঁর ছেলেরা বিপ্লবী ফৌজে যোগ দিয়েছিল। রিপাবলিকান ন্যাশনাল বণ্ড কিনতে গিয়ে তিনি তাঁর অনেক ধানী জমিই বিক্রী করে দিয়েছিলেন। শুধু দেশের কাজ নয়। রিপাবলিকান সরকার ন্যাশনাল বণ্ডের জন্য শুদ দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং দু-তিন বছরের মধ্যে মূল লগ্নী টাকাও শোধ দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া যখন স্বাধীনতা লাভ করল, জাতীয় সরকার তখন ন্যাশনাল বণ্ডের ঋণ পরিশোধ করে উঠতে আর পারেন নি। তারপর শুরু কোরিয়ার যুদ্ধ। সৌভাগ্য বশতঃ বাবা তখন হাজী জ্যাকারিয়াকে তাঁর রবার বাগান তদারক করতে নির্দেশ দেন। এবং সেই লভ্যাংশের অর্ধেক দিয়ে দেন তাঁকে।

মেরিয়ামের মুখ থেকে আরও শুনলাম, হাজী জ্যাকারিয়ার অবস্থা আর পাঁচ জনের চাইতে নেহাৎ মন্দ নয়। তাঁর সব ছেলেরাই কাজ-কর্ম করছে। এবং বাবাকে তারা সাহায্যও করে থাকে। শুধু তাই নয়, তাঁর এখনও কিছু ধানী জমি আছে। এবং তা থেকে বছরের ধানটা কুলিয়ে যায়। কিনতে হয় না।

'কিন্তু', মেরিয়াম আরও বললে: 'বাবার দুঃখ তিনি আর লটারী খেলতে পারেন না। প্রতি বছর মক্কা যাবার রুপেয়াও জোগাড় করতে পারেন না।'

পরে হাজী জ্যাকারিয়া যখন মসজিদ থেকে নমাজ সেরে বাড়ী ফিরলেন আমার মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। আমি খামকা প্রশ্ন করে বসলাম, তিনি কত টাকার লটারী কিনেছেন।

তাঁর মুখখানি তখন রাঙা হয়ে উঠল। তিনি শোবার ঘরে গিয়ে টিনের সেই বড় তোরঙ্গটি নিয়ে এলেন। তোরঙ্গ খুলে বললেন: 'তোমার তো মনে আছে প্রতি মাসে আমি লটারীর টিকিট কিনে থাকি। একটুর জন্যে জিততে জিততেও জেতা হয়ে ওঠে নি। আচ্ছা, একবার হিসেব করে দেখ তো এর দাম কত হয়?'

'তা হাজার কয়েক রুপেয়া হবে নিশ্চয়।' আমি জবাব দিলাম।

'না, হাজার কয়েক নয়, বাছা। আমি জানি এতে আছে ছাপান্ন হাজার রুপেয়ার লটারী। কমও নয়, বেশীও নয়। ঠিক ছাপান্ন হাজার। তা সেকেলে রুপেয়া। এখনকার মত নয়।'

'তবু আপনি কখনও জিততে পারলেন না!' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'না বাবা, জেতা আর হল না।' তিনি জবাব দিলেন। তারপর একটু হেসে তোরঙ্গটা বন্ধ করে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন: 'এখন বাছা নিশ্চিন্তে ঘুমাও।'

'ছাপ্পান্ন হাজার রুপেয়া! বলেন কি?' আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম। 'এসব সেকেলে টাকা। এখনকার দিনে ও টাকার দাম লাখ টাকারও বেশী! ঐ রুপেয়া দিয়ে আজ আপনি কি না হতে পারতেন? কত বড় মানুষই না করতে পারতেন!'

হাজী জ্যাকারিয়া সহসা দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর হেসে উঠলেন হা হা করে। হঠাৎ হাসিটা তাঁর থেমে গেল। মুখে নেমে এল কালো ছায়া। তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন অপরিচিতের মত। তারপর বিড় বিড় করে বলে উঠলেন: 'তুমি বড় বাজে বক। এখন ভাল করে ঘুমাও দেখি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছ নিশ্চয়।'

আমার ঘরখানি ছিল ওঁরা দুজন আর মেরিয়ামের ঘরের মাঝখানে। পাশের ঘর থেকে আমি মেরিয়ামের অস্থিরতা টের পেলাম। সে জেগে আছে আর আমি যে এর জন্য দায়ী তা বুঝতে আমার একটুও দেরী হল না।

মাস খানেক হল আমি জাকার্তায় ফিরে এসেছি। এসে মেরিয়ামের একখানি চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, আমার যাবার পর থেকে বাবা খুব অস্থির হয়ে উঠেছেন। প্রায়ই তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে থাকেন। একদিন দেখা গেল তিনি তার লটারীর তোরঙ্গটা খুলে ব্যস্ত হয়ে টিকিট গুনতে বসে গেছেন। এখন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন কারুর সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলেন না। চুপ চাপ থাকেন। একবার হয়েছে কি, তিনি তাঁর বন্দুক নিয়ে শিকারে যান। কিন্তু ফিরে আসেন খালি হাতে। কোথায় গিয়েছিলেন, কিংবা কি ঘটেছে কিছুই তিনি বললেন না। আশেপাশের লেক-এ কত বুনো হাঁস ঘুরে বেড়ায়। তাঁর গুলিতে একটা হাঁসও যে ঘায়েল হল না, তা কখনও হতে পারে না।

আমি মেরিয়ামের চিঠির জবাব দিলাম। লিখলাম তুমি চিন্তা কোরো না। বুড়োদের নানান ঝামেলা। দু'দিনেই সামলে উঠবেন।

সপ্তাহ খানেক পরে মেরিয়ামের কাছ থেকে একখানি টেলিগ্রাম পেলাম। মেরিয়াম জানিয়েছে তার বাবা আর নেই। তার-বার্তার পর যে চিঠিখানি পেলাম তাতে জানতে পারলাম হাজী জ্যাকারিয়া তাঁর শোবার ঘর বন্ধ করে আত্মহত্যা করেছেন। নিজের বন্দুক দিয়ে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিয়েছেন। দরজা ভেঙে সবাই ভেতরে ঢুকে দেখে তিনি ঘরের মাঝখানটায় উপুর হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর লটারীর টিকিটগুলো আর রিপাবলিক্যান ন্যাশন্যাল বণ্ডের কাগজগুলি টাটকা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মা'ও ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

মেরিয়াম আরও লিখেছে, তাঁরও কখন কি হয় বলা যায় না। আমি মহা ফাঁপড়ে পড়লাম। আমি কি করি?

রাতের পর রাত আমার চোখের ঘুম উবে গেল। নিজেকে আমি অপরাধী মনে করতে লাগলাম। আমি খুন করেছি হাজী জ্যাকারিয়াকে কেন আমি লটারীর টিকিটের কথা তাঁকে বলতে গেলাম! ঐ দুঃখেই তো তিনি আত্মঘাতী হলেন। ওটাই তাঁর কাল হয়েছে।

মেরিয়ামকে আমি ভালবাসি। কিন্তু পিতৃহন্তাকে কি তাঁর কন্যা সাদী করতে রাজী হবে?

মেরিয়ামকে বিয়ে করে সুখী হতে পারতাম যদি আমি ভুলতে পারতাম হাজী জ্যাকারিয়া লটারীর জন্য আত্মঘাতী হয়েছেন! যদি আমি মনে করতে পারতাম রিপাবলিক্যান ন্যাশান্যাল বণ্ড-এর প্রতিশ্রুতি লগ্নি টাকা তিনি পাননি বলেই তিনি দুঃখে আত্মহত্যা করেছেন!

অনুবাদ: নিখিল সেন

থাই ছোটগল্প

থাই মানে স্বাধীন। সিয়ামের অধিবাসীরা নিজেদের থাই বা স্বাধীন দেশের বাসিন্দা বলে অভিহিত করে থাকেন ভারতের 'ত্রিশরণ মহামন্ত্র' কোন সুদূর অতীতে সিয়ামের কানে এসে পৌঁছেছিল কেউ তা জানে না আজ। কিন্তু সিয়াম তার ভাষায়, ভক্তিতে, তার সুন্দরের তপস্যাতে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অর্ঘ্য গেছে রচনা করে। তাই থাইসাহিত্যে ও শিল্পকলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। অধিকাংশ প্রাচীন থাই পুঁথির কাহিনীই ভারতের রামায়ণ মহাভারত আর বৌদ্ধ জাতক থেকে সংগৃহীত।

কাব্য কাহিনীই ছিল থাইসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। কথাশিল্প বেশী দিনকার নয়। রাজা বিজয়ায়ুধের হাতে আধুনিক থাই কথাশিল্প পুষ্টি লাভ করে। রাজপুত্র বিত্তালঙ্করণ, চাও পিয়া তমসক মন্ত্রী, পিয়া সুরেন্দ্র রাজা, চিট্ বুড়া ঠাট, শ্রীমতী সুরঙ্গথান্নাঙ্গ, প্রতুমবথা জেং, 'দক মাই সদ', প্রিন্স আকাত দাম কোয়েভ প্রমুখ কথাশিল্পীদের হাতে আধুনিক থাই কথাসাহিত্য প্রসার লাভ করেছে অনেকখানি। তাঁদের মধ্যে শি বুড়াফা, সৎকুমার রহিত, থুকৃত প্রামুজ প্রমুখর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমার থাই বেড়াল

প্রতুমরথা জেং

সিঈ সোয়ার্দ ছিল আমার থাই বা সিয়ামী বেড়াল। থাকত আমার দেশের বাড়ি মুয়াঙে, উত্তর থাইল্যাণ্ডের একটি গ্রামে। আমার বয়স যখন পাঁচ তখন আমার বাবার এক বন্ধু এটি উপহার দিয়েছিলেন। তার চোখ দুটো ছিল জলজলে নীল, খয়েরি নরম লোম ছিল শরীরে। সব সময় জিভ দিয়ে চেটে সে তা পরিপাটি রাখত। খুব ভালবাসতাম তাকে। আমাদের বাড়ির সবার কাছেই ও ছিল খুব প্রিয়। পরে আমাদের সারা এলাকাতেই ও খুব পরিচিত হয়ে পড়ে।

১৯৫২ সালে দারুণ খরার সময় আমাদের সিঈ সোয়ার্দ তো রীতিমত নায়িকা হয়ে ওঠে। তাকে বৃষ্টির রানী নির্বাচিত করা হয়।

সেবার গ্রীষ্মে তিনমাস আমাদের ওখানে কোন বৃষ্টি হয়নি। শুকনো খটখটে গরম। কুয়োতে জল নেই, শুধু কাদা। নদীর ধারা একেবারে তিরতির করে বইছে। ঘাস ও গাছগুলো শুকিয়ে কাঠ। আমাদের খামারের অনেক গরু মোষ গরমে মারা গেলে বাকীগুলোকে আমরা নিয়ে গেলাম অনেক দূরে উত্তরে মুন নদীতীরে চরে খাবার জন্য। মনে হল সে বছর আর চাষবাস কিছু হবে না। একেবারে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়লাম আমরা। অন্যান্য অঞ্চল থেকে দাবদাহের খবর আসতে লাগল। গাঁয়ের মানুষজন নতুন চাষবাসের জায়গার সন্ধানে দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে চলে গেল।

প্রত্যেকদিন গ্রামবাসীরা বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে জড়ো হত বৃষ্টির প্রার্থনায়। সারা দিন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করতেন আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাবার জন্য। চাষীরা সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের একমাত্র ধ্যান—বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি।

তখন কেউ পরামর্শ দিল আমরা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ বৃষ্টির উৎসব পালন করি না কেন। চাষীরা তো এ-উৎসব আবহমানকাল থেকে পালন করে আসছে।

কবে যে এই বৃষ্টির উৎসবের সুরু কেউ তা বলতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে

বরুণ হলেন বৃষ্টির দেবতা। তাঁকে অবশ্যই তুষ্ট করতে হয়। বরুণ ছিলেন সমুদ্র, জল বা বৃষ্টির অধিপতি। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রাচীন। সমগ্র আকাশের বিগ্রহ স্বরূপ, স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা। গল্পে আছে, এই জঙ্গী মেজাজী বরুণ একবার মাদী বেড়ালের রূপ ধরে এক দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধে তিনি জয়ী হন এবং এভাবেই তিনি বসুন্ধরাকে দেন বৃষ্টি আর শস্য সম্পদ।

থাই দেশের চাষীরা বরুণের গল্প শুনেছে কিনা জানি না। তারা শুধু বৃষ্টির দেবতা বরুণকে তুষ্ট করবার কথাই সে সময় চিন্তা করছিল। একদিন এক বৃদ্ধা তার সাথীদের নিয়ে এল আমার বাবার কাছে, বৃষ্টির উৎসবে তাঁর সাহায্য চাইতে। সেদিন বাবা এসে আমার বেড়ালটা চাইলেন। সিঙ্গী সোয়ার্দের মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, মাই হু (আমার নেংটি ইঁদুর) গাঁয়ের লোকেরা আমাদের সাহায্য চাইছে। বৃষ্টির উৎসবের জন্য আমি কথা দিয়েছি আমাদের বেড়ালটা—তোমার সিঙ্গী সোয়ার্দকে কাজে লাগাতে দেব।

বাবাব কথা শুনে আমি তো অবাক। বৃষ্টির জন্য আমার বেড়ালকে কি ভাবে ওরা কাজে লাগাবে? আমার মনে পড়ে গেল চীনেরা কিভাবে তাদের বাৎসরিক ভূত-চীনে পরবে মুর্গীছানাগুলোকে মেরে সেদ্ধ করে। ওদের পূর্ব-পুরুষদের স্মরণে এগুলো ওরা উৎসর্গ করে। এই মুর্গীছানাগুলোর মতো আমার বেড়ালকে ওরা কেটে সেদ্ধ করবে? ওহ, না, না!

আমি প্রায় চিৎকার করে প্রতিবাদে বললাম, না, না, বাবা আমি আমার সিঙ্গী সোয়ার্দকে মারতে দিতে পারি না। তা বৃষ্টি হোক আর না হোক, আমার কিছু যায় আসে না।

থাই পরিবারে বাবাই হলেন সর্বেসর্বা। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া ক্ষমার অযোগ্য। পাপ। আমার বাবা অবশ্য খুব বিবেচক ছিলেন। আমার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, শোনো, কেউ তোমার সিঙ্গী সোয়ার্দকে মারতে যাচ্ছে না। বরং আমাদের বেড়ালটা সারা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী আর পরিষ্কার বলে ওকে আমাদের জেলার বৃষ্টির রানী নির্বাচন করা হয়েছে। এ তো ওর পক্ষে এবং আমাদের পরিবারের পক্ষে খুব সম্মানের।

আমি মত দিতে অনিচ্ছুক দেখে বাবা বললেন, আমার বেড়ালটাকে গাঁওবুড়োর কাছে নিয়ে যেতে পারি। সেখানে গেলেই জানা যাবে আগামীকাল বিকেলেই সুরু হবে নাং ম পরব।

পরদিন সকালে গাঁয়ের সবাই গেল মন্দির প্রাঙ্গণে। মেয়েরা পরেছিল

নীল স্কার্ট, কা সিন আর সাদা ব্লাউজ, পুরুষদের পরনে ছিল সাদা ট্রাউজার্স আর হুই হেং শার্ট। ছেলেমেয়েরা সবাই তাদের নতুন ধবধবে সব পোশাক পরে তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে যাচ্ছিল। দু'জন শিল্পী একটা বিরাট বাঁশের খাঁচা বানিয়েছিল। লোকেরা তাকে ফুল আর পাতা দিয়ে এমনভাবে সাজাল যে দেখতে লাগছিল ক্ষুদে একটা প্রাসাদের মতো।

দুপুরে আমার বেড়াল সিঙ্গসোয়ার্দ তার নিয়মিত খাবার খেল—শুকনো মাছ আর ভাত। তারপর বাবা আমাকে মস্ত সম্মানের দায়িত্ব দিলেন ওকে মন্দিরে নিয়ে যাবার। কয়েকজন বুড়ী ভদ্রমহিলা বেড়ালটাকে ঘ্রাণ করে তার গর্বিত শিরে সুবাস সিঞ্চন করলেন।

সিঙ্গ সোয়ার্দ প্রবল আপত্তি জানাল। গা ঝেড়ে চলে যেতে চাইল। সেই সুসজ্জিত খাঁচায় তাকে পুরতে হল আমায়। যাই হোক, খাঁচার ভিতরে ঢুকে সে খুব শান্ত ও সৌম্য হয়ে গেল, তার ভূমিকার উপযুক্তই। এবং একটু পরেই কুণ্ডলী পাকিয়ে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ল। বৌদ্ধ পুরোহিতরা এলেন তার গায়ে পবিত্রবারি কুরতে। কিন্তু সিঙ্গ সোয়ার্দ ঘুমতেই লাগল।

খুব রোদ্দুর ও প্রচণ্ড উত্তাপ সত্ত্বেও সেদিন বৌদ্ধ বিহারে লোকের ভিড় ছিল প্রচুর। তারা গিয়েছিল বৃষ্টির রানী সিঙ্গ সোয়ার্দকে দেখতে এবং বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে।

তারা খাঁচাটিকে নিয়ে গেল বড় বিহারে, আমাদের গ্রামের সবচেয়ে ভাল আর সবচেয়ে সুন্দর মন্দিরে। পুরোহিতরা তখন ভগবান বুদ্ধ প্রকনতরাজের (বৃষ্টির জন্য প্রার্থনারত ভগবান বুদ্ধের মূর্তি) সামনে পবিত্র প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বেচারী সিঙ্গ সোয়ার্দের ওপর পবিত্রবারি সিঞ্চিত হল। প্রধান পুরোহিত খাঁচার কাছে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে পবিত্র পালি ভাষায় দীর্ঘ প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করতে বিলাপের সুরে।

মাঝ বিকেলে রোদ্দুর এমন চড়া হয়ে উঠল যে গ্রামবাসীরা মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট আম গাছ আর পো গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল।

একটি দল নাং ম গান গাইতে লাগল। প্রথমে ধীরে ধীরে নিচু গলায়, পরে ক্রমশঃ সুর সপ্তমে চড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত সবাই গলা ছেড়ে চীৎকার করে গাইতে লাগল সেই গান। সঙ্গে সমতালে বাজতে লাগল মাদল যার স্থানীয় নাম তাকোনে। এই গানটি গাইতে গাইতে সবাই তখন নাচতে লাগল :

ও বেড়াল মা, আকাশ থেকে বৃষ্টি দাও আমাদের
যাতে আমরা পুণ্যবারি তৈরি করতে পারি।

বেড়াল মায়ের জন্যে আমরা চাই রূপো,
আমরা চাই মাছ, চাই মধু,
এগুলো না পেলে আমাদের সর্বনাশ।
বিধবা মাকে তার ছেলেমেয়ে বিক্রী করতে দিও না।
সবাই যেন সাদা ভাত পায় দু মুঠো
সুখের জন্যে আমরা চাই সোনা আর রূপো।
আমরা কলা কিনতে চাই
পুরুতের জন্যে, সব মানুষের জন্যে চাই খাবার দাবার
আশায় যেন বিজলি দেখি। মেঘ দাও আমাদের
ওহ্, আমাদের বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি।

খুব জমকালো হয়েছিল উৎসব। রানীর শক্তি সম্পর্কে আমি বেশ গর্বিত ও আশ্বস্ত হয়ে উঠলুম।

সিঙ্গ সোয়ার্দ তার সজ্জিত খাঁচায় শান্তিতে তখনও ঘুমুচ্ছে। শসার মতো ঠাণ্ডা, বাইরের মন্ত্রোচ্চারণ আর কোলাহলকে সে পাত্তাই দিল না। শেষে দুটি লোক এসে তার ক্ষুদে প্রাসাদটিকে তুলে কাঁধে করে নিল এবং মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। একটা শোভাযাত্রা তৈরি হয়ে গেল। তাফোনে মাদল নিয়ে দুজন বাজিয়ে শোভাযাত্রার আগে আগে চলল। অবিশ্রান্ত ভাবে মাদল বাজাতে লাগল তারা। লোকেরা গান গাইছিল মহাকোলাহল করে। ঢোলকওয়ালাদের পিছনে ছিল একদল নাচিয়ে, থাই থিয়েটারি ভঙ্গিতে পোশাক পরা। তারা নাচছিল খাঁচাটার সামনে, যেন বৃষ্টির রানীর জন্যই তাদের এই প্রদর্শনী।

শোভাযাত্রাটা বাজারের দিকে এগোতে লাগল। তার পিছন পিছন ছিল মস্ত একটা জনতা। সবাই নাং ম গান গাইছিল। ছোটি গলির ওপর নৌকোয় সযত্নে রাখছিল পিঠে আর জল। সিঙ্গ সোয়ার্দ চলে যাবার পর সেগুলো তারা খেল। যে দুজন বৃষ্টির রানীকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কেউ কেউ তাদের দিল খেনো মদ। উভয়েই রানীর স্বাস্থ্য পান করে মদটুকু সানন্দে খেয়ে নিল। এই খাদ্য ও পানীয় দেবার অর্থ হল বৃষ্টির রানীকে দেখানো যে আমাদের দেশ জল প্রাচুর্যে ভরা। এবং বৃষ্টির দেবী যেন আমাদের জল দেন যাতে জীবনের এই প্রাচুর্য রক্ষা করা যায়।

সারাটা পথ সিঙ্গ সোয়ার্দ ঘুমোল। এই সব ভক্তিটক্তি দেখে সে খুব মুগ্ধ

হয়েছে মনে হল না। বাজারের ভিতরকার খোলা চত্বরে আমরা ঢোকার আগেই প্রচুর হৈ চৈ হচ্ছিল। কয়েকজন খুব বড় কয়েকটা বাজী ফাটাল। পাউডার ও সুগন্ধি বিক্রী করত এমন কয়েকজন দোকানী মেয়ে খাঁচাটার কাছে গিয়ে বেচারী বৃষ্টির রানীর গায়ে অজস্র ফুল আর পেয়ালা ভর্তি সুমিষ্ট সুগন্ধি জল ঢেলে দিল। এই চীৎকার চেঁচামেচি, গান, বাজী পোড়ানো এবং সুগন্ধি জল বেচারী সিঙ্গ-র পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। আরও জল ও সুগন্ধি ঢালা জল, খাঁচায় ছিটিয়ে দেওয়া হল। সিঙ্গ সোয়ার্দ উঠে দাঁড়াল। তার নীল চোখ তাকিয়ে রইল দুষ্কৃতকারীদের দিকে। তার বাদামী ও মসৃণ লোম ভিজে সপসপে। সে মিঁয়াও বলে কাঁদতে লাগল এবং বৃথাই খুঁজতে লাগল খাঁচা থেকে বেরুবার পথ।

এমন শোচনীয় দুরবস্থা দেখে আমি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বাবাকে বললাম বেচারী বেড়ালকে উদ্ধার করে আনতে। বাবা আশ্বাস দিয়ে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর সবাই যেন বৃষ্টির রানীকে সুগন্ধি দ্রব্য উপহার দিয়ে তৃপ্ত হল। তারা গোলমাল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল যেন বৃষ্টির রানীর যন্ত্রণাকাতর চীৎকার শোনার জন্য। সেই মুহূর্তে সিঙ্গও কান্না থামাল। তার সর্বাঙ্গ ভেজা এবং ভয়ে সে কাঁপছিল।

শোভাযাত্রা বিহারে ফিরে যাবার সময় লোকজন নিচু স্বরে গান করছিল। এমন কি ঢোল বাজিয়েরা এবং যে দুটি লোক দশ মিনিট আগেও তারস্বরে গান করছিল তারাও এখন শান্ত হয়ে গেল। মন্দিরে ফিরে যাবার সময় সারাটা পথ সিঙ্গ সোয়ার্দ এমন চেঁচাল যে মনে হল যেন তার বুক ভেঙে যাবে। আমি অসহায়। কিন্তু আমি শোভাযাত্রার পিছু পিছু গেলাম বিহারে। বিহারে পৌঁছে লোকগুলো খাঁচাটা রাখল মন্দিরের সামনে। তারপর ওরা সবাই বিহারের ভিতরে প্রবেশ করল বৃষ্টির দেবীর কাছে আবার প্রার্থনা জানাতে। এই সময়ে আমি সুযোগ পেয়ে গেলাম বেচারী সিঙ্গ সোয়ার্দকে সাহায্য করার। যখন দেখলাম শেষ লোকটি পর্যন্ত বিহারে ঢুকে গেছে তখন আমি সিঙ্গ সোয়ার্দকে খাঁচা থেকে বার করে নিয়ে দৌড়ে বাড়ি চলে এলাম।

সেদিন রাত ন'টা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সিঙ্গ সোয়ার্দ তখন শান্ত হয়ে গেছে। মনে হল দিনের বেলাকার সমস্ত ঘটনা সে ভুলেই গেছে। সে আমার বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার বাবা মা তখনও মন্দির থেকে ফেরেননি। তারাও পড়শীদের সঙ্গে মন্দিরে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনায় যোগ দিয়েছিলেন। আমি তখনও দিনের বেলার সমস্ত শোভাযাত্রাটার কথা

ভাবছিলাম। কিন্তু আমিও ছিলাম খুব ক্লান্ত। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই।

রাত এগারোটায় আমার বাড়ির লোকেরা তখন মন্দির আঙিনা থেকে ফিরে এল। তখনও বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই। কেউ একজন আমার ঘরে ঢুকেছিল সিঙ্গী সোয়ার্দিকে দেখবার জন্য। আমাদের ঘুমন্ত দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। তখন রাত তিনটে হবে। হঠাৎ মনে হল যেন একটা ট্রেন ছুটে আসছে। শোনা গেল প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ। পাহাড়ের ওপর বাজ পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল একটু পর। এবং কয়েক মিনিট পর এল মুষলধারে বৃষ্টি, সত্যিকারের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৃষ্টি। গ্রামের সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠল। আমরা খুব খুশি। চাষীরা তক্ষুণি মাঠে চলে গেল। তিন দিন তিন রাত্রি সমানে বৃষ্টি হল। মনে হল আকাশের সব জল নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত বৃষ্টি থামবে না। আমাদের ফসল বেঁচে গেল।

সিঙ্গী সোয়ার্দি কিন্তু বৃষ্টিকে আমলই দিল না। তিনদিন সে দিব্যি ঘুমোল। চাষীরা ও তাদের পরিবারের লোকেরা পরে তাকে দেখতে আসত। তারা তার গায়ে নরম লোমের ওপর হাত বুলিয়ে দিত আর রেখে যেত তার প্রিয় খাদ্য শুকনো মাছ আর মাংস।

সে-বছর চাষীরা ভেবেছিল সিঙ্গী সোয়ার্দিই তাদের ফসল আর পরিবারকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

সিঙ্গী সোয়ার্দিই এখন নায়িকা।

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

খাঁটি নাগরিক

'দক মাই সদ'

ট্রেনটি আষ্টেপৃষ্ঠে যাত্রী বোঝাই করে ব্যাঙ্ককের হুয়ালমপং স্টেশন ছাড়ল বিকাল চারটায়। আর পাঁচটা বাজতে মিনিট সাতেক আগে নদীর ধারে ছোট একটা স্টেশনে এসে থামল যাত্রীর বোঝা নিয়ে।

মিনিট দুই থামে গাড়ীটা এখানে। অনেক যাত্রীই দু'হাতে মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ল স্টেশনে। ভাগ্যবান যে সব যাত্রীর আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা এসে অপেক্ষা করছিল, তারা ছুটে এসে বোঝা নামাতে সাহায্য করল। খবরাখবর নিতে শুরু করল। নদীর এপারে যাদের বাড়ী তারা এবার পায়ে হেঁটে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে চলল। নৌকো করে নদী পার হল ওপারের যাত্রীরা।

ইউরোপে তখন জার্মানরা আত্মসমর্পণ করেছে। সময়: জুলাই, ১৯৪৫। সুদূর প্রাচ্যেও মিত্রশক্তির ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মুখে জাপানী সাম্রাজ্যের ভিত্ নড়ে উঠেছে। সিয়াম (থাইল্যাণ্ড) তখন জাপানের অধিকারে। কাজেই বিমান আক্রমণের শিকার হয়েছে সে। রাজধানীর অনেকের, যাদের সঙ্গতি আছে তারা যে যেদিকে পারে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। আর যারা ওদের মত সৌভাগ্যবান নয় তারা দিনের বেলায় ব্যাঙ্ককে কাজ করে। আর সন্ধ্যার আগেই শহর ছেড়ে নিরাপদ কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাই সন্ধ্যের রেলগাড়ীটি যাত্রী বোঝাই হয়ে স্টেশন ছাড়ে।

নয়মাই ব্যাঙ্ককের লোক। নিরাপত্তার জন্য সে তার পরিবারকে ছোট্ট এই গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রতিদিনই সূর্য ওঠার আগে সে কাজে যায় রাজধানীতে। আর ফেরে সন্ধ্যাবেলা। এই যাওয়া আসার কাজ ভারী ঝকমারীর। কিন্তু এ ছাড়া সে করে কি? প্রত্যেকদিন এমনি করে তার ঘণ্টা চারেক সময় নষ্ট হয় যাওয়া আসাতে। কোন কোন দিন আরও বেশী। বিশেষ করে যখন বিমান আক্রমণ শুরু হয়। গাড়ী তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু আজ গাড়ী ঠিক সময় এসে পৌঁছল। স্বচ্ছ নীল আকাশ। বৃষ্টি

বাদলার কোন চিহ্ন নেই কোথাও। কিন্তু গত দু'সপ্তাহে তা ছিল না। প্রতিদিনই প্রায় ঝড়ো হাওয়ায় দিনগুলি কেটেছে। নাঙ্ সমচিত্ নয়মাই -এর পরিবার। সে এখন পোয়াতি। সবসময় খিঁচিয়ে থাকে। স্বামীর কাছে অনেক কিছু তার বলবার আছে। কেননা এ ক'দিন 'চার-ইঞ্জিনের এক যন্ত্র দানব' ব্যাঙ্ককের এবং আশেপাশের এলাকার আকাশের উপর খালি চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছে।

ওরা তখন নৌকো করে নদী পার হচ্ছিল। নাঙ সমচিত্ স্বামীকে বলল: 'জানো, আকাশ থেকে বেশ বড় আর লম্বা মত কি যেন একটা নেমে এল। আর ধপাস করে পড়ল মাটিতে।' ও এটুকু বলে থামল। তারপর আবার বলে উঠল: 'সবাই তখন ছুটে গেল মাঠে। আমিও যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি একটু পরেই ফিরে এলাম। কারণ ঘরে যে কেউ নেই। র‍্যাঙ্গসিতে যে সেনারা রয়েছে ওরা আমায় বলল, ঐ উড়ো জাহাজ থেকে ইস্তাহার ফেলা হয়েছে।'

নয়মাই জবাবে বললে, 'ব্যাঙ্কক খুব হুঁশিয়ার। তাই কোন সাইরেন বাজে নি। খালি একখানি উড়োজাহাজই অনেক উঁচু থেকে ইস্তাহার ফেলছিল।'

'ঐ ইস্তাহার কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে নাকি?' সমচিত প্রশ্ন করল।

'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর', মাঝি নাই ইম মাঝখান থেকে বলে উঠল। 'ওরা কিন্তু বলাবলি করছিল ব্যাঙ্গসাইতে গোটা কয়েক বোমাও পড়েছে।'

'সে কি?' নয়মাই অবিশ্বাসের স্বরে বলে উঠল। 'ওরা তা করতে যাবে কেন? ওখানে গুরুত্বপূর্ণ কি আছে? কিছুই নেই। আমি যে তোমায় লম্বা মত জিনিষটার কথা বলছিলাম এ হয়ত তাই।'

নাঙ্ সমচিত্ সহসা বলে উঠল—'হয়ত ইস্তাহার রাখবার বাক্সটাই।'

নয়মাই আর নাঙ সমচিতের বাড়ী খড়ের ছাউনি দেয়া। মোট চারখানি ঘর। লম্বা বারান্দাও রয়েছে। মাটি থেকে সাত আট ফুট উঁচু খুঁটির উপর। ঘরের মাচা থেকে একখানি কাঠের সিঁড়ি উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। ওঠা-নামা করার একমাত্র সিঁড়ি। বাড়ীর চারখানি ঘরই পাশাপাশি এক সারিতে বারান্দা বরাবর সাজানো। তৃতীয় ঘরখানির দেওয়াল মাটির। কিন্তু আর কোন ঘর মাটির নয়। বারান্দার শেষ প্রান্তে রান্নাঘর। রান্নাঘরে একটা মাত্র দরজা, যাতে রাস্তার কোন কুকুর ঢুকতে না পারে।

নৌকাখানি বাড়ির সামনে না-ঘাটায় এসে ভিড়ল। বছর চারেকের ছোট্ট একটা ছেলে বারান্দা থেকে ছুটে এসে হাত দু-খানি নাড়তে লাগল উত্তেজিত হয়ে। নয়মাই আর নাঙ সমচিত দু'জনেই ভয় পেল তাদের ছেলেকে

নদীর ধারে ছুটে আসতে দেখে। এখনই বুঝি জলে গিয়ে পড়বে। নয়মাই ছয় সাত ধাপ সিঁড়িতে নেমে এসে ধরে ফেলল ছেলেকে।

'মাঝি জিজ্ঞেস করছে আগামীকাল তোমায় নিয়ে আসবে কিনা?'

নাঙ সমচিত্ নৌকা থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের জন্য?' নই মাই চেঁচিয়ে জবাব দিল। 'তুমি নাঙ ইয়ামদের নিমন্ত্রণে যাবে বলেছিলে না, তাই জিজ্ঞেস করছি। নাঙ ইয়াম তার ছেলের শ্রমণ হবার উপলক্ষে ভোজ দিচ্ছে।'

'তাইতো! আমাদের তো তা হলে যাওয়া উচিত।'

'আমি কি বলবো? তুমি যা বলবে তাই হবে।'

'আর সকলের সঙ্গে আমিও তো মঠে যেতে চাই। কিন্তু তুমিও যদি যাও তাহলেই হবে মুশকিল। নৌকাটা লোকে ভর্তি হয়ে থাকবে। মাথার উপর কড়া রোদও চাড়া দিয়ে উঠবে।'

'যা হোক কিছু একটা ঠিক করে ফেল।' নাঙ্ সমচিত জবাব দিল মুখ ভার করে।

নয় মাই লক্ষ্য করলে ব্যাঙ্কক ছেড়ে আসার পর থেকে তার স্ত্রীর মেজাজটা যেন তিরিক্ষি হয়ে আছে। অনেক সময় সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

'যা খুশি তাই কর।' নয় মাই বলে উঠল। আর বসে রইল চুপ করে। অনেকদিন থেকে নয় মাই বারান্দাটার চারদিকে বেড়া দেবার কথা ভাবছিল। তাহলে ছেলেটি আর নদীর জলে পড়তে পারবে না। কোন দুর্ঘটনাও ঘটতে পারবে না। স্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে অনেকবার সে আলাপ আলোচনা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেড়া দেওয়া হয়ে ওঠেনি। খরচের কথা ভেবেই কাজটা মুলতুবি রাখতে হয়েছে। মাস কাবারে সে যা মাইনে পায় তাতে বর্তমান খাই খরচা মেটাতেই শেষ হয়ে যায়। অনেকবার তাকে এটা ওটা বিক্রি করতেও হয়েছে। যেমন তাদের গয়নাগাটি, আসবাবপত্রের কোন কোনটা। স্বামী স্ত্রী দুজনে অবশ্য আশা ছাড়ে নি যে, যুদ্ধ থেমে গেলে আবার ব্যাঙ্ককে ফিরে যেতে পারবে। আর তাই যদি হয় তাহলে বারান্দায় রেলিং দেওয়ার আর দরকার কি? নয় মাই তাই ছেলেকে চোখে চোখে রেখেছে। বারান্দায় ছুটে এলে নদীর ধার ঘেঁষতে দিত না।

পায়খানার সমস্যাও রয়েছে এর উপর। ছোট এ গাঁয়ে গরীব লোকদেরই বসবাস। কোন বাড়ীতে তাই পায়খানার ব্যবস্থা নেই। সবাই যায় বড় নদীর ধারে। নদীর পারে বিরাট প্রশস্ত মাঠ। ঐ মাঠেই গাঁয়ের বাসিন্দারা

সবাই নিজ নিজ পায়খানার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তাই কারুর নিজস্ব পায়খানার সমস্যা দেখা দেয়নি। কিন্তু এরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মনে করে, না, তা হয় না। নিজেদের আলাদা ব্যবস্থা না করলে চলে না। কিন্তু তাহলে যে অনেক টাকার প্রয়োজন।

নয় মাই 'পাথামা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কাঁধের ওপর একখানি বড় গামছা ঝোলানো। নিজের খড়ম জোড়াটি পরল, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ছেলেকে নিয়ে নদীতে চান করতে নেমে গেল। আর নাঙ সমচিত রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। ঠিক এই সময় নই ফ্লোই নীচের মই বেয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন হাসিমুখে। নই ফ্লোই হলেন এ বাড়ীর মালিক। নয় মাইয়ের বাড়ীওয়ালা।

'সেকি, এখনও খাওয়া-দাওয়া শেষ হল না? আমি সেরে নিয়েছি।' বাড়ীতে তৈরী সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নই ফ্লোই বলে উঠলেন।

'আপনি নিমন্ত্রণে যান নি?' সমচিত প্রশ্ন করল।

'খাওয়া-দাওয়ার খুবই আয়োজন হয়েছে নিশ্চয়। কেননা কাল বিকেল থেকেই মশলা গুঁড়ো করার হামানদিস্তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।'

'নাম ইয়ামের বাড়ীর কথা বলছেন?' নই ফ্লোই জিজ্ঞেস করলেন। আবার বললেন: 'না, আমি ওখানে যাই নি। কাল হয়ত যাব। আজকে সময় পাই নি। এ মাত্র ধানের ক্ষেত দেখাশুনা করে আসছি।'

'ও:, উৎসব যখন শুরু হবে তখন যাবেন বুঝি?' নাঙ সমচিত শুধালে। আবার বলল: 'আমরা যাব কিনা বলতে পারছি না। যদি মেই পারম যায় তবে আমি যেতে পারব না। আন মাসি ঘরে একা থাকতে সাহস পাবেন না।'

মেই পারম হল নই ফ্লোই-এর শালী। নয় মাই-এর বাড়ীতে এসেছিল কাজকর্ম সব দেখাশুনা করার জন্য। আন মাসি নাঙ সমচিতের মায়ের দূর সম্পর্কের বোন। ওঁদের অবস্থা খুবই ভাল। ব্যাঙ্ককে সুন্দর বাড়ী আছে। বিমান আক্রমণের জন্যে তাঁকে শহর ছেড়ে গাঁয়ে আসতে হয়েছে।

'অত ভয়ের কি আছে?' নাই ফ্লোই জিজ্ঞেস করল। 'দিনের বেলায় কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'আমি জানি না। কিন্তু আপনি আর আপনার বন্ধুরা রাজ্যের যতসব চুরি ডাকাতি বাটপাড়ির গল্প বলে বলে মাসিকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। আন-মাসিকেও বা দোষ দিই কেন? আমারও রীতিমত ভয় করে। দিন আর রাত্রে কি এসে যায়? যখন বিমান আক্রমণের সাইরেন বাজে তখন সবাই

ছোটে মাঠের দিকে প্রাণ বাঁচাতে। একা একা তখন ঘর আগলে থাকতে আমারও রীতিমত ভয় করে।'

'আজ বিকেলে কি বিমান আক্রমণের সাইরেন বেজেছিল? আমি তখন ধানের ক্ষেতে ছিলাম। কিছু শুনতে পাই নি। খালি দেখলাম একটা বিমান, আর কিছু না।'

'নাঙ ইয়ামের বাড়ীতে যা হৈচৈ হচ্ছে তাতে বিমান আক্রমণের সাইরেন কি কেউ শুনতে পায়? সে যাই হোক, অনেকে নিশ্চয় মাঠে ছুটে গিয়েছিল। আমি কিন্তু যাই নি। কেন না তখন যদি কেউ ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়ে।'

'না না, কেউ কিছু চুরি করবার সাহস পাবে না।' নই ক্লোই জবাব দিলেন হেসে। 'আপনার স্বামীর তো আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। চোরদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে দারুণ ভয়।'

নাঙ আন রান্না ঘর থেকে এবার বেরিয়ে এলেন একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে। বললেন: 'সাই ঘরে থাকলে আমি বাপু ভয় পাই না।'

'তা কেন? ও থাকুক আর না থাকুক এখানে ভয়ের কোন কারণ নেই। চোরটোর নেই এখানে।'

নাঙআন জবাব দিলেন: 'চোরটোর তো নেই বুঝলাম। সন্ধ্যের পর দরজা জানালা সব বন্ধ করে থাকতে বলেন কেন? ওজন্যেই তো রাত্রে কেউ ঘুমোতে পারি না। কি ভ্যাপসা গরম রে বাপু! বাতাস খেলবার একটা ছিদ্র পথও নেই। আর এখন তো খুব বলছেন চোরটোর নেই!'

জবাব শুনে নাই ক্লাই খানিকটা শুকনো হাসি হাসলেন।

নাঙ সমচিত ওঁর পক্ষ নিয়ে বলে উঠল: 'উনি বলছিলেন এখানে খালি ছোট খাটো ছিঁচকে চুরি-চামারি হয়ে থাকে। বড় কিছু হবার আশংকা নেই। কেননা আমাদের তো বন্দুক রয়েছে। তাছাড়া আমাদের বাড়ীটা হলো মাঝামাঝি জায়গায়। আমাদের অনেকেই চেনে। রাত্রিবেলা গাঁয়ের লোকেরা বেরিয়ে নিজেদের গরু বাছুর খোয়া গেল কিনা দেখে নেয়। প্রতি রাত্রে তাই পাহারাদারের কাজ ওরা করে।'

'আমি তো আমার বলদ আর গোরুদের কাছে নিয়েই শুই।' নই ক্লোই গলা বাজিয়ে বলে উঠলেন নাঙ সমচিতের কথার সমর্থনে। নিজে যা বলতে পারেনি নাঙ্ সমচিত তাই বুঝিয়ে বলছে। 'নয় পিউও তার গোরু বাছুর আগলে ঘুমায়। নাঙ ইয়াম রাত্রে চোখের পাতা এক করে না। সারা রাত্রি

বসে বসে খালি সুপুরি থেঁতলাতে থাকে হামানদিস্তা দিয়ে। সর্বক্ষণই তার পান চিবানো অভ্যাস।'

দিন দশেক পরে একদিন সকালবেলা নয় মাই, তার স্ত্রী আর আন মাসীর ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রচণ্ড হৈ চৈ শুনে। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গত রাত্রির এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাটা গাঁ এরই মধ্যে মুখর হয়ে উঠেছে। জটলা পাকিয়েছে লোকজন এখানে ওখানে সেখানে! খবরে জানা গেল নাঙ ইয়ামের শ্রমণ ছেলে পেটের ব্যথায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নাই থেম তাই মঠে গিয়েছিল। নাঙ ইয়াম তার বছর বারো বয়সের মেয়েকে নিয়ে ঘরেই ছিল। সারারাত ধরে বৃষ্টি পড়ছিল ঝুরঝুর করে। রাত তিনটে নাগাদ নাঙ ইয়ামের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ও শুনতে পেল গোয়াল ঘরের গরুগুলি ডাকাডাকি করছে গলা ছেড়ে। হুটোপুটির শব্দও একটা শোনা যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাই ওর মনে তখন কোন সন্দেহ জাগে নি। শেষ রাত্রে চারটে নাগাদ নাঙ ইয়াম উঠে রান্না ঘরে গিয়ে স্বামীর জন্য খাবার তৈরী করতে থাকে। নারকেল তেলের একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকে বুঝি একবার নীচে নামতে হয়েছিল। নেমে অবাক হয়ে দেখে তাদের মোট ছটি বলদের মধ্যে চারটি উধাও হয়েছে।

নাঙ ইয়াম পাশের বাড়ীর নাঙ পারমদের কাছে ছুটে গেল। আর ছুটে গিয়ে তার দুঃখের কথা ওদের জানায়। নাঙ পারমের স্বামী নাই পিক আর নাই ক্লোন তৎক্ষণাৎ নাই থেমকে খবরটি দিতে মঠবাড়ীতে ছুটল। তারপর তিনজনে মিলে ষাঁড়ের খোঁজে বেরুল ধানখেতের ভিজেমাটির উপর গরুর খুরের দাগ ধরে ধরে। মাইল পাঁচেক যাবার পর ওরা দেখল সূর্য উঠে এসেছে মাথার ওপর। তাই ওরা আর অগ্রসর হল না। ঘরে ফিরল ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে। তারা থামল নয় মাই-এর বাড়ীর কাছে এসে। আর নিজেদের মধ্যে উঁচুগলায় আলোচনা করতে লাগল ঘটনাটি।

এই ঘটনাটায় কান দেবার মত নয় মাই-এর সময় ছিল না। কেননা নৌকো করে তাকে এখনই গিয়ে ব্যাঙ্ককের ট্রেন ধরতে হবে। আর রাজধানী ব্যাঙ্ককে গিয়ে যখন সে পৌঁছাল তখন সকলের মুখে খালি একই কথা যুদ্ধ খুব তাড়াতাড়ি থেমে যাবে। কেননা আমেরিকানরা জাপানের বুকে এক আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছে। তাহলেও অনেকে কিন্তু কথাটায় তেমন কান দেয় নি। কেননা, তারা ভাবল জাপানীরা অত সহজে হার মানবে না।

বিশেষ করে যখন বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের দাবী তোলা হয়েছে তাদের সামনে। নয় মাই-এর মনটা বিশ্বের নানা ঘটনায় তন্ময় হয়ে রইল। আর তাই ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরল সন্ধ্যেবেলা।

বাড়ী ফিরে দেখে ওদের ঘরের সামনেই এক দঙ্গল লোক নাও ইয়ামের গরু চুরি নিয়ে শলাপরামর্শ করছে। আর নাও ইয়াম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোরের দল নাকি চারটি ষাঁড় ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে চারশো 'বাহ্‌ত' দাবী করেছে। নাও ইয়ামের কাছে অত টাকা নেই। কেননা গত বছর মাঠের ফসল ওঠার পর যা কিছু হাতে জমেছিল সবটাই ছেলের শ্রমণ হবার উৎসবে খরচ হয়ে গেছে।

'অত টাকা তার নাই বা থাকল কী তাতে এসে যায়।' নয় মাই ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে প্রশ্ন করল। 'ওর গরুগুলির হদিশ সে তো জানতে পেরেছে।'

'টাকা যোগাতে না পারলে সে যে তার গরু ফিরিয়ে পাবে না।' ভীড় থেকে কে যেন বলে উঠল।

'গরুগুলি কোথায় আমরা তো জানি।'

'তা ঠিক!'

'গরুগুলি কোথায় আমাদের তো বলা হয়েছে। পুলিশকে বললেই তো পুলিশ গরুগুলি আবার ফিরিয়ে আনবে।'

'না, হে না! তাতে কোন কাজ হবে না। বেঘোরে গরুগুলির প্রাণ যাবে।' নাই পিক ফোড়ন কাটল। 'কি বলছেন?' নয় মাই রীতিমত বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে বসল।

'যদি পুলিশ ডাকা হয় তাহলে যে ষাঁড়গুলোকে জ্যান্ত পাওয়া যাবে না।'

'যদি পুলিশ ডাকা হয় তাহলে তাদের আর জ্যান্ত পাওয়া যাবে না। এ যুক্তির কি মানে হয়?' নয় মাই রীতিমত ক্ষেপে উঠল। প্রশ্ন করল, 'জ্যান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন?'

'পাওয়া যাবে না। কারণ চোরের দল তাদের মেরে ফেলবে যদি আসছে কাল টাকা না পাওয়া যায়।' নই পারম বোকার মত জবাব দিল।

'মানে? আপনি কি বলতে চান দেশে আইন বলে কিছু নেই?' নয় মাই-এর গলা ছাপিয়ে উঠল সকলের উপর। 'গোটা কয়েক জন্তু না হয় মারা গেল। আমরা তো তাহলে চোরের দলকে পাকড়াও করতে পারব সোপরদ্দ করতে পারব আদালতে।'

'না না, ওপথে যেও না', ভীড়ের মধ্য থেকে এক বুড়ী বলে উঠল।

নয় মাই চটে গিয়েছিল খুব। তাই সে আর ওদের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় না করে স্নান করতে চলে গেল। তারপর গেল নাঙ ইয়ামের বাড়ীতে। ওর কাছে নিশ্চয়ই খাঁটি কথাটা জানতে পারবে।

নাঙ ইয়ামের স্বামী বাড়ী ছিল না। জেলা শাসকের বাড়ী গিয়েছিল। তাই শুনে নই মাই অনেকটা স্বস্তি বোধ করল। ভাবল ব্যাপারটা যথাস্থানে পৌঁছেছে। তাই সে বাড়ী ফিরল।

রাত্রিবেলা নয় মাই অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারল না। ওর মত এক শহরে লোকের কাছে এমনি ধারা চুরি ডাকাতির ব্যাপার হামেশা ঘটে না। তাই তার মনটা উত্তেজিত হয়ে রইল। শুয়ে শুয়ে ভাবল ঘুম থেকে উঠে সে জেলা শাসকের কাছে ছুটে যাবে। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হওয়াতে তার আর যাওয়া হয়ে উঠল না। রাতটাও আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাই সে যাওয়ার আশা ছেড়ে দিল।

পরের দিন হল শনিবার। ব্যাঙ্কে যাবার জন্য সে গাড়ীতে চাপল অন্যদিনের মত। সে গাড়ীতে জেলা শাসকও ব্যাঙ্কক যাচ্ছিলেন। ওঁর সঙ্গে নয় মাই-এর কিছুটা আলাপ ছিল। ইতিপূর্বে তিন-চার বার দেখাসাক্ষাৎও হয়েছে। তাই সে এগিয়ে গিয়ে ওঁকে প্রশ্ন করলে তিনি এখানকার চুরির কথা জানেন কিনা। জেলাশাসক তো রীতিমত অবাক! কিছুটা বুঝি বিরক্তও।

নয় মাই-এর সেদিন ফিরতে রাত হয়ে গেল। ব্যাঙ্ককে বিমান আক্রমণের জন্য ট্রেনখানি দেরী করল। তাদের বাড়ীর সামনে নাঙ ইয়াম ও আরও কয়েকজনকে দেখতে পেল সে।

'আমরা আমাদের ষাঁড় খুঁজে পেয়েছি।' নাঙ ইয়াম বলে উঠল আবেগের সঙ্গে। 'ষাঁড়গুলো না পেলে যে আমরা বাপু এই সনে আর চাষবাস করতে পারতাম না।'

নয় মাই কিছু বলার আগেই ভীড় থেকে একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল: 'তা ষাঁড় পিছু একশো 'বাহত্' খুব বেশী না। নতুন গরু কিনতে গেলে যে আরও অনেক টাকা বেরিয়ে যেত।'

নয় মাই এবার পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করল। ক্ষুরের চিহ্ন ধরে ধরে যে তিন জন গরু খুঁজতে গিয়েছিল মাইল সাতেক যাবার পর দুই গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। ওরা তাদের এক বাড়ীতে সাদরে নিয়ে যায়। তারপর পাড়া গাঁয়ের রীতি অনুসারে চর্ব্য চূষ্য দিয়ে ওদের অতিথি সৎকারের

আয়োজন করে। খাওয়া দাওয়া ভূরিভোজনের পর ওরা তখন আসল কথাটি ফাঁস করলে। বললে, হারানো ষাঁড়গুলি অনেকটা পথ চলে গেছে। তাদের আর নাগাল পাওয়া যাবে না। সূর্যের তেজ অনেকখানি বেড়ে গেছে। তাই গাঁয়ের সজ্জন:পুঙ্গব ওরা দু'জনের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলে ওরা যেন আজকের মত ফিরে যায়, কালকে সন্ধ্যেবেলা আবার যেন আসে। আসবার সময় পাঁচশো ষাট্ 'বাহত্' নিয়ে আসে। ঐ টাকাটা দিয়ে ষাঁড়গুলি ফিরে পাওয়া গেল বলে একটু খানাপিনা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হবে। গোরু খোঁজার দল বুঝতে পারল তারা তেমন কোন:অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে নি। অপর পক্ষে এরা সব রয়েছে দলে ভারী। তাই মাথা খেলিয়ে কূট নীতির আশ্রয় নেওয়াই ভাল। ওরা তখন করল কি, নিজেরা যে খুব গরীব সে কথা জানিয়ে দিলে ওদের। তারপর দর কষাকষি করে টাকার সংখ্যাটা চারশো 'বাহতে্' নামাল। পরিশেষে অপরপক্ষও তাই মেনে নিল।

পরদিন বিকেলে তাই নই-খেম গাঁয়ের এক ধনাঢ্য চীনার কাছ থেকে টাকাটা ধার করল। এই চীনাটির জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় মুদির দোকান রয়েছে। ব্যাঙ্ককের ধান কলে স্থানীয় চাষীদের কাছ থেকে ধান কিনে চালান দেবার জন্য অনেকগুলি ধানী নৌকারও মালিক সে। টাকা নিয়ে পরদিন নই-খেম তার তিন বন্ধুর সঙ্গে দালালদের সন্ধানে রওনা হল। ওরা এবারেও কিন্তু তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। পেটভরে খাওয়ালো। নইখেম তখন দাবীর নির্দিষ্ট অঙ্কটি ওদের হাতে তুলে দিল। আর সূর্য পাটে বসলে আগন্তুকের দল ওদের এক জায়গায় নিয়ে এল যেখান থেকে একটু পরে ওরা দেখতে পেল নইখেমদের চারটি ষাঁড়ই আপন মনে জলা ভূমিতে চরছে। নইখেমরা তখন ওদের তাড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে হাজির করে।

পরের সোমবার বিকালবেলা রেল স্টেশনে নয় মাই-এর দেখা হল জেলা শাসকের সঙ্গে। নয় মাইকে দেখে জেলা শাসক সঙ্গের লোক জনকে ফেলে ছুটে এলেন তার কাছে। তারপর যথারীতি সৌজন্য মূলক আলাপ আলোচনার পর সরাসরি কথাটা তিনি পারলেন। বললেন: 'ভাল কথা, আমি নই খেমের গোরু চুরির কেসটা খোঁজ নিয়েছিলাম। আমি কিন্তু জানতে পারলাম ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা ধাপ্পাবাজি। আদৌ কোথাও চুরি হয় নি!'

'বলেন কি?'

'জেলাশাসক বললেন, তাই ত শুনলাম। ষাঁড়গুলো ছাড়া পেয়ে এক দিনের

গরু কোথায় চলে গিয়েছিল ঘাস খেতে। কেউ চুরি করে নি ওদের।'

'এ যে ভারী তাজ্জব দেখছি।' নয় মাই মাথা চুলকে জবাব দিল।

জেলা শাসক মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আমি অবশ্য ওকে জানিয়ে দিয়েছি ওর ষাঁড় যদি আবার চরতে যায় তাহলে এবার নির্ঘাত চুরি যাবে। সে যা হোক আমায় এবার মাপ করবেন। বন্ধুরা সব অপেক্ষা করছে।'

নৌকো করে বাড়ী ফেরার সারা পথ ধরে নয় মাই জেলা শাসকের কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। অবাক হয়ে ভাবল উনি যা বললেন তার মানে কি? ওদের নৌকা বাড়ীর কাছাকাছি এসে পৌছলে নয় মাই দেখল, নাঙ ইয়াম নাঙ পারমের বাড়ীর ঘাটে স্নান করছে। ওকে দেখে নয় মাই ঠিক করতে পারল না কি করবে। একবার ভাবল ওর কাছে গিয়ে আগেকার মত প্রীতি অভিনন্দন জানায়। কিন্তু নাঙ ইয়াম-ই ওকে দেখে নিজের মুখটা ফিরিয়ে নিল। নয় মাই আরও দুটি মেয়েকে ওখানে দেখতে পেল। একজন জল থেকে লতাশাক তুলছে রান্না করবার জন্য। অপর স্ত্রীলোকটি থালাবাসন পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। তিনজনে বুঝি আগেকার রসালো কোনো আলোচনায় মশগুল হয়ে কথা বলছিল। হঠাৎ নয় মাইকে দেখে নিজেরা থেমে গেল। নয় মাই তবুও ওদের উদ্দেশ করে বলে উঠল: 'আপনারা সব এখানে?'

'এমনি', একজন বলে উঠল। তারপর একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

নয় মাই যে সন্দেহ করেছিল বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্রই তা প্রকট হয়ে উঠল। স্ত্রী সমচিত ওকে দেখে রেগে মেগে বলে উঠল: 'শ্রীযুত নসি পারকার এখানে এসেছিলেন। তা তুমি জেলা শাসককে কথাটা বলতে গেলে কেন? এখন বোঝ এখানকার সবাই তোমার উপর চটে গেছে।'

সমচিত স্বামীর কাছ থেকে কোন উত্তর আশা করবার আগে গলা ছেড়ে বলে উঠল, 'এই যে ক্লোই খুড়ো, আপনারা সব আসুন এখানে। আপনাদের যা বলবার বলুন।' তারপর স্বামীর দিকে মুখ করে সমচিত আবার বলে উঠল, এঁরা যা বলতে এসেছেন আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি নিজেই এঁদের কাছ থেকে শুনে নাও। ক্লোই খুড়ো, নাঙ পারম, আপনারা এসে যা বলবার বলুন। আসামী হাজির।'

নয় মাই তার মাথার টুপিটা আর এক প্যাকেট সিগারেট বারান্দার দিকে ছুঁড়ে দিল। আর রান্নাঘরের কাছে দাঁড়াল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ঝড়ঝাপটা যতই আসুক না কেন ও কিন্তু তাতে মাথা ঠাণ্ডা রাখে। তাই সে চুপচাপ

দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে নই ফ্লোই, নাও পারম আর তার বোন, ফ্লোই-এর পরিবার পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তাই দেখে নয় মাই বলে উঠল : 'বেশতো, বলুন না কি বলবার আছে। আপনাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। নই ফ্লোই, আসুন একটা সিগারেট খান।' নয় মাই বারান্দার ওপর পা ঝুলিয়ে বসল। ফ্লোইও এক সময় বসে পড়ল অনিচ্ছার সঙ্গে একটা মাটির কলসী হেলান দিয়ে। নাও পারম ও তার বোনও দেখাদেখি বসে পড়ল।

'আচ্ছা, জেলাশাসকের লোক কি গরু চুরির ব্যাপারে খোঁজ করতে আসেন নি?' নয় মাই জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, এসেছিল বলা চলে।' ফ্লোই জবাব দিল সতর্কতার সঙ্গে।

'তারপর কি হল?'

'কিছুই হয়নি। গোরুগুলি যখন ফিরে এসেছে ··।'

নয় মাই শুনতে লাগল ধৈর্য সহকারে। তবে ফ্লোই বলতে শুরু করল থেমে থেমে। ওঁর স্ত্রী কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে বলে উঠল, 'জেলাশাসক এখানে এসে আমাদের গালমন্দ করে গেলেন। বলে গেলেন আমরা সব ডাকাতির সাকরেদ। আন মাসী তাই শুনে তো রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন। তখন থেকেই তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন। আর বলছেন, এখানে এসে তাঁর অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। এখন তাঁকে রেহাই দেওয়াই ভাল। মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন? গরুচুরির ফাঁদে তাকে জড়ানো হচ্ছে কেন?'

'ও, তাই বুঝি আপনারা সবাই আমার ওপর চটে আছেন। জেলা-শাসককে আমি বলেছি বলে?'

'না, ঠিক তা নয়।' নই ফ্লোই খতিয়ে উঠল, 'কিন্তু কথাটা হল, জেলাশাসক পর্যন্ত ছুটে এলেন কিনা। উনি এসে আমাদের নামে যা তা বলে গেলেন। গাঁয়ের সবাইকে গরু চুরির ব্যাপারে জড়িয়ে গেলেন।'

'জীবনে কোনদিন চুরিচামারি করলাম না তবু কিনা চুরি ডাকাতির জন্য অভিযুক্ত হতে হল।' নাও পারম, তার বোন, নই ফ্লোই সবাই একসঙ্গে সায় দিল। নয় মাই নীরবে শুনল। মানুষের মতিভ্রমের কথা চিন্তা করে দার্শনিকের মত বুঝি মাথা নাড়ল। নিজের দোষের কথাও তলিয়ে দেখল একবার।

সেই রাতে নয় মাই খাওয়া দাওয়া সেরে সমচিতের কাছ থেকে একটা

কালো 'সারঙ' ও ব্লাউজ চাইল। অনেক বলা কওয়ার পরে সমচিত শেষকালে দিতে রাজী হল। নয় মাই তখন একটি প্রদীপ জেলে মেয়েদের ঐ পোশাক দুটি বগলে করে নাঙ ইয়ামের বাড়ী এসে উপস্থিত হল। ঐ জামা আর 'সারঙ'টি নাঙ ইয়ামের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'আমার উপর রাগ করবেন না কিন্তু। আমি তো আপনাদেরই আপন জন।'

নাঙ ইয়াম কাঁদতে কাঁদতে কাপড়ের মোড়কটি হাত পেতে গ্রহণ করল। তারপর নয় মাই-এর দিকে ফিরে দাঁড়াল। বলল জাপানের উপর বোমা বর্ষণের খবরটি। গত শনিবার মিত্রশক্তি আকাশ থেকে ইস্তাহার বিলি করেছে সে খবরটিও জানাল।

নয় মাই বাড়ী ফিরে সরাসরি ঘুমোতে গেল। সবেমাত্র চোখের পাতাদুটি বুঁজে এসেছে তখন শুনতে পেল সমচিত তার মাসীকে শুনিয়ে ফিসফিস করে বলছে :

'কাণ্ডখানা দেখ। সবটাতে নাক গলানো চাই। ফলে একটি সারঙ আর একটি ব্লাউজ খোয়াতে হল। এখনকার দিনে একটা কালো সারঙ কিনতে হলে এক কাঁড়ী টাকা বার করতে হয়। ব্লাউজেরই দাম কত! ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়াবার কি দরকার পড়েছিল শুনি?'

নয় মাই শুনল, তারপর পাশ ফিরে কানের ওপর একটা বালিশ চাপিয়ে চোখ দুটি বুঁজল।

অনুবাদ : সবিতা সাহা

বর্মা

পালি শিলালিপি থেকে বর্মা বর্ণমালার উদ্ভব। কাজেই কি বর্ণমালায় কি ধ্যান-ধারণায় বর্মার শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায় ভারতীয় প্রভাব। আধুনিক বর্মা সাহিত্যের গোড়াপত্তন বর্মায় ব্রিটিশ শাসন কায়েম হবার পর থেকে। ইংরাজ শাসনের ফলে বহির্জগতের সঙ্গে বর্মার যোগসূত্র বেড়ে যায়। সুলভ মুদ্রণযন্ত্রের দৌলতে দেশে পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশও বেড়ে উঠে। ফলে নতুন করে গল্প, নাটক, কবিতা রচিত হতে থাকে। সত্যিকারের বর্মা কথা-সাহিত্যের সূচনা হয়। প্রাচীন লোক কাহিনী নিয়ে রচিত হয় 'উ-অ-বথা'। বিশ্ববিখ্যাত বহু গ্রন্থও বর্মাভাষায় অনূদিত হতে থাকে। এবং পাঠক সমাজ তা সাদরে গ্রহণ করে। বর্মার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও দেশবরেণ্য নেতা থাকিন নু আধুনিক বর্মা সাহিত্যের একজন দিকপাল লেখক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে 'রেৎ-সেৎ-পার-বে-কউই' (মানে, 'দি উলফ অফ ম্যান' বা নরশার্দুল) বর্মার কৃষক অভ্যুত্থানের কথা—শোষিত জনগণের মর্মবেদনা,—সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের নিখুঁত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। উ নু-র পরেই উথিয়েন হান আর এক স্মরণীয় নাম। 'যগই' ছদ্মনামে তিনি নতুন আঙ্গিকের গল্প উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি হলেন 'খিৎসনে' বা যুগধর্মী লেখক।

সহধর্মিণী

'ঘগই'

১.

মা পাও কো সিনের ঘরণী। সকাল হলেই সে মাইল খানেক পথ হেঁটে যায় শহরে তরিতরকারির ঝাঁকা মাথায় করে। বাজারে দোকান পাতে। যেদিন তার মাথার পসরা তাড়াতাড়ি বেচা হয়ে যায় সেদিন সে বাড়ী ফেরে সকাল সকাল। না হলে যখন বাড়ী ফেরে তখন সূর্য পাটে বসে। ফেরার পথে তাদের গাঁয়ের বাঁশের সেতুটার কাছে যখন এসে পৌছায় তখনই তার মনে পড়ে স্বামীর কথা। ছেলেপিলেদের কথা।

মা পাও-র গড়ন লম্বা। চুলগুলি লালচে। সামনের দাঁতের পাটিটা উঁচু। খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে। তাই বলে কুৎসিত নয় সে। স্বামী কো সিন কুঁড়ে মানুষ। বাড়ীতে বসে বসে খায়। তবে এটা সত্যি নয় যে, কিছুই করে না সে। বাড়ীতে রান্না বান্নার কাজ করে। ছেলেপিলেদেরও দেখাশুনা করতে হয়।

কো সিন বৌদ্ধবিহারে বছর ন'য়েক শিক্ষানবিশ হয়ে কাটিয়েছে। শিক্ষাও কিছু লাভ করেছে। স্বভাবটি তার খুবই ভাল। হাস্যরসিক। বিয়ে সাদীর সময় আর দান খয়রাতের ব্যাপারে সে হয় প্রধান উদ্যোক্তা। স্ত্রীর মত সে অত লম্বা চওড়া নয়। বুকখানিও নয় তেমন চওড়া। তবে বাবরি করা চুলটা ভারী সুন্দর। সরু একফালী গোঁফও রেখেছে। দুই হাঁটুর উপরে উলকির ছাপও রয়েছে।

বিয়ের পর ওদের প্রথম ছেলেটি জন্মালে মা পাও দোকান দিতে শুরু করে। কো সিন শুধু ফাই ফরমাস সব খাটত। মেজ ছেলেটি জন্মাবার পর সে তখন খালি দোকানটাই দেখতে শুরু করে। তৃতীয় সন্তান মেয়েটি পেটে আসার পর থেকে মা পাও অবসন্ন হয়ে পড়ে। তারপর সে বার ব্যবসায়ে যখন বড় রকম 'মার' খেল তখন তার অবস্থাটা হয়ে পড়ে খুবই শোচনীয়। তবে মা পাও এ নিয়ে কোন অভিমান করে নি।

সেদিন তার এক বন্ধু যখন কথায় কথায় বলছিল : 'হ্যারে, তোর কর্তা

যখন গাঁয়ের কোনো বিয়ের সময় 'আবাসা' (বিয়ের মন্ত্র) পাঠ করেন তখন গিয়ে একবার শুনিস। ভারী সুন্দর! খুব পণ্ডিত লোক!'

একদিন এক বন্ধু ডেকে বললে কথাটা। আর তাই শুনে তার মনটা খুশীতে ভরে গেল। যখন গাঁয়ের সাঁকোটার কাছে এসে সে পৌছয় বাজার থেকে ফেরার পথে, তার চোদ্দ বছরের ছেলে এসে তরকারির ঝুড়িটা নামিয়ে নেয়, তখন সে আরও খুশী হয়। স্বামীর প্রতি তার মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

একদিন যখন সে আর তার ছেলেপিলেদের সঙ্গে তাদের বাড়ীর সামনে মাচার উপরে বসে গল্পগুজব করছিল তখন কোত্থেকে এক মাতাল বদমাশ রাস্তায় এসে তার দিকে তাকিয়ে ইতর ভাবভঙ্গী শুরু করে। মাতাল লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে ছেলেপিলেরা তো ভয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। কো সিন ঘরে ছিল। কো সিন তখন একটা রামদাও (আকিম্ব) নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল। আর ওকে দেখে মাতালটার চোখ তখন ছানাবড়া। আর সঙ্গে সঙ্গে সে তখন পিটটান দিল টলতে টলতে। মা পাও-র বুকটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। ভাবল কর্তা যদি ঠিক মুহূর্তে এসে না পৌছতেন তাহলে চরম অপমানিত হতে হোত তাকে।

মা পাও-এর বয়স এখন সাঁয়ত্রিশ। আর কো সিন তার চেয়ে বছর ছয়েকের বড়।

এই ক'বছর কো সিন অবশ্য কাজকর্ম কিছু করেনি। লোকজন তাই তাকে ঠাট্টা করে বলত : সে পরিবারের শাড়ির আঁচল ধরে চলে। তাই শুনে কো সিন ঠাট্টা করে জবাব দিত : 'কি আর করি ভাই, ওয়েথাণ্ডায়াও (বৌদ্ধ জাতকের এক দাতা রাজকুমার। তিনি তাঁর দুই শিশুপুত্র ও রাণীকে নিয়ে বনবাসে ছিলেন।) মাদ্দীর (পতিব্রতা পত্নী যিনি বনের ফলমূল সংগ্রহ করে পরিবার প্রতিপালন করতেন) আঁচল ধরে চলতেন।'

সে আরও বলত : 'আমার দিকে অমন চোখ টাটাচ্ছ কেন? গত জন্মে অনেক পুণ্যি করেছিলাম তাই এখন পা তুলে দিব্যি বসে বসে খাচ্ছি।'

মুখে কথাটা বলেই মনে মনে কিন্তু সে অনুতপ্ত হল। তাহলেও অমন সুন্দর জবাবটি মুখের উপর দিতে পেরেছে বলে কিছুটা দুঃখ সে ভুলতে পারল। তার জবাব শুনে কেউ কেউ কিন্তু মুখ তুলে তাকাত। অনেকে আবার ঘৃণায় ঠোঁট উল্টাতো। অনেক সময় পাড়া পড়শীদের কথা শুনে কিছু একটা করার জন্য সে সঙ্কল্প নেয়। এক ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে সে বাঁশের ব্যবসায় নেমে পড়ে। আর 'মার' খেল ভয়ানক। পরের বর্ষায় সে মাঠে

গেল চাষ করতে। আর বাড়ী ফিরল রক্তাক্ত পা নিয়ে। লাঙলের ফলাটা নিজের পায়ের উপর দিয়ে চষে গেছে। ঘা শুকাতে তার দিন পনের লাগল।

২.

যেদিন সে সেরে উঠল সেদিনই তার তেতাল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। পায়ে ঘা শুকিয়ে গেল বটে কিন্তু বুকের ঘা আর শুকাল না। ফেঁপে উঠল আরও।

আর একদিনের মত মা পাও তার পশরা নিয়ে বাজারে গিয়েছিল। বড় ছেলে বৌদ্ধমঠে গিয়েছে পড়তে। আর ছোট ছেলে দুটি বাড়ীর সামনে তেঁতুল গাছের নীচে খেলছিল। কো সিন মাচায় বসে দুধ ছাড়া কাঁচা চা গিলছিল। এমন সময় সে দেখতে পেল প্রতিবেশী ছ'ছেলের বাপ ছুতোর মিস্ত্রী তার যন্ত্রের বাক্স নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো কাজের সন্ধানে। আর এক প্রতিবেশীও নদী পার হয়ে ওপারে গেল 'দানি' পাতা কাটতে। এমন কি ও বাড়ীর বুড়োটিও এক টুকরো কাঠ কেটেকুটে পিঠে খাবারের কাঠি তৈরী করছে বসে বসে।

কো সিন অবশ্য বসে বসে কাপের পর কাপ চা গিলতে বেশ আরামই বোধ করছিল। গাছতলায় ছেলেদের খেলাধূলো দেখতেও তার ভাল লাগছিল। কিন্তু গাঁয়ের প্রতিবেশীদের নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখে তার মনের সেই ফুর্তি আর রইল না। রান্নার কথা তার মনে পড়ল। ভাতের হাঁড়িটা উনানে চাপাতে হবে। কর্মব্যস্ত প্রতিবেশীদের মৌন অনুশাসনের কথাও তার মনে পড়ল। অতীতের স্মৃতি ভেসে উঠল তার চোখের উপর। মঠের পাঠ চুকিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বাবুগিরি করে দিন গুজরানোর কথা তার মনে পড়ল। মনে পড়ল মা পাওর সঙ্গে তার বিয়ের কথা। ব্যবসা করতে গিয়ে মার খাওয়ার কথা। আর সে বার চাষ করতে গিয়ে পা কেটে ফেলার কথা। কথাগুলো মনে হতেই লজ্জায় অপমানে মাথাটা তার ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর। জীবনের এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরুবার পথ তলিয়ে দেখলে সে আপন মনে। ভাবলে ভাল হয় বুঝি বৌদ্ধ শ্রমণ হতে পারলে। তাহলে তাকে আর ভাতের হাঁড়ি আগলাতে হবে না। নির্বাণ প্রাপ্তি হবে তার। আর স্ত্রী-পুত্রের কদরও বেড়ে যাবে। সে মনে মনে ভাবলে সংসারে জন্ম মৃত্যু আর পুনঃ জন্মের দুঃখময় চক্র থেকে তার বুঝি মুক্তি আসন্ন। সে এক ফুদে ঠাকুরের আসনে হবে অধিষ্ঠিত। ভাবতে ভাবতে সে রীতিমত মশগুল হয়ে গেল। হঠাৎ

তার মনে পড়ল তাই তো, উনানে এখনো হাঁড়িটা চাপানো হয়নি। ভাত না হলে কারুর খাওয়াই হবে না। ছেলেপিলেগুলো কান্না জুড়ে দেবে। তড়াক করে তখন সে উঠে পড়ল। আর গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে।

এদিকে বাজারে গিয়ে মা পাও তার শাক সবজীর আনাচে কানাচে বেশ খানিকটা জল ছিটিয়ে ওজনে ভারী করে নিল। আর তাই বিক্রি করে দু' পয়সা অতিরিক্ত আয় করল। সেই পয়সা দিয়ে সে তার স্বামীর জন্য দামী গোটা কয়েক চুরুট কিনল।

এদিকে কো সিন পাকা রাধুনীর মত ভাতের ফেনটা গেলে নিলে। আর ছেলেপিলেদের ডেকে খেতে দিলে ভাত কালকের বাসী তরকারী দিয়ে। খেয়ে-দেয়ে ছেলেরা যখন খেলতে গেল সে তখন তার ঘরের সামনে মাচাটার উপর আবার এসে বসল। এক পায়ের উপর আর এক পা রেখে পা দুলিয়ে ভাবতে বসল আগেকার চিন্তার খেই ধরে। সে যখন 'শ্রমণ' হবে তখন সর্বাঙ্গ পীতবাসে ঢেকে হাতে ভিক্ষাপাত্রটি নিয়ে প্রতিদিন সকালে মা পাওর দরজায় এসে ধর্ণা দেবে। তাহলে মা পাওকে আর ছেলেদের একবার দেখে যাবার সে সুযোগ পাবে। কিন্তু মা পাও যে লেখাপড়া শেখেনি। শাস্ত্র কথা জানে না কিছুই। মৃত্যুর পর নরকে হবে তার স্থান। ওর জন্য করুণা হল তার। শাস্ত্র বিধানের প্রতি তার চোখ উন্মোচন করতেই সে চেয়েছিল।

ছেলেপিলেদের ঝগড়াঝাঁটিতে তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। ফিরে এল সে বাস্তবে। বোন দাদার মুখখানি দিয়েছে খামচিয়ে। আর দাদা প্রতিশোধ নিয়েছে বোনের চুলের মুঠি টেনে ধরে। দুজনেই এখন তাই কাঁদছে গলা ছেড়ে।

কো সিন ছেলেমেয়েকে ঘরের মধ্যে ডেকে আনল। তারপর দুজনকে ঘরের দু কোণার বসিয়ে দিল। তারপর সে তার পূর্বের স্থানে গিয়ে বসল। চেষ্টা করল পুরনো চিন্তার খেই ধরতে। ছেলে মেয়ের উপর চোখ দুটি একবার সে বুলিয়ে নিল। দেখল ঘুমে তাদের চোখ দুটি জড়িয়ে এসেছে। ছোট্ট মাথা দুটি ঢুলে পড়ছে। তাই দেখে সে নিজেও একবার হাই তুলল।

'বসে থাক। নড়বে না কোথাও। ছেলে মেয়েদের উদ্দেশ্যে এমনি নির্দেশ দিয়ে তারপর নিজেও একটু গড়িয়ে নিল সে।

বাবা চোখ দুটি বুজতেই ভাই বোন দুটি চোখ মেলল! আড় চোখে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিল একবার। তারপর তাকাল বাবার দিকে। বাবা ঘুমিয়ে পড়তে দুজনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল খেলতে।

মা পাও-র গলা শুনে কো সিন উঠে বসল ধড়ফড় করে। গিন্নী তখন তেঁতুল গাছের তলা থেকে ছেলেকে ডাকতে শুরু করেছে। 'নেমে পড় এক্ষুনি। নইলে পড়ে মরবি। বোন কোথায়?'

'খাল ধারে গেছে।' ছেলে জবাব দিল।

'মরণদশা!' মা পাও চীৎকার করে উঠল। 'কো সিন ছেলেমেয়ে দুটোকে তোমার কাছে না রেখে গিয়েছিলাম। এই বুঝি দেখাশুনার বাহার! ধন্যি বাপ বটে।'

হাতে পায়ে কাদা মাটি মেখে মেয়ে এসে হাজির হল। তেঁতুল গাছ থেকে ছেলেও নেমে এল।

কো সিন ছেলেমেয়ের দিকে কটমট করে তাকালে। ওরা দু'জন মায়ের পিছনে গিয়ে লুকালে।

'এই নাও তোমার চুরুট।' মা পাও গজ গজ করে বলে উঠল চুরুট কটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে। তারপর ছেলেদের নিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। কো সিনও ওদের দিকে তাকাল। মা পাও মেয়ের পা দু'খানি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিল। ছেলেমেয়েকে খেতে দিলে কড়াইশুঁটির পিঠে। তারপর মেঝের উপর পা ছড়িয়ে চুলের খোঁপা খুলতে বসল। সামনে ঝুঁকে পিঠের উপর চুলের গোছাটি মেলে দিল।

'তোর কনুই দিয়ে আমার পিঠটা একটু রগড়ে দে না, বাবা।' মা পাও একসময় ছেলেকে বলে উঠল। পিঠেটা দাঁতে কামড়ে ধরে সে হাতের কনুই দিয়ে মায়ের পিঠ চুলকে দিতে লাগল। কনুইয়ের চাপে বুঝি মা পাওর মাথাটা দুলতে লাগল উপরে নীচে। খোলা চুলগুলো তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুঝি উড়তে লাগল। আর তাই দেখে মনে হল মা পাওর দেহে বুঝি ভর করেছে ভূত। কো সিন চোখ তুলে তাকিয়ে রইল সেদিকে। বুক থেকে তার একটা বিতৃষ্ণার শ্বাস ঝড়ে পড়ল। না, আর নয়। শ্রমণের পীতবস্ত্র নেবার কথা ভাবল সে।

সে যাই হোক, সে কিন্তু বউ-এর কাছে কথাটা ফাঁস করতে সাহস করল না। বছর ঘুরে এল।

৩.

মাস তিনেক হল কো সিন শ্রমণ হবার বাসনা জানিয়েছে। অবশ্য তা মাসখানেকের জন্য। মা পাওর মাসিকে ছেলেপিলেদের দেখাশুনা করার জন্য

আনা হয়েছিল। উনি এবার তাঁর বাড়ী যেতে চাইলেন।

একদিন তো তিনি জানতে চাইলেন: 'উপাজিন (বর্মী সাধু—অবধূত) কবে আবার সংসার ধর্মে ফিরে আসবে?'

সাধু কোন জবাব দিল না। কেবল সন্ন্যাস ধর্ম সংক্রান্ত পবিত্র বৌদ্ধশাস্ত্র আওড়াতে লাগল। মাসির কানে শাস্ত্র পাঠ মোটেই প্রবেশ করে নি। তিনি আরও রেগে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন তাঁকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে ওদের সংসারে। সাধু বেরিয়ে গেলে উনি তাই মা পাওকে ডেকে পাঠালেন। বললেন: 'মা পাও, আমি এবার বাড়ী ফিরতে চাই। তা তোমার উপজিন কবে গার্হস্থ্য ধর্মে ফিরবে? আমি বাপু, আর তোমার বাড়ীতে ঝি গিরি করতে পারব না।' তিনি ভয় দেখালেন।

মা পাও চায় স্বামী আবার গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে আসুক। দু'একবার কথাটা সে পেড়েছিল স্বামীর কাছে। সাধু মানুষটি কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে পবিত্র শাস্ত্র আওড়াতে আওড়াতে। তার কথাটা কানেই তোলে নি। তার 'ওয়াজু' (শ্রাবণ মাসের বর্ষা) এখন এসে গেল। এ সময় বৌদ্ধ শ্রমণরা তিন মাসের জন্য মঠে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাই কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে সে করলে কি, ছুটে গেল এক বন্ধুর কাছে। দু'জনে বসে অনেকক্ষণ শলাপরামর্শ করল। তারপর একসময় দু'জনেই খিল খিল করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

৪.

সকালবেলার সূর্য সোনালী রোদ ছড়াচ্ছে। তেঁতুল গাছের ডালে বসে ঘুঘু ডাকছে। মা পাও আজ আর হাটে গেল না। তাই আজ ঘরে বসে একটু পরিপাটি করে রান্না করতে লাগল। মাছ ভাজা করল। সরু চালের ভাত রান্না করল। তারপর ভাল করে স্নান করে এসে আপাদমস্তক সুগন্ধী 'থানাখা' মাখল। মুখেও মাখল বিশেষ যত্ন করে। কপালের চুল জড়ো করে সে বানাল এক 'ঘুঘুর পুচ্ছ'। লম্বা টানা ভুরু আঁকল। ঠোঁট দুটি লাল করে নিল পান চিবিয়ে। পাতলা সাদা আদ্দির এক জামা পরল। তার উপর চাপাল লাল ফুলের ছাপ-ওয়ালা এক চাদর। ছেলে মেয়ে দুজনকেও বেশ পরিপাটি করে সাজালে। পরিষ্কার জামা পরাল। ঘরের জিনিষপত্র সব বাঁধাছাঁদা করে রাখল। বাড়ীর সামনে উঠোনে এক গরুর গাড়ীও দাঁড়াল এসে।

' বেলা দশটা নাগাদ উপাজিন মঠ থেকে তার ছেলেকে নিয়ে এসে হাজির হল। আসতে আসতে তার মনে বারবার প্রশ্ন জাগতে লাগল, ওরা যদি তাকে আবার সন্ন্যাস ধর্ম ছেড়ে গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে আসতে বলে তখন কি হবে ? বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল গরুর গাড়ীটির ওপর। উপাজিন ঘরে ঢুকল। ঢুকে দেখলে ঘরের জিনিষপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা হয়ে পড়ে আছে। ঘরের দাওয়ায় মাসি তার জন্য একখানি আসন তুলে রেখেছিল। উপাজিন সেই আসনটা পেতে দাওয়ার উপর বসল। তারপর আড়চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজল। কিন্তু মা পাওকে দেখতে পেল না কোথাও।

কিছুক্ষণ পর মা পাও থালায় করে ভাত নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে মুখে সকরুণ বিয়োগ ব্যথার ভাবভঙ্গী করে খাবারের থালাটি ওর দিকে এগিয়ে দিল। উপাজিন মা পাওর দিকে একবার তাকিয়ে নিল চোখ তুলে। লক্ষ্য করল ওর পরিপাটি সাজগোজ। আবার তাকাল সে। ওর রকম-সকম, হাব-ভাব দেখে উপাজিন অবাক বনে গেল। তার মনে আবার গার্হস্থ জীবনে ফিরে আসার কথা উঁকি দিতে লাগল। সে জানে মা পাও এখুনি নিশ্চয় কথাটা পেড়ে বসবে।

খাওয়া শেষ হলে মা পাও থালাটা তুলে নিয়ে গেল। আর গিয়ে বসল সম্মানসূচক কিছু দূরত্ব বজায় রেখে। উপাজিন যেই তার ধর্মশাস্ত্র আওড়াতে শুরু করল, অমনি মা পাও মাসিকে ডেকে বলে উঠল : 'ও মাসি, গাড়ির গাড়োয়ানটা কি এখনও আসে নি ?'

উপাজিনের শাস্ত্রপাঠ আর শুরু করা হল না। চোখ তুলে সে বাড়ীর সামনে দাঁড়ানো গরুর গাড়ীর দিকে তাকালে। প্রশ্ন করলে : 'মা পাও, কি ব্যাপার বলো তো ?'

'সব বলছি উপাজিনকে।' মা পাও জবাব দিল মাথা নীচু করে। আবার বললে, 'মাসি তাঁর গাঁয়ের বাড়ীতে ফিরে যেতে চাইছেন। আর উনি যদি চলে যান আমি একহাতে দোকানদারী আর ছেলেপিলেদের দেখাশুনা করে উঠতে পারব না। তাই উপাজিনের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে আর ছেলেমেয়ে দুজনকে মাসির সঙ্গে যেতে অনুমতি দেন। বড় ছেলে উপাজিনের হেফাজতে থাকবে।'

মা পাও এবার বড় ছেলের দিকে ফিরে তাকাল : 'বাবা, তুমি উপাজিনের সঙ্গে থেকো।' বলেই বুঝি মা পাও আঁচল দিয়ে একবার চোখ মুছল।

উপাজিন মুহূর্তখানেক স্থাণুর মত চুপচাপ বসে রইল। কি যেন সে ভাবতে লাগল।

'উপাজিন যদি ইচ্ছে করেন তাহলে সারাজীবন তিনি সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পারেন। তাঁর সংসারী পরিবারকে অবশ্য অন্য কিছু একটা খুঁজে নিতে হবে বেঁচে থাকবার জন্য'। উপাজিনের সঙ্গে তার জীবন ধর্মের অনেক তফাৎ। দু' জনের মধ্যে ফাঁক রয়েছে অনেক। দু'জনের সম্পর্ক থাকবে গুরু আর ভক্তের। তাই আমি বলছিলাম কি, ছেলে দু'জনকে যখন আমাকেই ভরণ-পোষণ করতে হবে তখন কেউ যদি আমাকে আশ্রয় দেয় আমি তাকেই বেছে নেব। থাকতে চাই তার সঙ্গে স্থায়ী স্ত্রী হিসেবে। তাই আগে ভাগে ব্যাপারটা আমি খোলসা করে নিতে চাইছি যাতে পরে কোন ঝামেলায় পড়তে না হয়।'

শুনে উপাজিনের মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা চীৎকার বেরিয়ে এল। মা পাও মুখ তুলে আড়চোখে একবার তাকাল। উপাজিন পীতবস্ত্রের মধ্যে কাঁপতে শুরু করলে বার বার। মা পাওর দিকে উপাজিন এবার মুখ তুলে তাকাল।

মা পাও আবার বলল: 'দুজনের ভালর জন্যই আমি বলছি। উপাজিন তাহলে ধর্মে কর্মে স্বাধীন ভাবে মন দিতে পারবেন। এই সংসারী ভক্তটি যদি আর কাউকে…।'

'না, না তোমার মাসিদের গাঁয়ে মাতালরা সব তাড়ি খেয়ে মাতলামো করে বেড়ায় খুব।' উপাজিন বলে উঠলো—'আমি বরং আবার সংসারী হচ্ছি।'

মা পাও আবার কো সিনের ঘরণী হলো।

অনুবাদ: নিখিল সেন

মঙ্গোলিয়া

মঙ্গোল ভাষা আলতাই ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব-মঙ্গোলিয়ার 'খালখা', পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার 'কাল্‌মুক' আর 'বুরিয়াতিক'—এই তিন উপভাষাই প্রধানত তার অঙ্গ। প্রাচীন লোককথা 'চেঙ্গিস খাঁর চিলেজামা', 'চেঙ্গিস খাঁ-র সহনায়কের সঙ্গে দরিদ্র বালকের বিবাদ' প্রভৃতি উপাখ্যান নিয়ে যে সাহিত্যের হাতেখড়ি, তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে প্রতিবেশীদের সমৃদ্ধতর সাহিত্য। চীনা আর তিব্বতের বৌদ্ধ উপকথা (সিদ্ধিকু) ছাড়াও বহু গ্রন্থ মঙ্গোল ভাষায় অনূদিত হয়। মঙ্গোলদের যুদ্ধ ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের বিবরণ রয়েছে 'কালকাই হুলিমবি চুগাই গোসা'তে। সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র', 'বত্রিশ কাষ্ঠ পুত্তলিকা,' 'বিক্রমাদিত্য ও বেতাল ভট্টের কাহিনী' এবং চীন বা তিব্বতী ভাষার মারফত অনূদিত হয় মঙ্গোল ভাষায়। 'ঘেসার খাঁ-র বীরত্ব কাহিনী' প্রভৃতি নানান লোক কাহিনী ছিল মঙ্গোল কথাসাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন। ১৯২১ সালে সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লবের ঢেউ মঙ্গোলিয়ার উত্তুঙ্গ গিরি কান্তারেও তৃণ ভূমিতে এসে ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গোল রিপাবলিকের হয় প্রতিষ্ঠা। মঙ্গোল সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে গড়ে তোলে নতুন করে। সমকালীন মঙ্গোল সাহিত্যে আজ তাই নব জীবনের গান। দাসদরজিন নাৎতাদ্‌গরজ, সদিন দামসিনসোত্তরেন, বি. রেনচিন, ডি-সেনখি ও সেভেগমিড আর দামদিন সুরেন প্রমুখ যশস্বী কথাশিল্পী ও কবি আজ দিয়েছে তাকে নতুন মর্যাদা। তরুণ প্রগতিশীল মঙ্গোল কথাশিল্পী সোনেমিন্‌ উদভল-এর 'একগুচ্ছ ফুল' গল্পটি আফ্রো এশীয় লেখক সংস্থার মুখপত্র 'লোটাস' (তৃতীয় খণ্ড ১নং সংখ্যা ১৯৭৩) থেকে অনূদিত।

এক গুচ্ছ ফুল

সোনেমিন্ উদভল্

পঁচিশ বছর আগের কথা। পুরোদমে চলেছে যুদ্ধ। আমাদের ছোট্ট দলটি শিক্ষানবিশীর জন্য রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বড়দা বন্ধুদের ও আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

মনে আছে, প্রথমে আমরা একটা লরীতে উঠি। ঘণ্টা দুয়েক ঝাঁকুনি খেয়ে লরীটা যখন আমাদের সীমান্তে পৌছে দিল তখন পিছনে ফেলে-আসা বিস্তীর্ণ পাহাড়ী বনভূমি দূর দিগন্তে বিলীয়মান।

"প্রিয় মাতৃভূমি, প্রিয় দেশবাসীগণ—বিদায়" এই বলে বন্ধুরা যখন ঐকতান তুলছিল আমার চোখ তখন জলে ভরা। ওদের সঙ্গে আমিও আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মিলিয়েছিলাম।

শিক্ষানবিশীর সময়ে দিনের বেলাটা পড়াশুনায় কাটতো। রাতে রাস্তা তৈরী অথবা খামারের কাজ। অল্পবয়েসী আমরা—দেহে শক্তি মোটামুটি মন্দ ছিল না। কাজে লেগে থাকতাম। ভাল লাগতো। কখনো-সখনো খাবারের একটু কমতি থাকলেও হা-হুতাশ ছিল না। রাশিয়ার সাধারণ মানুষের তুলনায় আমরা রাজার হালে ছিলাম বলতে হবে।

যাহোক, সেই সময়টায় স্তালিনগ্রাদের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজ পুরোদমে চলছে। ওই কাজে আমাদের আগ্রহ জানিয়ে ও সেখানে পৌছে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আমরা মস্কো যুব কমিউনিষ্ট লীগ কমিটিকে একটি চিঠি পাঠাই। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্বহাল করতে রাশিয়ার জনগণের নিঃস্বার্থ সেবা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। লড়াই-ফেরত আহত সৈনিকদের জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে আসা হতো হাসপাতালগুলোতে। আমাদের কাজ ছিল এই হাসপাতালগুলো চক্কর মারা, আহতদের বই পড়ে শোনানো, ওদের চিঠি লিখে দেওয়া ও নার্সদের সাহায্য করা।

কিন্তু আমি এখানে যা বলতে চাইছি তা হ'লো রাশিয়ায় যাওয়ার পথে ছোট্ট একটি ঘটনা। আগেই বলেছি যুদ্ধের সময় সেটা। দিন রাত রেল-

ষ্টেশনগুলো দিয়ে সৈন্ত চলাচলের ফলে আমরা অনেক সময় আটকে যেতুম। মনে আছে, উলানবাতোর থেকে নভোসিবিরস্ক যেতে আমাদের পাক্কা দশ দিন লেগেছিল। সেখানে গিয়ে আবার আটকে গেলাম। সময় কাটাতে সারা শহরটা ঘুরলাম। পথচারীদের সঙ্গে আলাপ জমালাম। অনেক প্রশ্ন তাদের। আমরা কি যুদ্ধে যাচ্ছি? ইয়াকুতিয়ার লোক? মঙ্গোলিয়া থেকে আসছি জেনে তাঁরা খুসী হলো এটুকু বুঝলাম।

যা বলছিলাম—রেল ষ্টেশনটিতে যেমনি প্রচণ্ড লোকের ভীড় তেমনি হৈচৈ। স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যাটাই বেশী। মিলিটারীও মিশে আছে। এই ভীড় ও হৈচৈ মনে করিয়ে দিচ্ছিল কি দুরূহ অবস্থার মধ্যেই না লোক দিনাতিপাত করছে। রিফিউজিরা ষ্টেশনের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে জমায়েত হয়েছে। বাড়ী ঘর, প্রিয়জন সব খুইয়ে বসে আছে। এই সর্বনাশা যুদ্ধ তাদেরকে দিয়েছে শুধু হতাশা ও দুঃখ। স্ত্রী স্বামী-হারা, বাপ-মা হারা নাবালক শিশু লোকের দয়ার উপর নির্ভরশীল। হৃদয়বিদারক দৃশ্য সন্দেহ নেই।

ষ্টেশনের একটা ঘর সৈন্যদের দখলে। ভেতরে যেতে দেখি একটি লোক এর্কডিয়ন বাজাচ্ছে। তাকে ঘিরে জনকয়েক গান গাইছে। একজনকে দেখলাম নাচ শুরু করতে। হঠাৎ "ক্যাপ্টেন আসছে, ক্যাপ্টেন আসছে"— একটা চীৎকার হতেই সব নিশ্চুপ হয়ে গেল। কালো কেস হাতে লম্বা, সুপুরুষ এক মিলিটারী অফিসার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে দেখতে পেলাম।

সবাই তাঁকে বললো: 'কমরেড ক্যাপ্টেন, একটা কিছু বাজান।'

একটু হেসে তিনি বেহালাটা বার করে তাঁর অপূর্ব বাজনা শুরু করলেন। সঙ্গীতের মাদকতা যে এত বেশী হতে পারে আগে কখনও অনুভব করিনি। ক্যাপ্টেন সুরের জাল বুনতে লাগলেন। আমার চোখে ভাসতে লাগলো খাঙ্গে উপত্যকার সেই নৈসর্গিক শোভা ও পাখীর কুজন।

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালাম। দৃষ্টি বিনিময় হ'লো। কতক্ষণ তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন মনে নেই। বিভ্রান্ত হয়ে আমিই আমার চোখ নামিয়ে নিলাম। সবাই নিথর, নিস্পন্দ। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন। হয়তো এই মুহূর্তে তাঁরা তাদের বাড়ীর কথা ভাবছে। কামরার একটা কোণায় এক ভদ্রমহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

ক্যাপ্টেন বাজিয়ে চলেছেন। মনে হ'লো তাঁর দৃষ্টি তখনও আমার উপর নিবদ্ধ। কে এই ক্যাপ্টেন? তিনি কি সঙ্গীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী অথবা

ইঞ্জিনীয়ার? তিনি কি তাঁর প্রিয়তমার কথা ভাবছেন? মনে মনে কোন এক মঙ্গোল তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রেমিকার রূপের তুলনা করছেন অথবা আমরা তাঁর দেশে অতিথি হয়ে এসেছি বলে কি তিনি খুসী? অথবা তিনি কি অনুকম্পাভরে আমার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন—হায় বেচারী, সুদূর মঙ্গোলিয়া থেকে রাশিয়ায় আসার এই কি সময়?

বাজনা শেষ হতেই আবার গোলমাল শুরু হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন আমার কাছে এসে হাত বাড়ালেন। ঘাবড়ে গেলেও তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলে চল্লেন। কিন্তু হায়, ইতিমধ্যেই নির্দ্দেশ আসতে সৈন্যরা ট্রেনের দিকে ছুটলো। ট্রেন চললো। আমরা তাঁদের বিদায় দিলাম। ক্যাপ্টেন হেসে আমাদের স্যালুট জানালেন।

ওঁদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ভগবান জানেন ওঁরা নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে কিনা। আমার কানে কিন্তু তখন ক্যাপ্টেনের সেই মিষ্টি বাজনার রেশ লেগে রয়েছে। তখন থেকেই আমি সব সময় ক্যাপ্টেনের নৈকট্য অনুভব করে আসছি। একেই কী ভালবাসা বলে? জানি না।

তিন মাস পর আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটা চিঠি পাই। তাতে লেখা ছিল—

'আমার বন্ধুগণ,

তোমাদের কথা মনে আছে। আমরা বেশ আরামেই আছি। যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য। ভাল করে পড়াশুনা চালিয়ে যাও। একদিন দেখা হবেই।

জি. ক্রিলভ।'

চিঠির উত্তর দিলাম। কোন সাড়া নেই। আবার চিঠি লিখলাম। কোন উত্তর নেই। তা'হলে ক্যাপ্টেন কি আহত? নেই? অথবা তাকে অন্য কোন সীমান্তে পাঠানো হয়েছে? কিছুই জানিনা।

এইটুকু শুধু বুঝতে পারলাম এই তিনটে ঘটনার কোন একটা হয়েছে।

যুদ্ধ থেমে গেছে। আমরাও দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে ভুলতে পারি নি। তার নীল আয়ত চোখের দৃষ্টি যেন আমাকে ঘিরে রয়েছে।

অনেক সময় বহু পরিচিত লোকও দৃষ্টির বাইরে থাকলে আমরা ভুলে যাই। আবার অনেক সময় ক্ষণিকের দেখা লোকটির কথা আমাদের স্মৃতিতে চির জাগরুক থাকে। 'আমি কখনও ক্যাপ্টেনকে ভুলতে পারবো না।' এই হোলো দোল্গর-এর গল্পের শেষ লাইন।

কিছুদিন আগে সে বার্লিনে কোন এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়েছিল। মৃত সোভিয়েত সৈনিকদের স্মৃতিসৌধ দেখতে গিয়ে জি. ক্রিলভ বলে খোদাই করা একটা নাম সে দেখতে পায়। মনে পড়ে যায় নভো-সিবিরস্ক রেল ষ্টেশনের সুশ্রী, সুঠাম সেই ক্যাপ্টেনের কথা যার নামও ছিল ক্রিলভ। ছুটে গিয়ে এক গুচ্ছ ফুল কিনে আনল সে। ছড়িয়ে দিল ক্রিলভের স্মৃতিসৌধের উদ্দেশে।

কেউ জানে না এই ক্রিলভই তার দেখা ক্যাপ্টেন ক্রিলভ কি না। এও হতে পারে যে তার আশঙ্কা অমূলক। তাঁর চেনা ক্রিলভ হয়তো এখন কোন রূপালী এরোপ্লেন উড়িয়ে চলেছে। কিছুই বলা যায় না!

অনুবাদঃ মৃণালকান্তি কাঞ্জিলাল

কোরিয়া

'প্রভাতী শুকতারা' দেশ কোরিয়ার অবগুণ্ঠন ১৮৭৬ সালে বিশ্বের হাটে উন্মোচন করে প্রতিবেশী জাপান। তারপর তাকে কুক্ষিগত করে নেয় ধীরে ধীরে। পুরোপুরি গ্রাস করে নেয় ১৯১০ সালে। প্রতিবেশীর এই আচরণ কোরিয়ার জনসাধারণ কোনদিন গ্রহণ করেনি ক্ষমার চোখে। প্রতিবাদে দেশাত্মমূলক গান ও সাহিত্য প্রচারিত হতে থাকে দেশে। লী জি জোং, হান সেল ইয়া, লিম হুয়া প্রমুখ প্রগতিশীল তরুণ লেখক গোষ্ঠি সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার আলেখ্য তুলে ধরেন তাঁদের নানা গল্প উপন্যাসের মারফৎ।

১৯৪৫ সালে কোরিয়ার জাপানী শাসনের অবসান ঘটে লালফৌজ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। প্রতিরোধকালিন সাহিত্য তখন গণতান্ত্রিক রূপ নেয় লী থাই ডিয়েন-এর গল্প (প্রথম যুদ্ধ), তিয়ন তাং সাং, হান মেং তিয়ন, চো জি তিয়ন অনেকেই নতুন কোরিয়ার শক্তিশালী কথাশিল্পী। পদ্মা ও মেঘনার জলধারার মত যুদ্ধোত্তর দুই কোরিয়ার (উত্তর ও দক্ষিণ) মধ্যে সাহিত্যগত প্রভেদ দেখা দেয় রাজনীতির মত। চেয়ারম্যান কিম ইর সেন-এর নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়ার মেহনতি জনগণের নতুন সাহিত্য যেমন দানা বাঁধতে থাকে—মার্কিন দখলী দক্ষিণ কোরিয়ায় তেমনি চেয়ারম্যান সিংমেন রি-র নেতৃত্বে মার্কিন প্রভাবাধীন এক ভুঁইফোঁড় সাহিত্যেরও সৃষ্টি হতে থাকে। দুই কোরিয়ার লড়াই-এর সময় সমকালীন কোরীয় কথাশিল্প আবার নতুন যুদ্ধ হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়। ঈকোয়াঙ-সু-কে সমকালীন কোরীয় সাহিত্যের জনক বলা যায়। চো ঈ চোঙ-এখনকার কোরিয়ার আর এক শক্তিশালী লেখক। তাঁর 'দি ভিলেজ অব মিউজিক' অনবদ্য ছোটগল্প সংকলন। ইউ-উয়ল চোঙ-নিয়ন এক তরুণী লেখিকার ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামের আড়ালে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার আদর্শ ও রাজনৈতিক সংঘাতের চিত্রটি তুলে ধরেছেন মরমী ভাষায় 'অ-বিপ্লবী' গল্পে।

অ-বিপ্লবী

ইউ-উয়ল চোঙ্ নিওন

বিপ্লব, প্রতি-বিপ্লব, অ-বিপ্লব।

প্রতি-বিপ্লবীরা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলায় বিপ্লবীদের আর বিপ্লবীরা প্রতি-বিপ্লবীদের। প্রতি-বিপ্লবীরা কখনও কখনও অ-বিপ্লবীদের, বিপ্লবী বলে ধরে নিয়ে গিয়ে দেয় ফাঁসি। বিপ্লবীরাও কখনও কখনও প্রতি-বিপ্লবী বলে তাদের দেয় ফাঁসি। আর কখনও কখনও, বিপ্লবী কিংবা প্রতিবিপ্লবীরা আপাতত: কোন কারণ না থাকলেও তাদের ফাঁসি দিয়ে থাকে।

—লু সুন (১৮৮১-১৯৩৬)

দুমদাম করে তারা দরজায় ঘা দিতে লাগল। দেওয়ালে হাতুড়ি পিটানোর মতো দুমদাম আঘাত করতে লাগল।

'বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো সকলে !—মাঠে এসে জড়ো হও।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমরা জেগে উঠলাম। সেই ঠাণ্ডা শীতের ভোরে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার বাবা, আমার মা, আমার বোনেরা আর আমার ছোট ভাই – সবাই।

'বেরিয়ে এসো'—'বাইরে'—'বাইরের মাঠে'—এই চীৎকার আর একটানা ধাক্কা সমানে চলতে লাগল।

'ওক্-সুনের কি হবে ?' আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে মা বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন :

'ওরা তো জানে না, ও এখানে আছে। ও তো লুকিয়ে থাকতে পারে।'

'না না,' বাবা বলে উঠলেন—'ওরা ঠিক ওকে খুঁজে বার করবে।'

'তা কেন ? বাড়ীর পিছন দিকে যদি ওকে লুকিয়ে রাখি কেউ দেখতেই পাবে না।'

'ওরা পারবেই—ওরা ঠিক পারবে। না বলে কয়ে ওরা ইচ্ছেমত ঢুকে পড়েছে। গত রাত্রেও ওরা আমাদের এ জেলার বারোটা বাড়ীতে হানা দিয়েছিল। কোথাও মাঝ রাত্রে কখনও বা রাত দুটো কি তিনটের সময় দরজা ভেঙে হুট করে ওরা ঢুকে পড়েছে। জুতোসুদ্ধ পায়ে সব মাড়িয়ে—বাড়ীর পুরুষদের টানতে টানতে ধরে নিয়ে গেছে।

'জুতো-সুদ্ধ পায়ে'—মা থ' বনে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ওদের বর্বরতায়। কেননা, গাঁয়ের সবচেয়ে অশিক্ষিত চাষাটাও জানে—রাস্তার ন্যাকড়া কুড়ানো ভিখিরীটাও জানে, লোকের ঘরে ঢোকার সময় জুতোটা বাইরে খুলে রেখে তবে যেতে হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—এত অভদ্র মানুষ হতে পারে?

মা পুরনো কথায় ফিরে আসেন। বলেন, 'ওকে আমরা নিশ্চিন্তে লুকিয়ে রাখতে পারতাম।'

'না—না', বাবা প্রতিবাদ করেন।—'সে বড় ভীষণ ঝুঁকি হবে। তার চেয়ে বরং ও আমাদের সঙ্গেই আসুক।'

'কিন্তু—।'

মার কথা শেষ হয় না। তর্কের আর অবকাশ নেই।—'বেরো—বেরো!' চীৎকার, হল্লা আর দুম-দাম শব্দ। ওরা তখন বাইরে এসে জমায়েত হয়েছে। প্রত্যেক নরনারী শিশুকে পাকড়াও করে বেড়াচ্ছে। আমিও বেড়িয়ে পড়লাম। আর আমার ভাই, বোন, মা-বাবার সঙ্গে খেলার মাঠে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মাসখানেক হল বাড়ী ফিরেছি। বার্ষিক বৃত্তির মেয়াদ ফুরিয়েছে। বিদেশ থেকে শেখা বিদ্যে নিয়ে আমার অনুন্নত দেশের উন্নতি করব মনে করে বাড়ী ফিরেছি। বাড়ী ফেরার দিন; নির্দিষ্ট সময়ের একদিন আগেই স্টীমারটা সিউলে এসে পৌছেছিল! কিন্তু রাত্রি তখন গভীর। তাই প্রতিবেশীরা জানতে পারেনি কখন আমি ফিরেছি।

পরিবারের সকলেই আমাকে দেখে খুশী হয়েছিল। তবে বাবা বলেছিলেন: 'আজ আর না। ও খুব পরিশ্রান্ত। ওকে শুয়ে পড়তে দাও। কাল কথাবার্তা বলা যাবে। অনেক ধকল গেছে মেয়েটার উপর।'

ধকল বলে ধকল! দীর্ঘ যাত্রায় এতই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম আমি যে সে রাত্রেই আমার ধুম জ্বর এল। বিছানায় এলিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত কোন মতে যেন জ্বরটা ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। এরপর একটানা কয়েক সপ্তাহ ধরে অসুখেই ভুগেছিলাম।

আমি বিছানায় পড়ে থাকার সময়েই হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই উত্তরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্য এসে আমার মাতৃভূমি—আমাদের স্বদেশ গাঁ সব ছেয়ে ফেললে রাতারাতি। আমরা একটা অচেনা শাসন ব্যবস্থার শিকার হলাম। যারা আমাদের শাসন কর্তা হয়ে দাঁড়াল তারা আমাদের দেশের লোক, কিন্তু ভিন্‌দেশ থেকে তারা শিখে পড়ে এসেছে—তারা নিষ্ঠুর। অবুঝ, হৃদয়হীন,

দমন নীতিতে তাদের হাত শক্ত।

পৃথিবীর আর এক প্রান্তে অনেক দূরের এক দেশে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, সোভিয়েট রশিয়ার চেয়ারম্যান, হিস ম্যাজেস্টি সরকারের প্রধান মন্ত্রী, তাঁদের সচিব ও সেনাবাহিনীর প্রধানদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। কোথাও সবুজ, কোথাও লাল, কোথাও হলদে আর কোথাও বা নীল রঙে ঝকঝকে তকতকে রকমারী নকশা করা মানচিত্রটা ফেলা ছিল তাঁদের সামনে। মানব-কল্যাণ বিশেষজ্ঞ তাঁরা। তাঁরা মানচিত্রের কোথাও ট্যারা দাগ দিলেন, কোথাও কাটলেন, কোথাও বা ছাঁটলেন একটু। সাংসারিক চলাচলের সুবিধার জন্য আমার প্রিয় স্বদেশ-ভূমিকে তাঁরা কেটে দু' টুকরো করে দিলেন। আমাদের মন. প্রাণ, আশা আকাঙ্ক্ষা পারিবারিক বন্ধন, আমাদের সমগ্র জীবন যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।…

হে আমার সোনার দেশ, তোমার অন্ন আর পানীয় আর কি আগের মতো তেমন সুস্বাদু বোধ হবে কোন দিন? তোমার বাঁশীর সুর, বীণার তানে আর কি তেমন সঙ্গীত ধ্বনিত হবে যেমন হত আগে?…

সেই পুরনো দিনের চেনা খেলার মাঠে আমরা জড়ো হলাম। আজকের ঘটনা সেই স্মৃতিচিত্রের ওপর বোধহয় তীক্ষ্ণ শলাকার আঁচড় কেটে দেবে। এই মাঠে আমার শৈশব ও কৈশোরের কত সুখের দিনই কেটেছে।

কোরিয়া যে সময় জাপানী শাসকদের পদানত ছিল তখন এই খেলার মাঠটা তৈরী হয়। তখন আমাদের বলতে লিখতে এমন কি ভাবতেও হত জাপানী ভাষায়। তখন প্রকাশ্যে নিজের মাতৃভাষায় কথা বললে জাপানী শাসক বা তাদের পদলেহী কোরীয় সামন্তদের হাতে চড় খেতে হত। আমাদের বাপ জ্যাঠা কাকাদের যখন তখন এই মাঠে জমায়েত হয়ে সিণ্টো দেবতার বেদীর তলায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাতে হ'ত।

এই মাঠেই আবার দেখেছি আমাদের প্রভুদের অন্য রূপ। হঠাৎ একদিন এই মাঠের জমায়েতে তারা ভালবাসায় গলে গিয়ে বললেন, আমরা তাদের আপন জন, এক জাত, একই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এবং পূর্ব পুরুষের মান রক্ষার জন্য আমাদের তরুণদের দলে দলে যুদ্ধে যোগ দিতে ডাক দেওয়া হল। আমরা পরে জানলাম, যুদ্ধের ফলাফল ওদের বিরুদ্ধে গেছে। ওদের সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

আজ ভোর রাত থেকে সেই মাঠেই আমরা সবাই অপেক্ষা করছে

লাগলাম আমাদের নতুন শাসকদের হুকুমনামা শোনার জন্তে। দেখলাম হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে—শিশু বৃদ্ধ যুবা, বাপ মা, ছেলেপুলে সবাই। বহু প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হ'ল যাদের এক বছরের ওপর দেখি না। তারাও আজ এমনই বিমূঢ় যে আমায় দেখতেই পেল না।

সবাই সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম নতুন মনিবদের অপেক্ষায়।

অবশেষে ওরা এসে পৌছাল। ভারী ভারী রাইফেল কাঁধে, ভারী বুটের শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে তারা এল। তাদের পেছনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে এল জনা-বারোকে। এই বারোজনকে আমরা সবাই চিনি। এঁদের সঙ্গে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি।

ভারী বুটপরা রাইফেলধারী লোকগুলো ভীড়ের লোকজনের মধ্যে মিশে গেল। তারা এক শ' জনেরও বেশী হবে। আমরা যেখানে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছি তার ফাঁকে ফাঁকে তারা জায়গা কর নিল। আমরা আমাদের খুব কাছাকাছি ঘেঁষাঘেষি শত্রুর উপস্থিতি অনুভব করলাম। দুষ্ট ক্ষত থেকে শরীরের মধ্যে বিষ ক্রমে সঞ্চারিত হলে যেমন হয় তেমনি বোধ হতে লাগল।

ওদের যে নেতা সে উঁচু পাটাতনটার ওপর উঠে আমাদের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তার সঙ্কেতে সেই বারোজনের একজনকে সামনে আনা হল। লোকটা এখানকার পৌরসভার নিরীহ কেরানী। লোকটি তার সাধ্যমত কেরানীর নিজ কাজটুকু করত। যেমন অকর্মণ্য, তেমনি ছিল নিরীহ। দপ্তরের কাজটুকু সেরে ঘরমুখো গতি ছিল তার প্রত্যহ। দিনের শেষে তার ঘরটুকু আর মাসের শেষে মাইনেটুকু এর বাইরে কোন জগত ছিল না তার কাছে।

আমি টের পেলাম তার বৌ আর ছেলেমেয়েরাও আমাদের সঙ্গে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

'কমরেডস্!' —বাজের মত গলায় হুঙ্কার ছাড়ল সেই নেতা। —'বন্ধুগণ, যাকে তোমরা দেখছ—এ একজন দেশদ্রোহী। বছরের পর বছর এই লোকটার হাতে এ অঞ্চলের লোকদের জীবন আর ভালমন্দের ভার ছিল। রেশনে কে কতটা খাদ্যশস্য পাবে তা এই লোকটাই ঠিক করে দিত।'

'বন্ধুগণ—এর খাতাপত্র অনুসন্ধান করে ঘোর অনিয়ম দেখতে পাওয়া গেছে। এই বিশ্বাসঘাতক দুষ্কৃতকারীকে যখন নিজেকে শোধরাতে বলা হয়েছে সে কেবল আমাদের প্রতিহত করেছে—আর প্রতিক্রিয়াশীলদের মত বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে। গত দশ দিন ধরে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য সৎ ও সুষ্ঠ

উপায়ে খাদ্য বণ্টনের জন্য আমরা যা কিছু করতে চেষ্টা করেছি—তা এই লোকটা সচেষ্ট ভাবে বানচাল করার চেষ্টা করেছে।

'বন্ধুগণ', লোকটা এবার ভীড়ের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো: 'এই বিশ্বাসঘাতকে কি দণ্ড দেব আমরা?'

'খতম কর!'—এই ভীড়ের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ওদের সেই একশ' জন লোক এবার চেঁচিয়ে জবাব দিল। মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে তারা একসঙ্গে গর্জন করে উঠল।

উঁচু পাটাতনের ওপর থেকে ওদের নেতা মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, 'বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে এটাই একমাত্র দাওয়াই।'

ভারী পিস্তলটা খাপ থেকে বার করে লোকটা ওই কেরানীর কপালের কাছে চেপে ধরে ঘোড়া টিপে দিল। ঝুপ করে মৃত কেরানীটি পাটাতনের ওপর পড়ে গেল। জমায়েত মানুষগুলো রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রইল।

'বিশ্বাসঘাতকদের খতম কর!' —সেই একশ' জন একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল। মৃত মানুষটির রক্ত ফাঁটা কাঠের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে মাঠের ওপর পড়তে লাগল।

এবার আর একজনকে টেনে আনা হল সবার সামনে মঞ্চের ওপর।

'বন্ধুগণ, আর একজন বিশ্বাসঘাতককে দেখে নাও সবাই।' নেতা আবার বলে উঠল।

মানুষটিকে চিনতে পেরে ভীড়ের মধ্যে একটা উত্তেজিত গুঞ্জন শোনা গেল। শুনতে পেলাম ভাই ফিস্‌ফিস্ করে বাবাকে বলছে: 'বাবা, ইনি না কমিউনিস্টদের নেতা?'

'হ্যাঁ,' বাবা জবাব দেন।

'তবে?'—

দক্ষিণ কোরিয়ায় এখন তিন রকম কমিউনিষ্ট আছে। রাশিয়া, চীন আর উত্তর কোরিয়া থেকে শিক্ষা পাওয়া। এদের মধ্যে বিরোধ সুরু হয়ে গেছে।

ওদিকে মঞ্চের ওপর নেতা তার অভিযোগের ফিরিস্তি ততক্ষণে শেষ করে আগের মত চীৎকার করে বলে উঠল: 'কমরেডস্, এই বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে আমরা কি করব?'

আগের মতো সেই একশ' জনই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো:

'খতম কর!'

এবার কিন্তু নেতাকে আগের মত খুশী দেখাল না। বলে উঠল: 'কমরেডস্,

আমি আপনাদের নির্দেশ, আপনাদের মতামত চাইলাম অথচ তেমন কোন সাড়া পেলাম না। যাক্, আপনারা আবার ভেবে দেখুন। এক মিনিট পরে আবার আপনাদের কাছে জানতে চাইব।'

সেই একশজন চোখে আগুন নিয়ে আমাদের দিকে ফিরল। তারা ঘুরে ঘুরে আমাদের প্রত্যেকের মুখ দেখতে লাগল। তারা আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল : 'কি জানি, আমাদের মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতক নেই তো?'

আবার সেই নেতা বজ্রগম্ভীর গলায় জনতার উদ্দেশ্যে বলল : 'এ হোল জনগণের প্রতি বিশ্বাসহন্তা। —একে নিয়ে আমরা কি করব?'

'খতম কর', সেই একশ' জনের গর্জন আবার শোনা গেল।

'খতম কর', আমরা বলে উঠলাম। কিন্তু মন থেকে নয়।

মনে হল নেতা এবার খুশী হয়েছে। আবার সে খাপ থেকে তার পিস্তল বার করে আনল। তার কপালের পাশে চেপে ধরে ঘোড়া টিপে দিল। আবার আর একটি মানুষের রক্তধারা পাটাতনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আগের রক্ত ধারার সঙ্গে মিশে খেলার মাঠের ওপর পড়তে লাগল।

আরো দশবার এমনি জুলুম চলল আমাদের ওপর। আরো দশবার আমরা ভয়ে কেঁপে শুধু মুখের কথা বলে উঠলাম। শুকনো গলায় বললাম :

'খতম কর!'

আরও দশবার দশজন কোরিয়াবাসীর রক্ত গড়িয়ে পড়ল কোরিয়ার মাটির ওপর। রুদ্ধশ্বাসে আমরা চেয়ে রইলাম—শীতে আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম—আর ঠাণ্ডা শীতল ঊষাকাল ধীরে ধীরে দিনের আলোয় প্রকাশিত করল নিজেকে।

আমার প্রিয় স্বদেশ-ভূমি
তোমার দেওয়া অন্ন আর পানীয়
আর কোনও দিন, আগের মত আমায় তৃপ্তি দেবে কি?
তোমার বাঁশীর সুর আর বীণার তান
আর কোনও দিন, আগের মত মন ভরিয়ে দেবে কি?
নেমে আসুক অভিশাপ—পূবের মানুষের ওপর!
নেমে আসুক অভিশাপ—পশ্চিমের মানুষের ওপর।
যারা আমার প্রিয় স্বদেশ-ভূমিকে করেছে রক্তাক্ত—
করেছে ছিন্নভিন্ন।

অনুবাদ : অনিমা মুখোপাধ্যায়

ফিলিপাইন

ফিলিপাইনের জাতীয়-সাহিত্য ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠির জাঁতাকলে এতকাল পূর্ণবিকশিত হ'তে পারেনি। স্পেনীয় 'হারমাদ্'-দের দৌলতে ফিলিপিনোরা বিদেশী স্পেনীয় ভাষায় সাহিত্য অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। জোস রিঝল, ফারনাণ্ডো গুয়েররেরো, সিসিলিও এপস্টল, রাফায়েল পালমা, থিওডোর এম, ক্যার্ল প্রমুখ লেখকেরা স্পেনীয় ভাষায় সেরা ফিলিপাইন সাহিত্য রচনা করেন। জোস রিঝল-এর উপন্যাস ইউরোপের অনেক ভাষাতেও ভাষান্তরিত হয়।

উনিশ শতকের শেষ পাদে ফিলিপাইনে মার্কিন শাসন ব্যবস্থা জেঁকে বসে। ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। কার্লস বুলোসন, স্টীফেল জেবেলনা প্রমুখ অনেকের রচনায় ফিলিপাইনের এই নতুন সাহিত্য রসসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ. বি রোতর, ম্যানুয়েল, ই, আরগুইলার, আমাদোর দাগুইও, এম, ভি, এম গঞ্জালেস প্রমুখ নিপুণ কথাশিল্পীদের রচনা এ কথাই প্রমানিত করে যে—যদিও ফিলিপিনোরা তাগালক বা অপর কোন মাতৃভাষায় ঘরে কথা বলে থাকেন, তাঁদের সাহিত্যের বাহন প্রধানতঃ ইংরেজী। লোপেজ, এ, বি, রোতর-এর ছোটগল্প, 'ক্ষত ও ক্ষতচিহ্ন', ম্যানুয়েল ই, আরগুইলার, স্টিভেন জ্যাভেলেনা, এন, ভি, এম গঞ্জেলেস, নিক জোয়াকিন, কেলসো—এল, কারুনাঙ্গান, কেরিমা, পেলোতানু তুভেরা প্রমুখ অনেকে যশস্বী কথাশিল্পীকে।

বিয়ের নাচ

আমাদোর দাগুইও

অইয়াও ভূমির সমান্তরাল উপরের কাঠটার দিকে হাত বাড়াল। মাথা সমান উঁচু চৌকাঠের এক প্রান্তের কাঠে ঝুলে পড়ে সে আড়াআড়ি-ভাবে একটা সরু দরজার কাছে এসে পৌঁছাল। আর ঘরের ভেজান দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর ওটাকে আবার ঠেলে দিল যথাস্থানে। কয়েক মুহূর্ত সে বুঝি অপেক্ষা করল। তারপর শ্রবণ উন্মুখ অন্ধকারের উদ্দেশ্যে বলল: 'এটা করতে হোল বলে আমি দুঃখিত। সত্যি, আমি খুবই দুঃখিত। আমাদের দু'জনের এছাড়া আর কোন পথ ছিল না।'

গংসার বাজনা দমবন্ধ জলপ্রপাতের গর্জনের মতো অন্ধকার ঘরের দেওয়াল ভেদ করে আসছে। ঠিক মনে নেই কতক্ষণ ধরে স্ত্রীলোকটি গংসার বাজনা শুনছিল। দরজা খোলার শব্দে এবার চমকে উঠল। দরজাটা খোলবার সংগে সংগেই বাজনার চড়া শব্দ সহসা তার দুই কানে এক ঝলক আগুনের মতো এসে লাগল। অইয়াওর কথা সে শুনতে পেয়েছে এমন কোন চিহ্ন দেখাল না। অন্ধকারে অসাড় নিষ্পন্দ হয়ে বসে রইল।

কিন্তু অইয়াও বুঝতে পারল যে মেয়েমানুষটার কানে গেছে তার কথা। তার মনটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। অইয়াও হামাগুঁড়ি দিয়ে ঘরের মাঝখানে এলো। সে জানে কোথায় চুল্লিটা আছে। ঢাকা জলন্ত কাঠ-গুলোকে আঙ্গুল দিয়ে সে উসকিয়ে দিল। তারপর ফুঁ দিতে লাগল। যখন আগুনটা ঝিলিক দিয়ে উঠল তখন অইয়াও কয়েক টুকরো পাইন কাঠ কয়লার মধ্যে ফেলে দিল। তারপর হাতখানেক লম্বা কাঠের একটা ডাল তাতে গুজে দিল। আর গনগনে আগুনে ঘরটা হয়ে উঠল উজ্জ্বল।

'বাইরে গেলে না তুমি?' অইয়াও বলল—'মেয়েদের নাচের দলে যোগ দিলে না কেন?' বলেই কিন্তু অন্তরে যন্ত্রণা অনুভব করল। কারণ সে জানে যা বলল সেটা বলার পক্ষে ঠিক নয়। কারণ তখনও স্ত্রীলোকটি অনড় হয়ে বসে আছে। সে বলল—'নাচিয়েদের সঙ্গে তোমার যোগ দেওয়া উচিত। যেন —যেন, কোন কিছুই ঘটে নি।'

ঘরের কোণায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা মেয়েমানুষটার দিকে অইয়াও তাকাল। চুল্লীর আগুন তার মুখের উপর অদ্ভুত মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। তার মুখ ঈষৎ ফোলা। —কিন্তু সেই স্ফীতির কারণ ক্রোধ বা ঘৃণা নয়।

'যাও, যাও, বাইরে বেরিয়ে পড়ো এবং নাচো। যদি তুমি এই বিচ্ছেদের জন্য সত্যি আমাকে ঘৃণা না করো তবে বাইরে যাও এবং নাচো গে। পুরুষদের মধ্যে কেউ একজন দেখবে তুমি সুন্দর নাচো। সে তোমার নাচে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে বিয়ে করবে। কে জানে, হয়ত দেখা যাবে আমার সংগে জীবন কাটাবার চাইতে তুমি তার সংগেই বেশী ভাগ্যবতী হয়েছো।'

'আমি অন্য কোন পুরুষমানুষ চাই না'—স্ত্রীলোকটি তীক্ষ্ণস্বরে বলল। স্ত্রীলোকটি যে অন্তত কথা বলেছে এতে সে স্বস্তিবোধ করল। 'তুমি ভালোভাবেই জানো আমিও অন্য কোন নারী চাই না। লুমনে, তুমি তো তাই জানো, তাই না?'

কোন উত্তর এল না।

অইয়াও পুনরাবৃত্তি করল —'তাতো তুমি জানো লুমনে—তাই নয় কি?'

ক্ষীণস্বরে লুমনে বলল—'হ্যাঁ, আমি জানি।'

অইয়াও হাল্কা বোধ করল এবং বলল—'এটা আমার দোষ নয়। কেউ আমাকে দোষ দিতে পারবে না। তোমার কাছে আমি ভালো স্বামীরূপেই ছিলাম।'

'তুমিও আমাকে কোন দোষ দিতে পারো না'—স্ত্রীলোকটি বলল। মনে হল এবার সে কেঁদে ফেলবে।

'না। তুমি আমার সংগে খুবই ভালো ব্যবহার করেছো। স্ত্রী হিসেবে তুমি ভালই ছিলে। তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই।' অইয়াও কয়েকটা জলন্ত কাঠকে জায়গা মতো সাজিয়ে দিল। তারপর বলতে লাগল—'পুরুষের তো সন্তান চাই-ই। সাত বছর ধরে অপেক্ষা করা যথেষ্টই দীর্ঘ। হ্যাঁ, আমরা যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করেছি। একেবারে দেরী না হওয়ার আগে আমাদের উভয়েরই আর একবার সুযোগ নেওয়া উচিত।'

এই সময় মেয়েমানুষটা নড়েচড়ে উঠল, ডান পা খানা সে সামনের দিকে ঠেলে দিল, তলায় বাঁ পাটা মুড়ে বসল। কম্বলটা আরো ভালো করে সে শরীরে জড়িয়ে নিল। বলল—'তুমি তো জানো, আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। উপজাতির উপাস্য দেবতা কাবুন্যানের কাছে কত প্রার্থনা করেছি।

প্রার্থনার জন্ত আমি মুরগীও বলি দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

'তোমার মনে আছে নিশ্চয়। তোমার অনুমতি না নিয়ে একটা শুয়োর বলি দিয়েছিলাম বলে পাহাড়ের কাজ থেকে ফিরে ভীষণ রাগ করেছিলে। আমিও তোমার মতো সন্তান চাই। কাবুন্যানকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি তা করেছিলাম। কিন্তু আর কী করতে পারি!'

'কাবুন্যান চান না আমাদের ছেলে পিলে হোক', অইয়াও উত্তর দিয়ে আগুনটাকে উসকে দিল। আগুনের শিখা বেয়ে ফুলকিগুলো উঠে যাচ্ছে। ধোঁয়া আর কালি ছাদ পর্যন্ত উঠে এলো।

লুমনে চোখ নত করে বসে রইল। অন্যমনস্কভাবে বাঁশের পাটাতনের টুকরোগুলিকে টেনে টেনে ঠিক জায়গা মতো বসিয়ে দিতে লাগল। যতবার সে এই করতে লাগল ততবারই বাঁশের বাখারিগুলো অল্প অল্প শব্দ করে উঁচু নীচু হয়ে যেতে লাগল। নাচিয়েদের টানা সুর দেওয়ালে আছড়ে পড়ে তার কানে এসে পৌঁছতে লাগল।

লুমনে কোনার যেখানটায় বসেছিল অইয়াও সেখানে এসে এক মুহূর্ত থামল ওর সামনে। ওর তামাটে ভরাট মুখের দিকে তাকাল। তারপর যেখানে জলের কলসীগুলো একটার ওপর আর একটা সাজানো ছিল সেই দিকে মুখ ঘোরাল। একটা নারকোলের মালা নিয়ে সবচেয়ে উপরের কলসীতে ডুবিয়ে জল পান করল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে লুমনে পাহাড়ের খাঁজ থেকে জল এনে এই কলসীগুলো ভর্তি করে রেখেছে।

অইয়াও বলল—'নাচের দলে তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি বাড়ী চলে এলাম। অবশ্য, তুমি যদি আমার বিবাহ উৎসবে যোগ দিতে না চাও তবে আমি তোমাকে আসার জন্য জবরদস্তি করব না। আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে যদিও আমি মডুলিমেকে বিয়ে করছি তবু সে তোমার মতো কখনও কাজের নয়। শিম গাছের চারা বসাতে জানেনা তোমার মতো। জলের কলসীও মাজতে পারবে না তোমার মতো চটপট করে। ঘরদুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেও তোমার মতো দক্ষ নয়। সারা গাঁয়ের সেরা গিন্নীদের মধ্যে তুমি একজন।'

'তাতে আমার কি হোল? কোন লাভ হয়েছে কি?' বলে সে সপ্রেম-দৃষ্টিতে অইয়াও-এর দিকে তাকাল। মনে হ'ল বুঝি মুচকি মুচকি হাসছে।

অইয়াও নারকোলের মালাটা মেঝেতে একপাশে রেখে লুমনের আরো

কাছে সরে এল। দু'হাতে মুখটা তুলে ধরে অইয়াও তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে লুমনের সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। লুমনে দৃষ্টি তার অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল—আর কোনদিন অইয়াও তার মুখ তুলে ধরবে না। আগামীকাল থেকে সে অইয়াও-এর স্ত্রীর কেউ নয়। লুমনে ফিরে যাবে তার বাবা-মার কাছে। লুমনের মুখ ছেড়ে দিল অইয়াও। লুমনে আবার মেঝের দিকে কাত হয়ে ফাঁক ফাঁক বাঁশের মেঝের মধ্যে রাখা নিজের আঙুলের দিকে দৃষ্টি নত করল।

অইয়াও বলল—'এই বাড়ী আমি তোমার—তোমার জন্যই বানিয়েছিলাম। নিজের মনে করে যতদিন ইচ্ছে এখানে থেকো। মডুলিমের জন্য আমি আরেকটা বাড়ী বানিয়ে নেবো।'

মৃদুস্বরে লুমনে বলল—'বাড়ীর কোন দরকার নেই আমার। আমি নিজের বাড়িতেই ফিরে যাবো। বাবা মা বুড়ো হয়েছেন—শিম গাছের চাষের কাজে, ধান ভানতে তাদের লোকের দরকার।'

'আমাদের বিয়ের প্রথম বছরে যে জমিটা আমি পাহাড় খুঁড়ে তৈরী করেছিলাম সেটা তোমায় দেবো। তুমি তো জানো তোমার জন্যই ওটা করেছিলাম। আমাদের দুজনার জন্য জমিটা করতে তুমিও আমাকে সাহায্য করেছিলে।'

'আমার জমির কোন দরকার নেই।'

অইয়াও তার দিকে তাকাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণের জন্য উভয়ের মধ্যে নীরবতা নেমে এলো।

লুমনে শেষে বলল—'নাচে ফিরে যাও। এখানে থাকা তোমার ঠিক নয়। তারা তোমাকে না দেখলে অবাক হবে। মডুলিমেরও খারাপ লাগবে।'

'তুমি এসে নাচে যোগ দিলে আমার খুব ভালো লাগবে—এই তো শেষবার। গংসার বাজনা শুনতে পাচ্ছো?'

'তুমি তো জানো আমায় পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

মিষ্টি স্বরে অইয়াও বলল: 'লুমনে, আমি যা করছি তার কারণ আমার ছেলে দরকার। তুমিতো জানো ছেলে ছাড়া বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। পুরুষ মানুষগুলো আমাকে বিদ্রূপ করে—তোমারো তো তা অজানা নয়।'

'সে আমি জানি। আমি কাবুন্যানের কাছে প্রার্থনা করব তিনি যেন তোমাকে আর মডুলিমেকে আশীর্বাদ করেন।'

লুমনে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল—পাগলের মতো মাথা নাড়াতে

লাগল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

লুমনের মনে পড়ল গত সাতটা বছরের কথা, জীবনের প্রারম্ভে তাদের যে উচ্চাশা ছিল তার কথা, সেই দিনটির কথা যেদিন অইয়াও গর্জন মুখর নদী পারাপার করে বাবা-মার কাছ থেকে তাকে নিয়ে এসেছিল। পাহাড়ের অপর পারের চড়াই ভেঙে উপরে ওঠা, খাড়া জলপ্রপাত পেরেনো—সেই জলোচ্ছ্বাস যেন তার মনের মধ্যে সাদা ও সবুজ জেড পাথরে এবং কল্লোলিত রূপোর ফেনায় টগবগ করে ফুটছিল। জলরাশি গর্জে উঠে গড়িয়ে চলেছে খাড়াই পাহাড়ের প্রাচীর ভেদ করে, বজ্র নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—যদিও অনেক দূরে এবং ক্রমশঃ ক্ষীয়মান তবুও শব্দ যথেষ্ট উচ্চগ্রামে। জলরাশি প্রবল বেগে নেমে আসছে অপর কোন শৈল শ্রেণী থেকে। পিঠ উঁচু পাথরগুলো খুব ভাল করে দেখে তবে পা রাখছিল ওরা। কারণ পা একবার পিছলে গেলেই মৃত্যু। পাহাড়ের উল্টো দিকটা চড়বার আগে তারা দু'জনে নদীর জল পান করেছিল—এবং নদীর অপর পারে কিছুক্ষণ বিশ্রামও।

লুমনে অইয়াওর মুখের দিকে তাকাল। আগুনের শিখা ছিটকে এসে পড়েছে ওর শক্ত সবল সরল অবয়বের উপর। দয়া মায়ার শরীর। মুখ-চোরা মানুষ একটা। অইয়াও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারত না। এ জন্য লুমনে এবং গ্রামের লোকেরা প্রায়ই ঠাট্টা করত। হেসে ওর রসিকতা করার ক্ষমতা ছিল আর তাই লুমনে কত না গর্ব করত। অইয়াওর মাংসপেশীগুলো সুদৃঢ় এবং সবল—কি সরল ওর উজ্জ্বল দুই চোখ। লুমনে অইয়াওর শরীরের দিকে তাকাল যে দেহ তার জন্য পাহাড় খুঁড়ে পাঁচখানি জমি তৈরী করেছে। তার চওড়া অথচ কোমল শরীর যেন পাথরের চাঁই-এর মতো স্ফীত। তার বাহু এবং পা যেন মুখর মাংসপেশীর দিকে প্রবাহিত। অইয়াও শক্তিমান। লুমনে আজ তাকে হারাচ্ছে।

লুমনে অইয়াও-এর হাঁটুদুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সেদুটোকে জড়িয়ে ধরল। চীৎকার করে উঠল—'অইয়াও, অইয়াও, ওগো স্বামী, একটা ছেলে কোলে পাওয়ার জন্য আমি তো সবই করেছি।' তৃষিত স্বরে ফিস ফিস করে বলতে থাকল: 'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমার শরীরের দিকে তাকাও। একদিন তো এই দেহ সব সম্ভাবনায় পূর্ণ ছিল। এই শরীর নাচতে পারত, মাঠে চটপট্ কাজ করতে পারত, দ্রুত পাহাড় বেয়ে উঠতে পারত। এমনকি এখনও এই শরীরে সামর্থ আছে, পূর্ণতা আছে। কিন্তু হায় কাবুনিয়ান, কোনদিন আমাকে আশীর্বাদ করলেন না। অইয়াও,

কাবুল্লান আমার প্রতি নিষ্ঠুর। অইয়াও, আমি নিস্প্রয়োজনীয়। আমি নিশ্চয় মরব।'

'মরাটা ঠিক হবে না'—অইয়াও তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল। লুমনের পূর্ণ নগ্ন স্তনযুগল অইয়াও-এর বুকের ভেতর থরো থরো কাঁপতে লাগল। অইয়াওর গলা জড়িয়ে ধরে সে আঁকড়ে রইল। লুমনের মাথা অইয়াওর কাঁধের উপরে ন্যস্ত। উচ্ছল অন্ধকারের ঝরনা বেয়ে তার কুন্তল খেলা করতে লাগল।

'জমি, বাড়ী, কোন কিছুরই জন্য আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি তোমাকে চাই—অন্য কোন পুরুষ আমার দরকার নেই।'

'তা'হলে চিরদিনই তুমি থাকবে নিস্ফলা।'

'আমি বাবার কাছে ফিরে যাবো। আমি মরব।'

'তাহলে তুমি আমাকে ঘৃণা কর। তোমার মরা মানেই তো আমাকে ঘৃণা করা। তুমি চাও না আমার ছেলে পিলে হোক। তুমি চাওনা যে আমাদের উপজাতির মধ্যে আমার নাম বেঁচে থাকুক।' লুমনে চুপ করে রইল।

অইয়াও বলল—'আমি যদি আরেকবার চেষ্টা না করি তার মানে হবে আমার মৃত্যু। পাহাড় কেটে যে জমি আমি তৈরী করেছি সে জমির অধিকারী কেউ থাকবে না আমার পরে আর কেউ থাকবে না।'

চিন্তিতভাবে লুমনে বলল—'যদি তুমি ব্যর্থ হও—ধরো দ্বিতীয় বারেও যদি ব্যর্থ হও।' পরক্ষণেই তার গলার স্বর হাহাকার করে উঠল—'না না, আমি চাই না তুমি ব্যর্থ হও।' অইয়াও বলল—'যদি আমি ব্যর্থ হই আবার ফিরে আসব তোমার কাছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে মরবো। আমাদের উপজাতি জীবন থেকে আমরা দুজনে মুছে যাবো।'

গংসাগুলির বজ্রনির্ঘোষ বাড়ীর দেওয়াল ভেদ করে আসছিল—সুদূর এবং শব্দময়।

লুমনে নীচুস্বরে ফিসফিস করে বলল—'আমি আমার পুঁতির মালাটা রাখব। অইয়াও আমাকে পুঁতির মালা রাখতে দাও।'

'তুমি তোমার জপমালা রাখ। ওগুলো বহুদিনের পুরানো। আমার ঠাকুরমা বলতেন ওগুলো এসেছিল উত্তর দিক থেকে, সমুদ্রের ওপারের ট্যারা চোখওয়ালা লোকদের হাত দিয়ে। লুমনে, তুমি ওগুলো রেখে দাও। ওসবের দাম কুড়িটা জমির সমান।'

'আমি ঐগুলো রাখব কারণ ওগুলো হোল আমার প্রতি তোমার ভালবাসার চিহ্ন। আমি তোমাকে ভালবাসি কিন্তু তোমাকে দেবার মতো আমার কিছু নেই।'

অইয়াওর হাত থেকে লুমনে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। কারণ কে যেন বাইরে থেকে ডাকছিল—'অইয়াও, অইয়াও, ওহে অইয়াও, নাচের আসরে সবাই তোমাকে খুঁজছে।'

'তোমাকে ওরা মন্দ বলবে। বরং তুমি যাও।'

'যতক্ষণ না তুমি বলবে তোমার কোন কষ্ট নেই ততক্ষণ আমি যাবো না।'

'আমার কোন কষ্ট নেই।'

অইয়াও লুমনের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল—'স্বজাতির মুখ চেয়ে আমাকে এটা করতে হচ্ছে।'

'আমি জানি'—লুমনে বলল।

অইয়াও দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'অইয়াও!'

সে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন একটা বর্শা তাকে এঁফোড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। যন্ত্রনায় সে লুমনের দিকে ফিরে তাকাল। লুমনের মুখে ভীষণ কষ্টের ছাপ—ওকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। লুমনে তার প্রতি সত্যি খুব ভাল ব্যবহার করেছে। আচ্ছা, কেন পুরুষ মানুষ সন্তান চায়? জীবনে, কাজের মধ্যে, শস্য বোনা ও তোলার মধ্যে রাত্রির নীরবতায়, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে, উপজাতির সমগ্র জীবনে এ সবের মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য পুরুষ মানুষ সন্তানের খিল খিল হাসি আর আধা আধো মুখে বুলি শুনতে চায়?

ধরা যাক, তার মতের পরিবর্তন হ'ল। কোন অলিখিত আইন দাবী করে যে ব্যাটাছেলেকে ব্যাটাছেলে হতে গেলে ছেলে-পিলে থাকতেই হবে—আর যদি সে নিস্ফল হয়—কিন্তু লুমনেকে সে ভালবাসে। তাকে এভাবে ত্যাগ করা মানেই তার জীবনের অর্ধেক কেড়ে নেওয়া।

লুমনে ডাকল—'অইয়াও! তোমার পুঁতির মালা!' মনে হল আলোয় তার চোখ দুটো হাসছিল।

আইয়াও ঘুরে দাঁড়াল। ঘরের দূরতম কোণে গিয়ে ট্রাংটার কাছে দাঁড়াল—যার মধ্যে রাখা আছে তাদের সব পার্থিব সম্পদ—ওর নিজের যুদ্ধের কুঠার, বর্শার ফলা, লুমানের পানের ডিবে এবং পুঁতির মালা। অন্ধকারে খুঁজে মালাটা খুঁজে বের করল—যে মালাটা ওর ঠাকুরমা দিয়েছিল বিয়ের দিনে

[illegible] [illegible] জন্য। লুমনের কাছে গিয়ে ওর হাতটা তুলে ধরে তাকে পরিয়ে দিল সেই মালা। তারপর জায়গা মত বেঁধে দিল। শ্বেত, সবুজ এবং গাঢ় কমলা রং-এর দানাগুলো অগ্নি-আলোকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। লুমনে সহসা অইয়াওকে জড়িয়ে ধরল, যেন কোনদিনই আর চলে যেতে দেবে না।

'অইয়াও, অইয়াও—এ সহ্য করা ভীষণ কঠিন।' —লুমনে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। তারপর চোখ দুটি বুঁজে অইয়াওর কাঁধে মুখ গুঁজে দিল।

বাইরে থেকে আবার ডাক এল। লুমনের বাহুবন্ধন শিথিল হ'লো এবং অইয়াও রাত্রির অন্ধকারে দ্রুত মিলিয়ে গেল।

অন্ধকারে কিছুক্ষণ বসে রইল লুমনে। চাঁদের আলো তার মুখের ওপর এসে পড়েছে—সারা গ্রাম চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

পড়শীদের বাড়ীর উঠান বেয়ে গংসার বাজনা আসছে। লুমনে জানে সব বাড়ী এখন খালি, সবাই নাচতে গেছে। কেবলমাত্র সেই অনুপস্থিত। লুমনে কি গাঁয়ের সেরা নাচিয়ে ছিল না? তার নাচ কি আর সকলের চাইতে বেশী চটুল সুন্দর ছিল না? ভূমিতে রাখা শস্য ঠুকরে খাওয়ার পাখীর ভঙ্গীতে একমাত্র সেই তো পারত নাচতে—গংসার বাজনার ঠিক তালে তালে। পুরুষ মানুষেরা তার কোমল শরীরের প্রশংসা করত। আর মেয়ের দল হিংসে করত তাব সেই পাহাড়ী ঈগল পাখীব মতো ডানা মেলে ওড়ার ভঙ্গীতে হাত মেলে দেওয়া দেখে। কতদিন, কতদিন আগে সে নিজের বিয়েতে নেচেছিল। তার বিয়ের রাতে যে সমস্ত মেয়েরা তার সম্মানে নেচেছিল তারা আজ রাতে নাচছে আরেকজনের সম্মানে—যার একমাত্র দাবী যে সে হয়ত তাব স্বামীকে একটি সন্তান এনে দিতে পারবে।

'এটা ঠিক নয়, এটা ঠিক নয়—' লুমনে চীৎকাব কবে উঠল—'কি করে সে মডুলিমেয় জানবে? কি করে অন্য সকলে জানবে? এটা মোটেই ঠিক নয়।'

সহসা লুমনে মনের ভিতর জোর পেল—সে নাচতে যাবে। যাবে গ্রাম্য প্রধানের কাছে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে—তাদের বলবে এটা ঠিক হচ্ছে না। অইয়াও শুধু তারই। কেউ তার কাছ থেকে অইয়াওকে কেড়ে নিতে পারে না। সেই হোক প্রথম অভিযোগকারিনী, পুরুষ যে অন্য নারী গ্রহণ করতে পারে সেই অলিখিত আইন-ভঙ্গকারিনী। সে অবশ্যই স্ত্রী ও পুরুষদের নাচের মজলিস ভেঙ্গে দেবে। অইয়াওকে বলবে ফিরে আসার জন্য।

অইয়াও নিশ্চয় কথা শুনবে। তাদের দুজনের ভালবাসা কি নদীর মতো প্রবাহিত নয়?

গ্রামের অন্যদিকে যেখানে নাচ চলছিল সেই দিকে পা বাড়াল লুমনে। সারা জায়গাটা জুড়ে আগুনের দীপ্তি, একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। গংসাগুলো এখন আরো উচ্চস্বরে বাজছে। মনে হচ্ছিল যেন বাজনা তাকে কাছে ডাকছিল, শেষ পর্যন্ত সে তো কাছেই এসেই গেছে। নাচিয়েদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। উৎসবের সাজে সেজে মালা পরে মেয়েরা তাদের পুরুষদের অনুসরণ করে সৌন্দর্যময় পাখীর ভূমিতে নুয়ে পড়ার ভঙ্গীতে নাচছে। আর পুরুষেরা তাদের গংসা নিয়ে মেয়েদের চারদিকে বৃত্তাকারে লঘুক্ষেপে লাফাচ্ছে। নাচের উত্তপ্ত আহ্বানে লুমানের হৃদয় উষ্ণ হয়ে উঠল—একটা আজব উত্তাপ তার রক্ত বেয়ে উঠতে লাগল। লুমানে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের দীপ্তিময় ঔজ্জ্বল্য তাকে থামতে বাধ্য করল। কেউ কি তাকে আসতে দেখেছে? লুমনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেউ যদি আসতে দেখতেই পায় তাতে কি আসে যায়? অগ্নিকুণ্ডের শিখা অসংখ্য স্ফুলিংগের মতো লাফিয়ে উঠতে লাগল যেন হরিদ্রা বর্ণের বিন্দুসমূহ প্রসারিত হয়ে উপরে উঠছে এবং রাত্রির বুকে হারিয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত প্রভায় তাকে স্পর্শ করল। বিয়ের ভোজ ভাঙবার সব সাহস লুমনে হারিয়ে ফেলল।

লুমনে নাচের আসর থেকে সরে এলো, সরে এলো গ্রাম থেকে। মাত্র চার পক্ষ আগে সে এবং অইয়াও দুজনে যে শিমগাছের পরিচর্যা করেছিল তার কথা ভাবল। সে অনুসরণ করে চলল গ্রামের উপরের দিকের পার্শ্বে চলা পথ।

পাহাড়ী নদীর কাছে এসে সাবধানে পার হ'ল। কেউ তার হাত ধরল না এবং স্রোতস্বিনীর জল বড়ই ঠাণ্ডা। পায়ে চলা পথ আরো উপরের দিকে উঠে গেছে। চাঁদের আলোয় গাছ-গাছালির আলোছায়ার মধ্য দিয়ে লুমনে পথ করে নিচ্ছে। ধীরে ধীরে সে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

লুমানে যখন পরিষ্কার জায়গায় এসে দাঁড়াল তখন দেখতে পেল গ্রামের প্রান্তে কোথায় রয়েছে প্রোজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ড, যেখানে নাচ চলছে। দূর থেকে ভেসে আসা গংসার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে—সেই গম্ভীর শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেই শব্দ তাকে বিদ্রূপ করছে না। তারা যেন তাকে দূরে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে—অব্যক্ত প্রেমের ভাষায় যেন তার সংগে কথা বলছে। তাদের কোলাহলের একটা আকর্ষণ যেন সে অনুভব করল—প্রায় অনুভব

করল যেন তারা লুমনের আত্মত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ তার কাছে অসংখ্য গংসার শব্দের মতো মনে হ'ল।

যে অইয়াওকে সে বহুদিন ধরে জানত সেই অইয়াওর কথা তার মনে পড়ল—সে শক্ত সমর্থ এবং অনায়াসেই জ্বালানী কাঠের ভারী বোঝা পাহাড়ী পথ বেয়ে বাড়ী নিয়ে আসত।

মাটির কলসী নিয়ে জল আনার পথে একদিন তাদের প্রথম দেখা। জল পানের জন্য এবং বিশ্রাম নেবার জন্য অইয়াও ঝরনার ধারে থেমেছিল। লুমনে তার নারকোলের মালায় শীতল জল খেতে দিয়েছিল। এরপর বেশীদিন পার হয় নি যেদিন অইয়াও লুমনকে বিয়ে করার অভিলাষ জানাবার জন্য তার বাপের বাড়ীর সিঁড়িতে বর্শা ছুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

পাহাড়ের এই পরিষ্কার জায়গাটা নিস্তেজ চাঁদের আলোয় ঠাণ্ডা। বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে বইতে আরম্ভ করেছে। শিমগাছের পাতাগুলি আন্দোলিত হচ্ছে। লুমনে একটা বড় পাথরের চাঁই খুঁজতে লাগল যার ওপর বসা যায়। শিম-গাছগুলি তাকে ঘিরে ধরেছে এবং তাদের মধ্যে লুমনে হারিয়ে গেল।

আরো কয়েকটি সপ্তাহে আরো কয়েকটি মাস আরো কয়েকটি বছর—তাতে কি এসে যায়? লুমনে শিম গাছের ফুল হাতে করে নেবে, নরম বুনট, প্রায় রেশমের মতন—কিন্তু সিক্ত। সেখানে শিশির প্রবেশ করছে, ভোরের আলোয় উদ্‌ভাসিত শুভ্রতায় দেখতে রূপোর মতন—ফিকে নীলের ওপর রূপালী আভা। প্রসারিত পত্রের হৃদয়ের মধ্য থেকে শিমের শুটিগুলি পূর্ণ দৈর্ঘ্যে প্রলম্বিত থাকবে যুগ যুগ ধরে।

শিমের বাড়ন্ত শুঁটির মধ্যে অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ ধরে লুমানের আঙুল খেলা করতে থাকল।

অনুবাদ: জীবন বরুনী

লেখক পরিচিতি

আকুতাগাওয়া র‍্যাইউনোস্নুকে (১৮৯২-১৯২৭): জাপানের প্রবীন কথা সাহিত্যিক। বহু কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করলেও গল্প লেখক হিসেবেই পরিচিত। ছোটগল্পে 'হাইকু' কবিতার প্রয়োগ তিনি করেন এবং বিদেশী আঙ্গিকে ছোট গল্পের অনেক ব্যবহার করেছেন তাঁর লেখায়। 'মাকড়সার সুতো' গল্পের নেপথ্যে আছে বৌদ্ধ জাতক কাহিনী। মিশিমার মত তিনি ৩৫ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন।

আমাদোর দাগুইও: আধুনিক ফিলিপাইনের ছোট গল্প লেখক। নাট্যকার ও কবি। জন্ম উত্তর লুজনের পার্বত্য প্রদেশে। শিক্ষা ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে। গল্প কবিতার জন্য একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন। ছাত্র জীবন ও কর্মজীবনের প্রথমভাগ অতিবাহিত হয় দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষক হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দাগুইয়ো নাট্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে নিজের একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেন। এসময় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ও একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। যুদ্ধোত্তর কালে উত্তরের পার্বত্য এলাকার কলিঙ্গ উপজাতির সংগৃহীত 'ফসলের গান' অনুবাদ করেন। উপজাতিদের শিক্ষা সংস্কৃতির মৌলিক গবেষণা করেন। দাগুইও তারপর ম্যানিলায় ফিরে আইনজীবি রূপে কর্মজীবন শুরু করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হন। 'বিয়ের নাচ' গল্পটি ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্প অ-খৃষ্টান কলিঙ্গ উপজাতির ঘুনে ধরা ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কারের পরিপেক্ষিতে রচিত।

ইদ্রাস: ছোটগল্প রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। 'আত্মগোপনকারীর ডায়েরী' যুদ্ধের সময়কার লেখা হলেও বইখানি প্রকাশিত হয় বিপ্লবের পর। তাঁর 'সুরবায়া' গ্রন্থে বিপ্লবকালীন ইন্দোনেশিয়ার বাস্তব জীবনের এক আলেখ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইদ্রাসের রুক্ষ বাস্তবতা আধুনিক ইন্দনেশীয় গল্প সাহিত্যে এক অভিনব ধারায় সূচনা করেছে। ইদ্রাসের এ গল্পটি আফ্রো এশীয় লেখক গোষ্টীয় মুখপত্র লোটাস থেকে অনূদিত।

ইয়াসুনারী কাওআবাতা (১৮৯৯-): নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জাপানী কবি ও কথাশিল্পী। তাঁর প্রথম লেখা ছোট গল্পই পাঠক মহলকে দোলা দেয়। 'স্নো-কান্ট্রি' ও 'থাউজাণ্ড ক্রেনস' তাঁর সার্থক উপন্যাস। একাধিক গল্পের রচয়িতা। তাঁর রচনার সংলাপ সংক্ষিপ্ত অথচ এমন কাব্যধর্মী যে পাঠক আবিষ্ট হয়ে পড়ে। তিনি নিওস্যানসুয়েলিষ্ট গোষ্ঠীর প্রবক্তা। ১৯৬৮ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তগ্রন্থ 'উকিগুনি' ('স্নো-কান্ট্রি' বা বরফের দেশ) তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

উকিয়ো মিশিমা (১৯২৫-১৯৭০): জাপানী কথাশিল্পী। জাপান সরকারের অর্থ দপ্তরের চাকরী ছেড়ে লেখক জীবন গ্রহণ করেন। আত্মচরিত-মূলক উপন্যাস 'কন্‌ফেশনস্ অব মাস্ক'। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা একশতের উপর। হারিকিরি করে মিশিমা আত্মহত্যা করেন। 'দি সী অব ফারটিলিটি', 'দি বার্নিং হাউস', 'দি গোল্ডেন প্যাভিলিয়ন' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

চাও শুলি: নতুন চীনের বিপ্লবী কথাশিল্পী ও নাট্যকার, নয়াচীনের সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশ-ভবন 'সিনহুয়া-প্রেস'-এর অন্যতম সম্পাদক। জন্ম শানসির এক পল্লীতে। 'সিনহুয়া-প্রেস'-এ কাজ করতে করতে তিনি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং সাত খণ্ড গল্প সংগ্রহ, পাঁচটি নাটক ও দুটি 'কু-মু' বা বর্ণণাত্মক গাথা রচনা করেন।

তিঙ্ লিঙ্ (১৯০৭-): আধুনিক চীনের শ্রেষ্ঠ মহিলা লেখিকা। স্কুল জীবনেই বিপ্লবাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ কাল কারাবাসে কাটাতে বাধ্য হন। অনেক দুঃখ, সংগ্রাম আর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কেটেছে। তাঁর লেখায় ব্যথার মৌন চিত্র প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

দক মাই সদ: থাই দেশের মহিলা লেখক। প্রকৃত নাম মম লুয়াং বুব পা সুকিচ নিম্মানহে মিন্দা। লেখাপড়া ফরাসী কনভেণ্টে। ঘরের কাজ কর্মের অবসরে ছ' সাত খানি গল্প উপন্যাস তাঁর প্রকাশিত হয়েছে এরই মধ্যে।

নাওয়া শাইপা (১৮৮৩-): জাপানের অন্যতম কথা শিল্পী। মাত্র একখানা উপন্যাস লিখেছেন। ছোট গল্পই তাঁর সাহিত্যের মাধ্যম। তাঁর প্রভাব সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের লেখকদের উদ্বুদ্ধ করেছে। 'হানের অপরাধ' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

প্রমোত্ত অনন্ত তোয়ের (১৯২৫-) : ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধ সাংবাদিক রূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সাংবাদিক ও লেখক। তাঁর লেখা স্প্যানিস, ডাচ, ইংলিস, জার্মান, চাইনীস ও রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'গরিলা পরিবার' এবং একাধিক ছোটগল্পের মধ্যে 'উবালগ্নে' ও 'পাটজিকান' বিভলুমি গল্প বিখ্যাত।

প্রভুমরথ জোহ :—(১৯০৫-) উত্তর থাইদেশের উবল পল্লীতে জন্ম) শিক্ষাদীক্ষা ব্যাঙ্কক ও নিউইয়র্কে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাদপ্তরে অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত হন। উত্তর থাইল্যাণ্ডের লোক-সংস্কৃতির পরি-প্রেক্ষিতে তিনি গল্প উপন্যাস রচনা করেন।

মাও তুন (১৮৯১-) : আধুনিক চীনের শক্তিধর লেখক মাও তুং সেন—ইয়েং পিং-এর ছদ্মনাম। ছাত্র জীবনেই সাহিত্য সাধনা শুরু। তাঁর উদ্যোগেই চীনে 'বামপন্থী লেখক সঙ্ঘ' সংঘটিত হয়। সাহিত্য পত্রিকা 'চাইনিজ লিটেরেচার' সম্পাদনা করেছেন এবং সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি গল্প লেখক, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক ও অনুবাদক।

মোচতার লুবিস (১৯২২-) : পেশায় সাংবাদিক। ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত 'রেয়া' পত্রের প্রধান সম্পাদক। ইংরেজী ও চীনা ভাষার অনুবাদক। 'তাক আদা এসক', 'জালানতাক আদা উদজুঙ্গ' প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। মোচতার লুবিসের এই গল্পটি 'দি এ্যাটল্যান্টিক মান্থলী' থেকে গৃহীত।

'যগাই' (১৯০৮-) : ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম উ-থেইন গান। জন্ম পিয়াপনে (বর্মা তখন ভারতের মধ্যে ছিল)। শিক্ষা রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে লণ্ডন ও ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক। বর্মা গবেষনা সমিতি ও বর্মা অনুবাদ সমিতির সদস্য। চার্লস্ রীডের 'দি ক্লাইষ্টার এ্যাণ্ড দি হার্থ', 'দি উড বি জেণ্টলম্যান' (মলিয়ারের), কালিদাসের 'শকুন্তলা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের অনুবাদক। 'নিউ ইয়ার ব্লজমস্ (কবিতা) 'যু-লান' 'মানুষ ও কবি' প্রভৃতি বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প গ্রন্থের লেখক।

লাও চাঅ (১৮৯৮-) : লেখকের ছদ্ম নাম। আসল নাম শু-চীঙ্-চুন। চীনের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। ছেলেবেলা দারিদ্রের মধ্যে কাটে। ইংলণ্ডে গিয়ে ডিকেন্স প্রমুখ লেখকদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের প্রেরণায়

লিখতে শুরু করেন। 'লো-লো সিয়াং-জু' (রিক্সাওয়ালা) তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ অনূদিত উপন্যাসের সঙ্গে বাঙালী পাঠক পরিচিত। 'এক ছাঁচতলায় চার পুরুষ', ১৯৪৬ সালের যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। 'চা ঘর' উপন্যাসও সবিশেষ খ্যাত।

লু স্যুন (১৮৮১-১৯৩৬): আধুনিক চীনা সাহিত্যের জনক এবং পথিকৃৎ। ম্যাক্সিম গোর্কীর মত লু স্যুন লেখকের ছদ্ম নাম। প্রকৃত নাম চৌ স্যু জেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র চৌ স্যু জেন শেষ পর্যন্ত হলেন লেখক লু স্যুন। 'পাগলের ডায়েরী' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প যা চীনা সাহিত্যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তিনি বিভিন্ন রচনায় চীনের তথাকথিত জাতীয় ধারা এবং সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির কড়া সমালোচনা করেন এবং মার্কসবাদকে সার্থক ভাবে আপন সৃষ্টিতে প্রয়োগ করেছেন। মাও সে তুঙ-এর কথায়: 'তিনি ছিলেন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান সেনাপতি। তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, একাধারে মহান চিন্তানায়ক এবং মহান বিপ্লবীও'।

ইউ উয়ল চোঙ নিওন: ইউ উয়ল চোঙ নিওন কোরিয়ার এক মহিলা লেখিকার ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামের আড়ালে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতি দ্বন্দ্বের চিত্রটি তুলে ধরেছেন নানা গল্প কাহিনীর মাধ্যমে।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

তুমিও পুতুল

পুতুল নাচিয়ে বেড়ায় যে শিল্পীরা তাদের পুতুল জীবন অবলম্বনে
সুখ-দুঃখের হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস।

ক্নুট হামসুন

ভিক্টোরিয়া

অনুবাদ—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের অন্যতম কোমল করুণ প্রণয় কাহিনী

হেরমান হেসে

সিদ্ধার্থ

অনুবাদ—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের পটভূমিকায় লেখা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস।

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

দিশা-কাক

বাঙালীর অতীতের বাণিজ্যিক ইতিহাস অবলম্বনে রোমাঞ্চকর কাহিনী
যা পাঠককে ভাবায় ও রোমাঞ্চিত করে।

শুশুনিয়ার রহস্য

বাঙলার আদিমতর মানুষদের জীবন সংগ্রাম অবলম্বনে
এডভেঞ্চার উপন্যাস।